লীলা মজুমদার রচনাবলী

৩

সম্পাদনায়

সমীর মৈত্র

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলিকাতা-সাত

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬২

প্রকাশিকা :
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ/১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭০০ ০০৭

মুদ্রাকর :
বাদলচন্দ্র পাল
এস্. এম্. প্রিন্টিং
১৯ডি, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

ভেতরের ছবি :
তাপস দত্ত
কলকাতা-৭০০ ০২৯

বাঁধাই :
বিদ্যুৎ বাইন্ডিং ওয়ার্কস
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

টং লিং

এক

যে জায়গাটাতে আমি এখন বসে আছি এটার নাম পেরিস্তান। এ জায়গার কথা আমি ছাড়া এ বাড়ির কেউ জানেও না, এখানে কেউ আসতেও পারে না। ছোটরা এখানে আসবার রাস্তাই খুঁজে পাবে না আর বড়দের পেট আটকে যাবে। কারণ, এক জায়গায় এ বাড়ির দেয়ালের কোনা আর পাশের গুদোমখানার দেয়ালের কোনা একেবারে ঘেঁষটে আছে। আর তার নীচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সরু অন্ধকার একটা নালা।

ভারি ভালো এ জায়গাটা, আঁকড়ে মাকড়ে একবার পেঁছুতে পারলে আর ভাবনা নেই, কেউ দেখতেও পায় না। সামনে দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, আর মাথার বেশ খানিকটা ওপরে ওদের একতলার চাতাল, ঐখানেই ওদের নাটকের রিহারসাল হচ্ছে এখন। ওদের পায়ের তলায় এই চমৎকার জায়গাটার কথা ওরা কেউ জানেও না। জানলে আর অমন নিশ্চিন্ত মনে হাত-পা নেড়ে নাটক করতে হত না!

সব চেয়ে খারাপ ওদের ঐ প্রকাশদা, অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না। ওদিকে ক্লাস ইলেভেনে উঠেও বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, নাকি লত হয়েছেন। 'লত' কি তা আমি ঠিক জানি না, তবে আমার বড় কাকিমা যেরকম করে বললেন, মনে হল নিশ্চয় খুব খারাপ কিছু।

ঐ প্রকাশদা সাজছে শিশুপাল, আর ওদের ইস্কুলের অঙ্কের স্যার ব্রজেনদা সাজছে শ্রীকৃষ্ণ। ছোটকাকা শেখাচ্ছেন—এমনি করে হাত বাড়িয়ে অর্ঘ্যথালা ধরে থাকো ব্রজেন, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকো। ছোটকাকা যা বলছেন ব্রজেনদা তাই করছে। ওদিকে প্রকাশদাকে পায় কে! বই দেখে দেখে খুব আপমান-টপমান করছে ব্রজেনদাকে। বইতে যে-সব কথা নেই সে-সবও ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আমি পেছন থেকে বই দেখে যেমনি সে-কথা বলেছি, কি রাগ আমার ওপর! আমার আর কি! এখন যতই

অপমান করুক ব্রজেনদাকে, ওর অঙ্কের খাতা দেখবে ঐ ব্রজেনদাই, তখন নাকি এক হাত নিয়ে নেবে। আমার বড়কাকার ছেলে বিভুদা বলেছে।

বিভুদাও কম যায় না। আমাকে খালি খালি বলে, দ্যাখ, আমিই বলে কয়ে জ্যাঠামশাইকে—জ্যাঠামশাই মানে আমার বাবা—চিঠি লিখিয়ে তোকে আনিয়েছি, এখন আমাদের এক বাক্স দাড়িগোঁফ না দিলে তোকে কিন্তু পার্ট দেওয়া হবে না।

শুনে আমি অবাক! এক বাক্স দাড়িগোঁফ আমি কোথায় পাব? বিভুদা কিছুতেই ছাড়ে না, বলে, "পাব না মানে? কলকাতার দোকানে সব পাওয়া যায়, গত বছরের ভুতুড়ে নাটকের জন্যে তো কলকাতা থেকেই হাড়গোড় ভাড়া করে আনা হয়েছিল। এ-বছর সব ঝগড়াঝাঁটির ব্যাপার, মোটে চাঁদা ওঠে নি, কলকাতা থেকে কিচ্ছু ভাড়া করে আনা যাবে না। ভালো চাস্ তো এক বাক্স দাড়িগোঁফ দে, নইলে ভোঁদার দল আমাদের ওপর এক হাত নেবে, এ আমি কিছুতেই সইব না বলে রাখলাম। দাড়িগোঁফ দেব না! ওঃ! ঐ তালপাতার শরীরে তো তেজ কম না!"

এই বলে বিভুদা আমার ডান ঘাড়ে একটা রদ্দা মারল। মেরে বললো, "এটাকে আমি মার বলি না, এটা শুধু মারের নমুনা। দাড়িগোঁফ না দিলে আসল মার কাকে বলে টের পাবি, বুঝলি চাঁদ!"

—বলে আমার গাল টেনে রবারের মতো এই এত্তোখানি লম্বা করে দিল! শেষটা আমি এইখানে এই পেরিস্তানে চলে আসতে বাধ্য হলাম।

বিভুদা মনে ভাবে কি? ম্যালেরিয়া হয়ে নাহয় আমার শরীর খারাপই হয়ে গেছে, কিন্তু তাই বলে আমার বন্ধু বিশের তো আর ম্যালেরিয়া হয় নি। আসবে একটু বাদেই বিশে এখানে, হাঙর-মুখো নৌকো বেয়ে ওপার থেকে। কি চালাক বিশে! এখানে পার হলে চাতাল থেকে ওরা দেখে নেবে, তাই গঙ্গার পুলের ওধারে পার হয়ে, নদীর কিনারা ঘেঁষে ঘেঁষে নৌকো চালিয়ে এসে ঐ নালাটির ভেতর নৌকোসুদ্ধু ঢুকে পড়ে। ওখানে দেয়ালের গায়ে এই বড় আংটা লাগানো আছে, তাতে নৌকো বেঁধে বিশে এক লাফে নেমে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে মেঘ ডাকার মতো শব্দ করতে করতে সিংহও লাফিয়ে নামবে।

সিংহ হল আমার বন্ধু বিশের কুকুর। কি চেহারা সিংহের, বাবা! দেখলেই লোকের হাত-পা হিম হয়ে যায়। আমি কিন্তু সিংহকে একটুও

ভয় পাই না ! ওর এত বড় কালো থ্যাবড়া নাকের ওপর হাত বুলিয়ে দিই, আর সিংহ ওর বুড়ো আঙুলের মতো ল্যাজ নেড়ে, নেচে কুঁদে, আমার মুখ চেটে একাকার করে দেয়।

পোড়া হাঁড়ির মতো এত বড় সিংহের মুখটা, টকটকে লাল জিব ঝুলিয়ে রাখে। কুকুরের ল্যাজ কেটে দিলে ওদের ভীষণ তেজ বাড়ে, তাই সিংহের ল্যাজটা বিশে বেশি করে কেটে দিয়েছে, তাতে খুব বেশি তেজ হয়েছে ওর।

আমার বন্ধু বিশের গায়ে কি জোর ! এই এতখানি বুকের ছাতি, হাতের পায়ের গুলি ইঁটের মতো শক্ত। এতটুকু করে চুল ছাঁটা, তাতে নাকি কুস্তি করতে সুবিধে হয়। হাতাওয়ালা গেঞ্জি আর নীল হাফ-প্যান্ট আর সাদা ক্যাম্বিসের জুতো পরে বিশে যখন নৌকো থেকে লাফিয়ে নামে ওকে একটা পালোয়ানের মতো দেখায় ! আমি মেজকাকিমার কাছ থেকে চেয়ে আমসত্ত্ব নিয়ে আসি, বিশে এলে ভাগ করে খাই। সিংহও আমসত্ত্ব খায়।

আমরা তিনজনে চাতালের তলায় সবুজ ঘাসের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে থাকি, আর গঙ্গার পুলের ওপর দিয়ে চেন ঝুলোতে ঝুলোতে মালগাড়ি যায় টং লিং—টং লিং—টং লিং। পায়ের তলায় তখন কিরকম লাগে যেন। মনে হয় অনেক দূরে কোথাও বিশের সঙ্গে চলে যাই।

বিশের বুকে একটা নীল রঙের কঙ্কালের মুণ্ডু আর তার নীচে দুটো মোটা মোটা মানুষের হাড় ক্রশ্ করে বসানো, এইরকম করে উল্কি দিয়ে আঁকা আছে। দেখে প্রথমটা একটু কি রকম মনে হয়েছিল, ঠিক ভয় না, তবে পেটের ভেতরে প্রজাপতিরা ফড়্‌ফড়্ করছিল। কিন্তু বিশে বললো, "যাবি নাকি আমার সঙ্গে সমুদ্রের জাহাজে ?"

শুনে আমি অবাক। বিশে ডাঁশা পেয়ারাতে এক কামড় দিয়ে বললো,

"যাবি তো বল্। তোকে আন্দামান ছাড়িয়ে আরো অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারি। সেখানে একটা প্রবালের দ্বীপ আছে, তার মাঝখানে মস্ত একটা নীল উপসাগর, সেইখানেই আমাদের আস্তানা। বাইরে থেকে কিচ্ছু বুঝবার জো নেই, পাথরে-আড়াল-করা সরু নালার মতো পথটা দিয়ে একবার ঢুকলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। নারকেল গাছ জড়িয়ে লতা উঠেছে, তাতে থোলো থোলো কালো আঙুর ঝুলছে, পেড়ে খেলেই হল। পাথরের গায়ে কমলামধুর চাক, মধু উপচে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে, সিংহ পর্যন্ত চেটে

কিন্তু বিশে বললে, "যাবি নাকি আমার সঙ্গে সমুদ্রের জাহাজে ?"

খায়। মাথার ওপর লাল নীল হীরেমন পাখির ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। যাবি তো বল।"

যেতে তো খুবই ইচ্ছে করে; কিন্তু মা যে আবার আমাকেই বলেন চিঠি ডাকে দিয়ে আসতে, মুশকিলও আছে ঢের। তার ওপর নিমকি ইস্কুল থেকে ফিরেই বলে, "দাদা আমার ঘুড়ি জুড়ে দাও।" বাবা বলেন খবরের কাগজ থেকে এটা ওটা কেটে রাখতে। বিশের সঙ্গে সমুদ্রের জাহাজে চলে যেতে তো ইচ্ছে করেই, কিন্তু তা হলে এ-সব করবে কে?

যখন জোয়ার আসে, হুড় হুড় করে নালা দিয়ে জল ভেতরে ঢুকে যায়। বিশের নৌকো এই পাড়িটা অবধি ভেসে ওঠে। সেই সময়ই বিশে আসে। ভাঁটা পড়লে জল কোথায় নেমে যায়, এক হাঁটু কাদা বেরিয়ে পড়ে, বিশের নৌকো ডাঙার ওপর বসে থাকে, বিশে আর বাঘা তখন চোরা ঘরে বিশ্রাম করে, আমিও আস্তে আস্তে দেয়াল আঁকড়ে-মাকড়ে উঠে পড়ি। তার পর বাগানের ধার ঘুরে গিয়ে খিড়কি দিয়ে আবার বাড়িতে ঢুকি। ওরা ভাবে বুঝি বাগানের ঘাটে বসে ছিলাম।

ততক্ষণে হয়তো নাটকের রিহারসাল শেষ হয়ে গেছে। বড়রা অনেকেই যে যার বাড়ি চলে গেছে। বিভুদা, ছোটকাকা, আরো দু-একজন চাতালের বাঁধানো পাড়ে হাঁড়িমুখ করে বসে ভোঁদার দলের ওপর খুব রাগ দেখাচ্ছেন। আমি আস্তে আস্তে একটা কোনায় এসে বসতেই ছোটকাকা বললেন, "অত গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ালে তো চলবে না, চাঁদ! টাকা-পয়সার ব্যবস্থা নেই, কারো পার্ট মুখস্থ হয় না, সাজ-পোশাকের কি হবে, তাঁর ঠিক নেই, তার ওপর আজ আবার এই কাণ্ড! অমন চুপ করে থাকলে তো চলবে না, সবাই মিলে না খাটলে শেষটা কি ভোঁদার দলই এ-বছর কাপ পাবে নাকি?"

আমি বললাম, "আমাকে একটা পার্ট দিলে তবে তো করব।"

বিভুদা বললে, "না, না, ছোটকা, ওকে কিছু বলাটা ঠিক নয়। ও আমাদের সকলের জন্য দাড়িগোঁফ এনে দেবে।"

ছোটকাকা বললেন, "দাড়িগোঁফ আর চুল বল।"

বিভুদা বললে—"ও হ্যাঁ, দাড়িগোঁফ আর চুল।"

দুই

কি ভালো ভালো সব দাড়িগোঁফ দেখেছি লোকদের মুখ থেকে ঝুলে আছে, কিন্তু সে সব আমি পাব কোত্থেকে ? তা বিভুদা কিছুতেই বোঝে না। ওদের রিহারসালে গণ্ডগোল হয়, মেজাজ ওদের বিগড়ে থাকে, তার ঝাল ঝাড়ে আমার ওপর! বলে, "খুব বেশিদিন আর নেই চাঁদ, দু বেলা পেট পুজো আর লবাবি করে ঘুরে বেড়ালে চলবে না। কদ্দূর কি করলি বল্ ?"

বলে আমার হাতের কনুই-এর উপরে দু আঙুল দিয়ে খিমচে ধরে মাংস টানে। উঃ! কি ব্যথা লাগে, জায়গাটা দড়া পাকিয়ে গোল হয়ে ফুলে ওঠে! তার পর বিভুদা আমার ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বলে, "তোর সব চালাকি জানা আছে আমার! ভালো মানুষ সেজে থেকে আমাকে বকুনি খাওয়াবার যত ফন্দি। যা না, মার কাছে গিয়ে নালিশ কর্ না গিয়ে।"

এই বলে, "মেয়েদের মতো সরু গলায় বলতে থাকে 'ওঁ কাঁকিমা, দেঁখ না, বিঁভুদা আঁমাকে খাঁলি মাঁরে.অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ!'—ন্যাকা চৈতোন।"

ঠ্যালা খেয়ে আমি দেয়ালের ওপর গিয়ে পড়ি। ঠিক সেই সময় ছোটকা এসে পড়েন, বিভুদাকে বলেন, "বাস্তবিক বিভু, এরকম ফ্যাসাদে তো আগে কখনো পড়তে হয় নি। বড়দার কাছ থেকে কিছু আদায় করতে পারিস না ? নইলে সব যে ভেস্তে যায়। ভোঁদারা শুনছি কাপ পেয়ে কি ফিস্টি দেবে তার তালিকা তৈরি করছে, বড়-বড় চাঁদা মাছের ফ্রাই, মুরগির কাটলেট, রাবড়ির আইসক্রীম। আমাদের কাকেও নাকি বলা হবে না।"

বিভুদা বললে, "অথচ নালুর পৈতেতে সব এসে দিব্যি খেয়ে গেছে! ছোঃ! তা তুমি ভেবো না ছোটকা, চাঁদ সব এনে দেবে বলেছে, মেক-আপের জন্য আমাদের একটা পয়সা লাগবে না। ড্রেসও যে যার নিজেরটা বাড়ি থেকে আনলেই ল্যাঠা চুকে যাবে।"

ছোটকাও একটু খুশি হয়ে গেলেন।

"যা বলেছিস। নাটক হবে আমাদের পুজোর দালানে, বাঁধানো স্টেজ তো রয়েইছে, মাথার ওপর তারা ফুট্‌ফুট্ করবে, নীচে শতরঞ্জি বিছিয়ে দেবে, পেছনে কতক চেয়ার দেব ক্লাব থেকে এনে। কিন্তু—"

এই অবধি বলেই ছোটকা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বিভুদা মহা ব্যস্ত।

"কিন্তু কি, ছোটকা? আবার কিন্তু কিসের? পাট সব মুখস্থ হয়ে যাবে দেখো। ছোট-ছোট পাঁচটা পাট আমার, তাই মুখস্থ করে ফেলেছি! একটু একটু সাজ বদলে এক এক পাটে নামব, কখনো শুধু গোঁফ, কখনো শুধু দাড়ি, কখনো দাড়িগোঁফ দু-ই, কখনো চাঁচাছোলা, কার সাধ্যি চিনে নেয়—এই চাঁদ, দাড়িগোঁফের ব্যবস্থাটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করে ফেল্ ।"

আমি বললাম, "তা আমাকে তো দুটো একটা পাট দিতে পার। নিজে পাঁচটা না করে, আমাকে দুটো না হয় দিলে। কিচ্ছু ভালো মুখস্থ হয় নি তোমার, পড়া-টড়াও তো সব ভুলে যাও কাকিমা বলেছেন!"

ততক্ষণ ওদের দলবল এসে গেছে, ছোটকা চাতালের দিকে চললেন, অমনি বিভুদা আমার উপরে লাফিয়ে পড়ে আমার মুঠো মুঠো চুল ছিঁড়ে, কানের লতি টেনে একাকার করে দিল। উঃ, কি খারাপ ছেলে বিভুদা। আমাকে মেরেটেরে মুখ মুছে দিব্যি রিহারসালে চলে গেল।

আমি পেরিস্তানে গেলাম। কথাটা বিশেকে না বললেই নয়। বিশে এর একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বে না। হয়তো সিংহকে দিয়ে চাটাবে। কুকুরকে কি ভয় পায় বিভুদা! নাকি ছোটবেলায় ওর খাটে হুলোবেড়াল উঠেছিল, সেই থেকে ও কুকুর দেখলে ভয়ে কাদা হয়ে যায়! একবার সিংহকে যদি দেখে, তবেই ওর হয়ে গেল!

পেরিস্তানের মাথার ওপরটা ঢাকা, ওপরে তাকালে থাম্বার উপরে বসানো বাড়ির তলাটা দেখা যায়, কিন্তু বাড়ির কোনোখান থেকে এ জায়গা দেখা যায় না!

এখানে দুটো চোরা কুঠরি আছে সে কথা কেউ জানে না। নালা থেকে বাড়ির তলায় ছোট সিঁড়ি বেয়ে চোরা কুঠরিতে ঢোকা যায়, তাও কেউ জানে না। চোরা কুঠরির দেয়ালে পাথরের তাক আছে, পাথরের বেদি আছে, তাতে শোয়া যায়। কেউ সে-সবের কথা জানে না। জানে শুধু বিশে আর সিংহ আর আমি। তাকে দু-তিনটে বই রেখেছি, একটা বিস্কুটের টিনে কিছু খাবার রেখেছি। সিংহর কিনা খুব খিদে। আমাদেরও খিদে পায়।

পেরিস্তানের ভেতর দিকটা যেমনি অন্ধকার, বাইরেটা তেমনি আলো, ঢালু হতে হতে নদীতে নেমে গেছে। কত গাছ-গাছলা গজিয়েছে সেখানে,

নৌকো করে সামনে দিয়ে গেলেও জায়গাটা তত চোখে পড়ে না। পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকি, কেউ টেরও পায় না।

ভয় খালি ঐ রেলের লাইনের খুপ্‌রি ঘরটাকে। ঐখানে একটা বিশ্রীমতন লোক থাকে, কি লাল লাল চোখ তার। গাড়ি যাবার সময় একটা সবুজ নিশান নাড়ে, আর কোন কাজ করে না। খুপ্‌রি ঘরটা খানিকটা উঁচুতে একটা বাঁকের ওপরে। ওর পেছন দিকের জানালাটা খুলে ঝুঁকে দেখলে হয়তো পেরিস্তানের খানিকটা দেখা যেতেও পারে। এই আমার ভয়।

তা হলে আর বিশে আসবে না। লোকের সামনে ও কিছুতেই বেরোয় না। বলে আমাদের দেশের লোকেরা ভালো নয়, ওদের দেশে সব অন্যরকম। ওদের ইস্কুলের বড় ছেলেরা কক্ষনো ছোটদের পেছনে লাগে না। তবে বিশে আজকাল আর স্কুলে যায় না। কেন যাবে? সব ওর শেখা হয়ে গেছে। ওদের দেশের লোকেরা কেউ বই পড়ে পাশ করে চাকরি করে না। ওদের দেশে আপিস নেই।

খালি খোলা মাঠ আর গাছপালা আর নদী আর ঘন বন আর একটা পুরোনো আগ্নেয়গিরি আর মাঝখানে খানিকটা সমুদ্র, সেখানে ঢেউ ওঠে না। আর চার দিকে যে সমুদ্র তার শেষ নেই। তিনতলার সমান ঢেউ দিনরাত শুধু কালো কালো পাথরের ওপরে আছড়ে পড়ছে আর চারি দিকের জল ফেনিয়ে দুধের মতো সাদা হয়ে উঠছে।

প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম, এমনি সময় কানের কাছে কিসের শব্দে চমকে উঠে বসেছি।

ঝুপ্‌ করে অমনি টান হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লাম। কেউ না দেখতে পেলে বাঁচি! ও কাদের চ্যাঁচামেচি? পেরিস্তানে আবার কে চ্যাঁচাচ্ছে?

মাটি আঁকড়ে কাঠ হয়ে পড়ে আছি, নাকে ঘাস ঢুকছে, গালের উপর দিয়ে অনেকগুলো ঠ্যাংওয়ালা কি যেন হাঁটছে, তবু নড়ছি চড়ছি না, নিশ্বাস চেপে রাখছি।

কানের কাছ দিয়ে কলকল ছলছল করে নদী বয়ে যাচ্ছে, চোখের কোনা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি ওপারের ঘাটে অন্ধকার জমা হচ্ছে। বুক ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করছে।

অন্য লোক যদি পেরিস্তানের কথা জেনে ফেলে তবে আর বিশে আসবে না।

বিভুদাদের বিশে কি ঘেন্নাটাই করে। বলে, "ব্যাটার শরীরটা তোর চেয়ে তিন ডবল বড়, ওর লজ্জা করে না তোর সঙ্গে লাগতে। তুই কিচ্ছু ভাবিস না, একদিন হতভাগাকে দেখে নেব!"

কি গায়ে জোর বিশের। কি ভীষণ সাহস! বিভুদাকে এতটুকু ভয় পায় না। বুকে গুম্‌গুম্‌ করে কিল মেরে বলে, "তুই দেখে নিস্‌ রে চাঁদ, ওটাকে কেমন মাটির সঙ্গে একেবারে বিছিয়ে দিই। চালাকি করবার জায়গা পায় নি, ছোট ছেলের সঙ্গে লাগতে আসা! আচ্ছা, আমিও আছি!"

দূরে পুলের ওপর দিয়ে আরেকটা মালগাড়ি চলে গেল, টং লিং—টং লিং—টং লিং। বিশে মাঝে মাঝে চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে ওঠে নামে।

আস্তে আস্তে মাথা তুলে উঠে বসলাম। কোথাও কিচ্ছু নেই। এই জায়গায় কি অন্ধকার! নদীর ওপর মিট্‌মিট্‌ করে কত নৌকোতে বাতি জ্বলছে। ওপারের ঘাটের আলোগুলো থামের মতো লম্বা লম্বা ছায়া ফেলছে। চোখ তুলে চেয়ে দেখি, আমার মাথা থেকে খানিকটা উঁচুতে, ছোট একটা গর্ত দিয়ে একটুখানি আলো আসছে। একটা টাকার মতো ছোট একটা গোল ফুটো। বিশে একবার ওদের দ্বীপের আগ্নেয়গিরির গা বেয়ে উঠে, ওপর থেকে ঝুঁকে দেখেছিল অনেক নীচে টগ্‌বগ্‌ করে গলন্ত পাথর ফুটছে আর ধোঁয়া উঠছে আর গন্ধকের গন্ধ আসছে।

খচ্‌মচ্‌ করে গিয়ে উঠলাম ফুটোর ধারে। চোখ লাগিয়ে তাকিয়ে দেখে আমি থ। আরে, ও যে আমাদেরি বাড়ির চাতাল! ঐখানেই তো বিভুদাদের রিহারসাল চলছে। ছোটকাকা হাত-পা নেড়ে খুব বকাবকি করছেন। সব দেখা যাচ্ছে, সব শোনা যাচ্ছে। ভারি একটা গোল হচ্ছে।

এমনি সময় দালানের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন নলিনজ্যাঠা, প্রকাশদার বাবা। রাগে মুখটা কি দারুণ লাল দেখাচ্ছে। বড়-বড় পা ফেলে গিয়ে পাকড়ে ধরলেন প্রকাশদার কান! বললেন, "ওঃ! আবার নাটক হচ্ছে! লজ্জা নেই হতভাগা, জানিস পরীক্ষায় অঙ্কে দশ পেয়েছিস! চল্‌, একবার বাড়ি চল্‌, পাঁচ বচ্ছরের মধ্যে আর তোকে ছাড়া নয়!" বলে দিব্যি তার কান ধরে নিয়ে চললেন!

ছোটকাকা এতক্ষণে হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন—"ও কি, ও যে আমাদের শিশুপাল !"

প্রকাশদার বাবা কাঁধ থেকে ছোটকার হাতটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন।

বাকিরা যে যেখানে ছিল সেইখানেই বসে পড়ল ! আমিও আস্তে আস্তে নেমে এলাম। নেমে এদিকে তাকাতেই আমার চক্ষু চড়কগাছ। হুড়্ মুড়্ করে নালাটা দিয়ে জল ঢুকছে। গাছের সমান উঁচু সব ঢেউ উঠছে। ঢেউগুলোর মাথায় ফেনার ঝুঁটি। বাড়িটার তলা থেকে অদ্ভুত একটা গুম্‌গুম্ শব্দ বেরুচ্ছে। হাওয়া থেকে অমনি গরমটুকু চলে গিয়ে গায়ে লাগল ঠাণ্ডা।

বুকটা ধড়্ ফড়্ করতে লাগল—নদীটা এই বুঝি হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরে ফেলে। তলাকার সেই সরু নালাটাতে ঘুরে ঘুরে ফেনা হয়ে জল ঢুকছে। আর সে কি গর্জন ! তার ওপর দিয়ে যাই কি করে ?

বিশেরা দল বেঁধে ঝড়ের রাতে শুশুক মারতে যায়। সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় এই তাদের নৌকো ওঠে, আবার ঝপাং করে এই তাদের নৌকো পড়ে। নৌকোর কানা ধরে আঁকড়ে থাকতে হয়। নইলে কে কোথায় ছিট্‌কে পড়বে আর তাদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না। একবার একটা তিনহাত লম্বা চিংড়ি—হঠাৎ নাকে এল ঝড়ের গন্ধ। লাফিয়ে উঠে ফিরে দেখি, নালার মুখে ফেনাজলে হাবুডুবু খাচ্ছে ও কার ছোট নৌকো ? ও তো বিশের নয়। আমার নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল।

তিন

ইস্, নৌকোতে একটা লোকও আছে দেখলাম—দুহাতে প্রাণপণে নৌকো আঁকড়ে রয়েছে, মাঝে মাঝে ঠ্যাং দুটো নৌকো থেকে আলগা হয়ে ভেসে যাচ্ছে। জলে ডোবা লোকদের মাথায় ডাণ্ডা মেরে অজ্ঞান করে তার পর চুল ধরে হিড়হিড় করে ডাঙায় তুলতে হয়। কিন্তু কাছেপিঠে ডাণ্ডাও নেই, আর চুল ধরে হিড়হিড় করে টানতে হলে তো আমাকে সুদ্ধু জলে নামতে হয়, তখন আমাকে কে তোলে তার ঠিক কি ? সাঁতারও জানিনে। সর্দি লাগার ভয়ে আমাকে জলে নামতে দেওয়া হয় না।

বিশেদের দেশের ছেলেমেয়েরা হাঁটিতে শিখেই ঝপাং ঝপাং জলে পড়ে সাঁতার কাটে। বিশে একবার একটা জাহাজডুবির নৌকো বাঁচিয়েছিল। ঝোড়ো সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ যেখানে আকাশের সঙ্গে সমুদ্র মেশে, ঐখানে সাঁতরে গিয়ে ঠেলে ঠেলে নৌকোটাকে ওদের দ্বীপের সরুপথ দিয়ে মাঝখানকার স্থির জলে এনে ফেলেছিল। নৌকোতে জনকয়েক বণিক ছিল, তারা বিশেকে ধনরত্ন দিতে চেয়েছিল। তারা প্রাণ হাতে করে ধন-রত্নের বাক্স বুকে চেপে আরেকটু হলেই সমুদ্রের নীচে তলিয়ে গিয়েছিল আর কি! তা আর বিশেকে কিছু দিতে চাইবে না? কিন্তু বিশে কিচ্ছু নেয় নি।

এবার চেয়ে দেখি নৌকোটা আরো কাছে এসে গেছে, পাথরের সিঁড়ির এবড়ো-খেবড়ো ধাপের ওপর থেকে হয়তো চেষ্টা করলে মুঠি ধরাও যায়। আমাকে দেখে লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "ধরো দড়িটা, নৌকো যেন ভেসে না যায়।"

বলে একটা মোটা দড়ি ছুঁড়ে দিল। আমি দড়ি আঁকড়ে চোখ বুঁজে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লাম। চোখ খুলে দেখি নৌকো ছেড়ে সে এসে ডাঙায় উঠেছে। আমার হাত থেকে দড়ি নিয়ে দেখতে দেখতে দারুণ এক গিঁট দিয়ে দেয়ালের আংটার সঙ্গে নৌকো বেঁধে ফেললো। বললো, "মাঝ-দরিয়ায় এমনি করে বয়ার সঙ্গে নৌকো বাঁধে?"

তারপর কুকুরের মতো গা ঝাড়া দিয়ে জল খসিয়ে বললে, "উঃফ্, আরেকটু হলে মরেই গিয়েছিলাম। বাপ্স, কালো-মাস্টার জলে ডুবে মলো ভাবতেও হাসি পায়! এই, একটা শুকনো কিছু দিতে পার? কান দুটো যেন পাতকো হয়ে গেছে, মোটে কিছু শুনতে পাচ্ছি নে।"

দিলাম পকেট থেকে ময়লা রুমালটা। লোকটা একবার সেটাকে নেড়েচেড়ে, নাকে তুলে দুবার শুঁকে, অমনি পাকিয়ে পাকিয়ে লম্বা একটা খোঁচা বানিয়ে, নিজের কান থেকে রাশিরাশি জল বের করে ফেললো! তারপর বললে, "ওয়া! ওয়া! বেড়ে গন্ধ তো তোমার রোমালে, জিবে যে জল এসে গেল।"

বললাম, "সত্যি কথা। রান্নাঘরে গিয়ে বামুনদিদির কাছ থেকে ওতে করে গরম-ভাজা বেগুনি এনেছিলাম।" সে বললে, "আহা! আছে নাকি কিছুমিছু? খিদেয় যে পেট জ্বলে গেল।"

থাকে আমার কাছে সর্বদাই কিছু না কিছু। উঠে একবার চোরা-

তারপর বললে, "ওয়া ! ওয়া ! বেড়ে গন্ধ তো তোমার রোমালে···"

কুঠরিতে যেতে হল। সেও চললো আমার সঙ্গে সঙ্গে। মোমবাতির আলোতে ঘর দেখে একেবার হাঁ!

"ই কি! বাড়ির তলায় আবার লুকোনো ঘর কেন? কি কর এসব ঘরে তোমরা?"

বললাম, "কিছু করি না, আমি ছাড়া কেউ এ-ঘরের কথা জানেও না। আমিও জানতাম না। নেহাত বিভুদা আমাকে দু-কান চেপে শূন্যে তুলে মামাবাড়ি দেখাবে বলে তাড়া করেছিল, তাই। আমি পালাতে গিয়ে খিড়কির বাগান দিয়ে পাঁচিলে চড়ে কেমন করে বাড়ির এ-পাশে চলে এলাম। তারপর একটা জায়গায় পৌঁছলাম সেটা একেবারে পাশের গুদোমবাড়ির গা ঘেঁষে গেছে। মাঝখানে এতটুকু ফাঁক, নীচে আবার জল। সেই ফাঁক দিয়ে গলে খানিকটা কানিশের মতো দিয়ে হেঁটে একেবারে এখানে এসে গেলাম।"

লোকটা বললে, "ওয়াঃ!! বেড়ে জায়গাখানি তো! বাড়িটা কি তোমার নাকি?"

বললাম, "না, মানে আমার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদার বাবা বাড়িটা বানিয়েছিলেন। এর একটা ইঁটও ভালো মানুষের পয়সা দিয়ে কেনা হয় নি, বিভুদা বলেছে।"

লোকটা বললে, "আহা! শুনলেও কান জুড়োয়। তা, এখানে দুটো দিন একটু গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারি কি? শত্তুররা বড্ড পেছনে লেগেছে, খালি পেটে ভিজে গায়ে আর কত লড়া যায়?"

বিস্কুটের টিন খুলে ওকে ঝুরো নিমকি আর মুড়ির মোয়া খেতে দিলাম। ছোট বোতলের জলটাও ওকেই দিলাম; বড়টা রাখলাম—বিশেতে আমাতে আর সিংহতে খাওয়া যাবে। লোকটার পরনে শুধু একটা কালো হাফপ্যান্ট, ভিজে সপসপ করছে। আর একটা হাতওয়ালা গেঞ্জি, গায়ের সঙ্গে লেপটে রয়েছে।

তাকের ওপর থেকে চাদরটা দিলাম। সেইটে পরে প্যান্ট গেঞ্জি নিংড়ে বেদীটার উপর মেলে দিয়ে খেতে বসল। খেতে খেতে বললে, "বারে বারে ইদিক-উদিক তাকানো কেন?"

বললাম, "বাইরে যা জলঝড়, ওরা হয়তো এতক্ষণে আমার জন্য খোঁজাখুঁজি লাগিয়ে দিয়েছে। এই জায়গাটা খুঁজে পেলেই তো হয়ে গেল। আমারও একটা লুকোবার জায়গা থাকবে না, বিশেও আর আসবে না।"

"বিশে ? বিশে আবার কে ?"

"বিশে আমার বন্ধু, হাঙরমুখো নৌকো করে নদীর ওপার থেকে আসে, সঙ্গে থাকে ওর কুকুর, তার নাম সিংহ। এ জায়গাটার নাম পেরিস্তান।"

লোকটা ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠল।

"বিশে যদি আবার এসে আমাকে দেখে, তাহলে কি হবে ?"

"হবে আবার কি ? ভালোই হবে, ও তোমার শত্তুরদের মেরে পাট করে দেবে। তোমার কোনো ভয় নেই।"

"কিন্তু—কিন্তু যদি আমার কথা বিশ্বাস না করে ?"

লোকটা তো আচ্ছা ভীতু। বললাম, "না না, কিচ্ছু ভয় নেই। আমি ওকে বলে দেব। তা ছাড়া আজ আর ও আসবেও না। এখন আমি চলি, তুমি চুপচাপ বিশ্রাম করো। অন্য লোক আছে জানলে বিশে কখনো আসে না। পরে আমিই আবার আসব।"

আঁকড়ে-মাকড়ে উঠে, খিড়কির বাগান ঘুরে রান্নাঘর দিয়ে বাড়িতে ঢুকলাম। কাকিমারা আমাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ও ছেলে! তোমাকে খুঁজে খুঁজে না বাড়ি সুদ্ধু হয়রান !! জলঝড়ে কোথায় ছিলে ? ইস্, ভিজে চুপ্পুড় হয়ে গেছ যে ! বলি, ছিলে কোথায় ?"

বললাম, "কেন, খিড়কির বাগানে। গাছতলা থেকে নদীর ওপরে ঝড় দেখছিলাম ?"

"গাছতলা থেকে ? কেন ? নদী তো ঘর থেকেও দেখা যায়।"

"তা দেখা যেতে পারে, এ অন্য রকম দেখা।"

বড় কাকিমা বললেন—"যাও না, তোমার বড়কাকা তোমার অন্য রকম দেখা বার করবেন।"

আস্তে আস্তে বললাম, "আর ছোটকা ? বিভুদা ?"

"তারা এসব বিষয় কিছু জানেও না, কেয়ারও করে না। তাদের নাটকের সর্বনাশ হয়ে গেছে বলে যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে আছে। যাও, এখন কাপড় ছাড়ো তো। বড়কাকাকে বুঝিয়ে বলব এখন। এমনি ভীতু ছেলে যে অমনি মুখ শুকিয়ে গেছে !"

শুনে হাসি পেল। ভীতুরা কি টগবগে ফেনাভরা নালার ওপর দিয়ে আধ-হাত সরু জায়গা দিয়ে হাঁটতে পারে ?

রান্নাঘরের জলচৌকিটার ওপর বসে বললাম—"নাটকের কি সব্বনাশ হয়েছে রে, পুঁটিদি ?" পুঁটিদি আমার মেজপিসির মেয়ে, আমার চেয়ে

একটু বড়। কি ঝগড়াটে, বাবা! পুঁটিদি বললে, "ওমা! তাও জান না? প্রকাশদা না, রোজ রোজ ব্রজেনদাকে যা নয় তাই বলে অপমান করে! এমনিতে বইতে আছে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে যাচ্ছেতাই সব কথা বলছে। ও এমনি খারাপ যে তার সঙ্গে আরো সব জুড়ে জুড়ে দেয়। প্রথমটা নাকি ব্রজেনদা অত টের পান নি, খুব রেগেছেন মনে মনে, কিন্তু ভেবেছেন বলুক গে ছাই, একটু পরেই তো বধ হবে, তখন বাছাধন টেরটা পাবে! তারপর কাল হয়েছে কি, দুজনার পার্ট-লেখা কাগজ অদলবদল হয়ে গেছে! ব্রজেনদা দেখেন অর্ধেক কথা মোটেই পার্টে নেই, প্রকাশদা বানিয়ে বলে, এমনি খারাপ! তখন ব্রজেনদা—"

পুঁটিদি আরো কি সব বলতে যাচ্ছিল, এমনি সময় বড়কাকিমার সে কি ধমক: "যাও, যাও, আর পাকামো করতে হবে না। একটা লুচিও যার গোল হয় না, তার মুখে আবার বড়দের নিন্দে! যাও এখান থেকে।"

পুঁটিদি সত্যি চলে গেল আর আমিও ভিজে জামা ছাড়তে ঘরে গেলাম।

ঘরে ঢুকেই দেখি লাল-লাল চোখ করে বিভুদা আমার খাটের ওপর বসে আছে। তখুনি চলে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বিভুদা বললে, "চাঁদ, শোন্।"

আস্তে আস্তে গিয়ে খাটের ওপাশে দাঁড়ালাম। বললাম, "কি?"

রাগে বিভুদা ফেটে পড়ে আর কি!

"কি! কি আবার কি? নাটক বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড় তা জানিস্? প্রকাশদা রোজ পার্টের কথা বাড়িয়ে বাড়িয়ে ব্রজেনদাদের অপমান করে, সেই রাগে সকালে ব্রজেনদা জ্যাঠামশায়কে বলে এসেছেন যে এখনো সাবধান হবার সময় আছে। ওদিকে ছেলে নাটক করছেন! এদিকে অঙ্কের পরীক্ষায় যে দশ পেয়েছেন জ্যাঠামশাই কি সে খবর রাখেন? আর যাবে কোথায়, অফিস-ফেরত জ্যাঠামশাই রিহারসালের মাঝখান থেকে প্রকাশদাকে কান ধরে সারাপথ হাঁটিয়ে বাড়ি নিয়ে গেছেন! সঙ্গে যে অফিসযান গাড়িটা রয়েছে সে খেয়ালও নেই! দাঁড়িগোঁফের ব্যবস্থা নেই, শিশুপাল নেই, এখন কি করে নাটক হবে শুনি?"

এই না বলে এক লাফে খাট পেরিয়ে ধরেছে আমার টুঁটি চেপে!

"দাড়ি-গোঁফ কবে এনে দিচ্ছিস বল্ হতভাগা! না এনে দিলে তোর পেয়ারের ছবি আঁকার খাতার আমি কি করি দেখিস্!"

পেটের ভিতরে সিঁটকে গেলাম আমি! সত্যি যদি খাতাটা ছিঁড়ে

ফেলে! ওতে আমি জল-মানুষদের ছবি এঁকেছি! বললাম, "শিশুপালের পার্টটা ইচ্ছে হলে আমাকে দিতে পার।"

শুনে বিভুদা আমার টুঁটি ছেড়ে দিয়ে হেসেই কুটিপাটি!

"সে কি রে চাঁদ? তুই হবি শিশুপাল! শিশুপাল যে একটা বিরাট যোদ্ধা ছিল। তোর তো এই চেহারা! বেড়ালছানার পার্ট থাকলে তোকে দিতাম! ওসব কথা ভুলে যা, দাড়ি-গোঁফের ব্যবস্থা কর। শিশুপালের বিষয় আমরা ভাবব।"

আরো হয়তো গাঁটা-টাঁট্টা মারত আমাকে, বলা যায় না, কিন্তু ঠিক সেই সময় ছোটকা এসে আমার খাটের উপরে বসে পড়লেন। বিভুদা হাত নামিয়ে নিল। ছোটকা বললেন, "তবে কি শেষটা সত্যি সত্যি ঐ ভোঁদার কাছে হার মানতে হবে নাকি? বিকেলে ক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে তোর নামে কি সব নিন্দে-টিন্দে করছিল ওরা।"

বিভুদা লাফিয়ে উঠল, "কি, আমার নামে বলছিল কি শুনি।"

"না, অত রেগে ওঠবার মতো কিচ্ছু নয়। তবে বলছিল যে, "ঐ বিভুটাকে আমরা থোড়াই কেয়ার করি, আছে তো শুধু গোঁয়ার্তুমি আর গুণ্ডাগিরি কত্তে! ঘটে যে গোবর ছাড়া আর কিচ্ছু নেই সে ইস্কুলেই রোজ টের পাওয়া যায়! বটুদাকে নিয়েই যত ভাবনা!"

বটুদা মানে ছোটকা। বিভুদা তো রেগে টং!

"বেশ তো, তাই যদি হয়, এখন থেকে নাটকের ভাবনা তুমি একাই ভেবো, আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসো না। আমার দ্বিতীয় পাণ্ডবের পার্টই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তা ছাড়া আরো চারটে পার্ট রয়েছে। ঐ যথেষ্ট!"

ছোটকা থাকতে থাকতে ও-ঘর থেকে সরে পড়তে ইচ্ছেও করছিল, আবার ওদের কথাবার্তাটা শেষ পর্যন্ত না শুনে যাই-ই বা কি করে? যে রকম সব মেজাজ দেখছি, এর পরে যদি মারামারি লেগে যায়, সেও দেখতে পাব না শেষটা!

ছোটকা বললেন, "ওরে বিভু, সম্মুখে বিপদ, এখন কি তোতে আমাতে খ্যাঁচাখেঁচি শোভা পায়? জানিস্, ওরা কর্ণার্জুন করছে, কি সব ভালো ভালো ড্রেস্ আনিয়েছে। ভবেশ রায় নাকি কর্ণ সাজছে।"

বিভুদা অবাক!

"কে ভবেশ রায়? সিনেমার ভবেশ রায়? তবে না লোক ভাড়া

করে আনার নিয়ম নেই, বিনি পয়সায় করতে হবে ?”

“আরে না রে না, ভাড়া করা নয়। ভোঁদাদের পাশের বাড়ির অজানেশ-বাবু যে ওর মামা হয়। সে-ই আনিয়েছে। পয়সাকড়ি দিতে হবে না। ড্রেস্ গুলো ও-ই সস্তায় করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু দাড়ি-গোঁফ এখনো পেঁছয় নি। বুঝলি বিভু, ওরাও চাঁচাছোলা মুখে রিহারসাল কচ্ছে! দুটো স্পাই লাগিয়েছি, তারাই খবর এনে দিচ্ছে। তুই বরং একটা শিশুপালের খবর কর। উঠি—বড়দার সেই মক্কেলের বাড়ি গেলে কিছু চাঁদা পাওয়া যায়। জল তো ধরে গেল। কি রে চাঁদ, যাবি নাকি সঙ্গে ?”

আর বলতে হল না, পাঁচ মিনিটে শুকনো কাপড় পরে আমি ছোটকার সঙ্গে রওনা।

চার

মক্কেলের বাড়ি যেতে হলে পুলের মাথা পার হতে হয়। আড় চোখে একবার বাঁকের ধারে আমাদের বাড়িটাকে দেখে নিলাম। গাছ-গাছলায় ঢাকা পুরোনো তিনতলা বাড়ি, চাঁদের আলোতে নদীর ধারে চুপচাপ পড়ে রয়েছে। চাতালটা একেবারে জলের কিনারা ঘেঁষে এগিয়ে রয়েছে, ওরই নীচে এত ব্যাপার কে বলবে! হাসি পেল।

ছোটকা হঠাৎ বললেন, “কি রে, নাটক প্রায় ডোবে আর তোর হাসি পাচ্ছে, চাঁদ ?”

চোখ তুলে চেয়ে দেখি রেলের লাইনের খুপরি ঘরের সেই লোকটা লাল গামছা কেচে টগরফুলের গাছের উপরে মেলে দিচ্ছে। আমার সঙ্গে চোখা-চোখি হতেই গম্ভীর মুখ করে একদৃষ্টে এমন করে চেয়ে থাকল যে আমার বুকের ভেতর জোরে জোরে হাতুড়ি পিটতে লাগল। কতখানি দেখতে পায় কে জানে।

ছোটকা বললেন, “নাও, অমন ঢিমেতেতালা চালে চললে তো হবে না, সমরেশবাবু একবার তাসের আড্ডায় বসে গেলে আর কোনো দিকে হুঁশ থাকবে না।”

সমরেশবাবুর দলের লোকেরা তখনও এসে জোটে নি, তাই আমাদের দেখে তিনি মহা খুশি। তক্তপোশের কোনায় একটা রোগা লোক বসে

ছিল, তাকে দিয়ে আমাদের জন্য পান আনিয়ে বললেন, "দ্যাখ্ বটু, পাঁচ টাকার নয়া পয়সা ভাঙানি দিতে পারিস্ ? এই তাস খেলে-খেলেই দেউলে হতে হবে দেখছি।"

ছোটকা বললেন, "সে আমি এক্ষুণি এনে দিচ্ছি দাদা, কিন্তু তার আগে আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ ছিল। ঐ পুজোর নাটক প্রতিযোগিতা নিয়ে—"

সমরেশবাবু লাফিয়ে উঠলেন,

"অ্যাঁ! আবার ঐ পুজোর নাটক ? ভোঁদারা আমাদের গোটা বাড়িটার একরকম ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছে ওদের স্টেজ সাজাবে বলে! তোমার বৌদির গয়না, বেনারসি কাপড় কিচ্ছু বাদ যাচ্ছে না। একে যদি নাটক বলে তবে বর্গির হাঙ্গামা কাকে বলে বাপ ?"

দুচোখ কপালে তুলে ছোটকা বললেন, "অমনি ওদের হাতে তুলে দিলেন সব ? দেখুন দাদা, এক পাড়াতে মানুষ হয়েছি, একরকম বলতে গেলে ও আমার ভাইয়ের মতো, কিন্তু সেদিন ক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে আপনার নামে যেসব কথা বলছিল দাঁড়িয়ে শোনা মুশকিল হচ্ছিল।"

সমরেশবাবুর মুখটা অমনি গম্ভীর হয়ে গেল। "কি, বলছিল কি ?"

"সে আর কানে তুলবেন না দাদা, ওসব লোকদের কথা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।"

"তবু শুনিই না কি বলছিল।"

"বলছিল যে ওরকম ঢের ঢের বড়লোক দেখেছি, দোকানদারি করে সব এক-একটি চাঁই হয়েছেন। ঘটে যে শুধু গোবর ছাড়া আর কিছু নেই, সে একবার ওর তাস খেলা দেখলেই বোঝা যায়! আরও কি সব বলছিল। এমনি ছ্যাঁচোড়! অথচ আপনি ওদেরই সাহায্য করছেন আর আমাদের বাড়ির এতকালের পুরোনো ক্লাবটা যে উঠে যেতে বসেছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই।"

রাগে সমরেশবাবুর ঝোলা ঝোলা গোঁফের ধারগুলো মুখের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল। সেগুলোকে বের করে না ফেলেই গুম হয়ে বসে থাকলেন। গিলে ফেললেই তো হয়ে গেল! হঠাৎ সেই রোগা লোকটির দিকে ফিরে চাপা গলায় বললেন, "এ সব কি শুনছি, নোটো ?"

নোটো বললে, "সব মিছে কথা স্যার। ঐ মোটা লোকটার একটা কথাও বিশ্বাস করবেন না। আবার সঙ্গে করে ছোট ছেলে নিয়ে

এসেছে মন গন্নাবার জন্যে। এবার আমাকে উঠতে হয়, তা হলে চাঁদাটা—"

ভীষণ রেগে গেলেন সমরেশবাবু, তক্তপোশে কিল মেরে বললেন, "কিচ্ছু দেব না, এক কানাকড়ি চাঁদা কাকেও দেব না—তুমিও শুনে রাখো বটু—তবে যাদের নাটক সবচেয়ে ভালো হবে তাদের পাঁচশো টাকা বকশিশ দেব।—যাও এখন। বটু, আমার ভাঙানি নয়া পয়সা ?"

"এই যে আনছি—" এই বলে এক দৌড়ে ছোটকা কোত্থেকে যেন এই বড় এক পুঁটলি নয়া পয়সা এনে দিলেন। আমি তক্তপোশের ধারে রোগা লোকটার পাশে কাঠ হয়ে বসে থাকলাম। কেউ কোনো কথা বলল না।

পথে বেরিয়ে নোটো বললে, "দিলেন তো দাদা সব ফেঁসে! আমি অনেকটা পাকিয়ে এনেছিলাম, আজ রাতে কি আপনার না এলেই নয় ? —ও হ্যাঁ, আপনাদের শিশুপালকে নাকি কান ধরে নিয়ে গেছে ?"

বোধ হয় ভেবেছিল ছোটকা রেগে যাবেন। ছোটকা কিন্তু হেসে বললেন, "এক শিশুপাল গেল, তার বদলে আরো ভালো শিশুপাল আসবে। চুটিয়ে সাজাব স্টেজ, বলবেন গিয়ে ভোঁদাকে। পাঁচশো টাকা যখন সমরেশবাবু দেবে তখন আর ভাবনা কি ?"

"আহা, ফাস্ট হলে তবে তো!"

"ঐ একই হল, আমাদের নাটক করা মানেই ফাস্ট হওয়া।"

নোটো রেগে হনহনিয়ে এগিয়ে গেল। আমাদের রাস্তায় ঢুকেই ছোটকা বললেন, "একটা ভালো শিশুপাল যোগাড় হয় কি করে তাই ভাবছি। দাদাকে বলে দাড়িগোঁফের ব্যবস্থাটা করে ফেল্ শিগগির।"

আমি বললাম, "তুমি যে এক্ষুণি বললে পাঁচশো টাকা পাচ্ছ, আর ভাবনা নেই!"

"নাঃ, তুই নিতান্ত গাধা দেখছি। আরে শত্তুরকে ওরকম বলতে হয়, তাও জানিস্ না ? ওদেরও টানাটানি যাচ্ছে। গত বছর একসঙ্গে কাজ হয়েছিল, অনেক চাঁদা উঠেছিল। এবার দু দল হয়েছে, চাঁদাও ভাগাভাগি। তার উপর ওদের জিনিসপত্রও কিছু কিছু খোয়া গেছে নাকি শুনছি। কারও এখন মাথার ঠিক নেই। খুব সাবধানে এগুনো দরকার।"

খুপরি ঘরের লোকটা দেখলাম একটা লণ্ঠন তুলে চারদিকে চেয়ে দেখছে। লণ্ঠনের একদিকে লাল কাচ, অন্যদিকে সবুজ কাচ। অনেক দূর থেকে লণ্ঠনটাকে দেখা যায়, তার চারপাশ দিয়ে আলো বেরুচ্ছে, কিন্তু

লণ্ঠনটা দিয়ে বেশি দূর দেখা যায় না।

রাস্তায় বৃষ্টির জল জমা হয়েছে, ছোটকা গিয়ে খুপরি ঘরের উঁচু জায়গাটাতে উঠলেন, আমিও পিছনে পিছনে গেলাম। ওখান থেকে একবার দেখা দরকার।

বুকের ভেতরে হঠাৎ ছ্যাঁত করে উঠল, যদি দেখি কালো-মাস্টার জলের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে আছে! ছোটকা অমনি হৈ চৈ করে একটা কাণ্ড বাধাবেন, এদিকের ঘাট থেকে নৌকো নিয়ে ঘুরে ওখানে গিয়ে উপস্থিত হবেন। ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিলাম, তাকাতে ভয় করছিল। আস্তে আস্তে চোখ ঘুরিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, নাঃ, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না!

রাত্রে নরম নরম আটার লুচি হয়েছিল, তার সঙ্গে ছোলার ডাল, বেগুনভাজা আর ডিমের ডালনা। বড়কাকিমা কি ভালো পায়েস করেছিলেন! রান্নাঘরের দাওয়াতে রঙচঙে আসনে সারি সারি বসে পাত পেতে সবাই খেলাম।

আমাদের খাওয়া হলে ঐখানে কাকিমারা সবাই বসলেন, বড়রা উঠোনের মস্ত গন্ধরাজ গাছের নীচে তক্তপোশের উপর বসে নাটকের কথা বলতে লাগলেন।

ভোঁদার উপরে বড়কাকা ছাড়া সকলের কি রাগ! বড়কাকা পান চিবোতে চিবোতে খালি খালি বলতে লাগলেন, "তোরা যাই বলিস না কেন, কাপ নেবে ওরাই। ওদের সঙ্গে তোদের তুলনা! ছোঃ! কি কাজের ছেলে ভোঁদা, আমাদের নতুন দোকানঘরের জন্যে দু-গাড়ি সিমেণ্ট পাইয়ে দিয়েছে। দিয়েছি একটা মোটা চাঁদা। অনেক খুঁটিনাটি জিনিস ওদের কেনা বাকি আছে বলছিল। কোথায় নাকি সাজের জিনিস আনতে লোক পাঠিয়েছিল, তার কোনো পাত্তা নেই। ভারি ভাবনা ওদের। দেখছিলাম রিহারসাল, চমৎকার প্লে করছে; শিখে নিলে পারিস।"

শুনে কাকিমাদের পর্যন্ত পিত্তি জ্বলে গেল। ছোটকা, মেজোকাকা, বড়দা, মেজদা, বিভুদা সব রেগে উঠে গেল। বড়কাকা আরেকটু চুন দাঁতে লাগিয়ে বললেন, "কি হল? বাবুদের বুঝি রাগ হল? তা তোরাও ওদের মতো ভালো হ না, তোদেরও প্রশংসা করব। তুই যে বড় বসে থাকলি, চাঁদ?"

বড়কাকিমা বললেন, "ও তো আর নাটক করছে না, ওর উঠে যাবার কি আছে?"

"কেন, ওকে বাদ দিয়েছ কেন ? ছোট পার্টও তো আছে।"

"বিভু বলছিল ও তেমন পারবে না, তাছাড়া পাড়ার পাঁচটা ছোট ছেলেকে বাদ দিয়ে তো আর ওকে দেওয়া যায় না, এরা কি মনে করবে ! হাজার হোক ও থাকে কলকাতায়। তবে বাদ দেওয়া হয়েছে সে আবার কেমন কথা ? ও তো বটঠাকুরকে বলে সমস্ত দাড়িগোঁফের ব্যবস্থা করছে। সেও তো একটা বড় কাজ।"

বড়কাকা অবাক হয়ে গেলেন।

"দাদা দাড়িগোঁফ কিনে দেবে, এ তো ভারি আশ্চর্য ! এরা নাটক করছে শুনে তো ওকে আসতেই দিচ্ছিল না। নাকি যত রাজ্যের বখা ছেলেদের আড্ডা হবে, এইসব বলছিল। তা বাপু নাটক না হলেও তো আর বখা ছেলেদের এড়াতে পারবি নে, তারাই যখন ওর খুড়ো, ওর দাদা। কি বলিস্ চাঁদ ?"

ততক্ষণে কাকিমারা উঠে পড়েছেন, আর বামুনদিদি কাঁসিতে করে গোছা গোছা লুচি আর বেগুন-ভাজা আর ঘরে-করা সন্দেশ, ভাঁড়ারঘরের সামনে জালের আলমারিতে সকালের জলখাবারের জন্যে তুলে রেখেছে। আমি তখন উঠে গেলাম।

একতলাতেই আমার ঘর। জানলার সামনে গঙ্গা, খাটে শুয়ে সেইদিকে চেয়ে চেয়ে প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল সে লোকটা তো সেই চাট্টি কুচো নিমকি আর একটা মুড়ির মোয়া ছাড়া আর কিছু খায় নি।

অমনি চট করে উঠে পড়লাম। বাড়ি ততক্ষণে নিঝুম হয়ে গেছে। জালের আলমারি থেকে গোটা কুড়ি লুচি, বেগুনভাজা, সন্দেশ এইসব নিয়ে আমার বয়স্কাউটের থলিতে ভরলাম, জলের বোতলে জল ভরলাম। এ তল্লাটে কেউ নেই যে কিছু বলবে। বামুনঠাকরুনের বাড়ি কাছেই, সে রাত দশটায় চলে যায়, চাকররা সারি সারি দালানে শোয়। সামনে বৈঠকখানা-ঘরের পাশে ছোটকার ঘর, তার পাশে বিভুদার ঘর। মাঝ-খানের দরজা খোলা থাকে, বিভুদার বড্ড ভূতের ভয় ! অবিশ্যি বলে নাকি রাতে যদি ছোটকাকে বোঙায় ধরে, তাই খুলে রাখে।

খিড়কির দরজা খুলে গেলাম চলে পেরিস্তানে। পিঠে থলি আর জলের বোতল ঝুলছে, গলায় দড়ি-বাঁধা টর্চ, পেন্সিলের মতো ছোট। ছোটমামা জন্মদিনে দিয়েছিল।

পাঁচ

বিশে অন্ধকারকে ভয় পায় না। বলে, "ভয় আবার কিসের, কেই বা আমাকে দেখতে পাচ্ছে অন্ধকারে!" ওদের দ্বীপের পথে আলো জ্বলে না। চাঁদ না থাকলে হাজার হাজার তারার আলোতে পথঘাট ফুটফুট করে! ওদের দ্বীপের মাঝখানের স্থির জলে বিরাট বিরাট কচ্ছপ থাকে, তারা রাত্রে জল থেকে ডাঙায় উঠে ঘুমোয়, অন্ধকারে তাদের বড় বড় পাথরের মতো দেখায়।

সমুদ্রের ধারে কালো পাথরের উঁচু পাড়ি, তার ধাপে ধাপে বুনো হাঁসদের বাসা। রাত্রে তাদের সাদা-সাদা ছায়ার মতো দেখায়। শীতের শেষে দল বেঁধে তারা উত্তর দিকে উড়ে যায়। সমুদ্রের উপর দিয়ে সামনে উড়ে চলে, ভয়-ডর নেই।

কিন্তু খিড়কির পাঁচিল বেয়ে কিছুদূর গেলেই দু-বাড়ির ছায়া মিশে সে যে কি দারুণ অন্ধকার তৈরি করে রেখেছে সে আর কি বলব। তার অনেক নীচে জলের শব্দ। সামনে বেলগাছের পাতা বাতাসে খড়খড় করছে।

চলে গেলাম সেখান দিয়ে পেরিস্তানে। লোকটা কপালে হাত দিয়ে জলের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। আমাকে দেখে দারুণ চমকে উঠল। সাহস দিয়ে বললাম, "এ যে আমি, তোমার কোনো ভয় নেই। তোমার জন্য খাবার এনেছি।"

সে খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল:

"এনেছ? আঃ, বাঁচালে! সর্বদাই আমার কিছু-না-কিছু খাওয়া চাই। নইলে দুর্বল হয়ে যাই। কই, দাও কি এনেছ।"

খেতে খেতে বার দুতিন আমার দিকে তাকাল। কিন্তু আমি টর্চটা জ্বালতেই ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠল।

"ও কি কর কত্তা, ও যে একেবারে কাঁচড়াপাড়ার ওধার থেকে চোখে পড়বে, অন্ধকারে খোলা চোখের মতো জ্বলজ্বল করবে। ও কাজও কোর না। দুদিন একটু হাড় কখানিকে জিরিয়ে নিই। পৃথিবীতে যে এমন একটা শান্তির জায়গা আছে, এ আমি ভাবতেও পারি নি। চাট্টি ভোগ

সমুদ্রের ধারে কালো পাথরের উঁচু পাড়

করে নিই। তারপর আবার সেই কুমির-কুমির খেলায় নামতে হবে তো! —এত বড় বাড়ি তোমার, আমাকে একটা চাকর করেও তো রেখে দিতে পার। তবে আমি অন্য চাকরদের সঙ্গে শোবটোব না, আমাকে আলাদা ঘর দিতে হবে। এই ঘরেই আমার চলে যাবে, এর বেশি কিছু আমার দরকার নেই।"

"লোকটার কথা শুনে আমি অবাক! বললাম, "এ বাড়িটা মোটেই আমার না। তাছাড়া তুমি কি কাজ করতে জান যে চাকর রাখব?"

লোকটা ততক্ষণে খাওয়া সেরে, নদীর জলে হাত মুখ ধুয়ে আমার কাছে এসে বসেছে। বললে, "চাকরি কত্তে হলে কাজ জানা চাই এ কথা তোমাকে কে বললে? আমি খুব ভালো আঁকতে পারি। ঐ যারা সব বড় বড় সোনার মেটেল পায় আর খেতাব পায়, আমি তাদের চেয়েও ভালো আঁকতে পারি।"

"পার তো তুমি সোনার মেডেল পাও না কেন?"

"তার অনেক অসুবিধে আছে কত্তা। আমি তো আর কাগজে আঁকি না।"

"কাগজে আঁক না তো কিসে আঁক?"

"সে আছে সব, কত্তা, বলব একদিন।"

দূরে গির্জার ঘড়িতে রাত বারোটা বাজল। উঠে দাঁড়ালাম, এখন ঘুমোতে যেতে হয়। লোকটা হঠাৎ ফিরে আমার পা দুটোকে জড়িয়ে ধরে বলল, "দাও কত্তা, দুটো পায়ের ধুলো দিয়ে কেতাথ করে দাও। আহা ঠাঁই দিয়ে, আহার দিয়ে প্রাণটা বাঁচালে গো। নইলে পরের জিনিস ঘাড়ে করে বয়ে বেড়াচ্ছি, আমাকে এমন বন্ধু কোন্ দেবতা দিত হ্যাঁ!"

ঘরে ফিরে শুয়ে শুয়ে লোকটার কথাই ভাবতে লাগলাম। কালো-মাস্টার আবার একটা নাম নাকি? নিশ্চয় ছদ্মনাম। বিশেটাও এর মধ্যে আর আসে নি, ও লোকটা যদ্দিন থাকবে আর আসবেও না। উঃ, পাঁচিল চড়ে চড়ে পায়ে কি ব্যথা! বাড়িতে আমাদের বুড়ো চাকর পাঁচুদা রোজ আমার পায়ে তেল মালিশ করে দিত; কিন্তু এখন থেকে আর দিতে দেব না। পাঁচুদা আমার খাবার সময় পাশে দাঁড়িয়ে থাকত, মাছের কাঁটা বেছে দিতে চাইত। দেব ভাগিয়ে। যারা বেশি পুতুপুতু করে মানুষ হয়, বিশে তাদের নাড়ুগোপাল বলে।

ওদের দ্বীপে নাকি চাকর নেই। যে যার নিজের কাজ নিজে করে। আমি আজকাল রোজ আমার গেঞ্জি কেচে স্নানের ঘরের জানলায় মেলে দিই।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাই নি। সকালে ঘুম ভেঙে শুনি রান্নাঘরের দালানে বামুনদিদি মহা রাগমাগ করছে। বাসন মাজে তারিণী, তাকে বলছে, "একেবারে বক-নাক্কস গো। রোজ ডুলি খুলে আটদশখান লুচি খেয়ে নেয়, কিন্তু কাল রাত্তিরে একেবারে এক দিস্তে সাবাড়! ঐ বিভুদাদার কপালে অনেক দুঃখু আছে এই আমি বলে দিলাম।"

বিভুদাও দালানের ওধারে নিমকাঠি দিয়ে দাঁতন করছিল। কথা শুনে সে তো চটে লাল!

"শুনলে ছোটকা? মোটেই আমি লুচি খাইনি, বামুনদির কথা শোনো একবার!"

বামুনদিদি ঝনর ঝনর করে বাসন নামাতে নামাতে বলল, "না খায় নি। লুচিগুলো কপ্পূর হয়ে উবে গেছে! কাল দুধের দাঁত পড়তে দেখলুম, আর আজ মুখ থেকে সকালবেলায় কেমন মিছে কথা বেরুচ্ছে দেখেছ! আজ তোমাকে শুকনো তোচ্ দেওয়া হবে দেখো।"

দুমদাম করে পা ফেলতে ফেলতে বামুনদিদি লুচি গরম করবে বলে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। বিভুদা গজর গজর করতে লাগল, আমি স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

সত্যিই কোথাও একটা ভালো শিশুপাল পাওয়া গেল না। ছোটকা অনেক বলাতে বড়কাকা প্রকাশদার বাবাকে বোঝাতে গিয়েছিলেন, তা তিনি নাকের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বড়কাকিমা বললেন, "ঐ ব্রজেনদাই হল গিয়ে নষ্টের গোড়া, ওকে তোরা পাঁচজনে মিলে দুটো কথা শুনিয়ে দিতে পারিস্ নে? ও-ই যখন ভাগিয়ে দিয়েছে, ও-ই আনুক না একটা শিশুপাল।"

বিভুদা হাঁই হাঁই করে ছুটে এল, "আঃ মা, তুমিই সব ডোবাবে দেখছি! বাইরের ঘরে ব্রজেনদা ছোট্কার সঙ্গে ফর্দ করছেন, কথাগুলো ওঁর কানে গেলেই হয়েছে আর কি?"

বড়কাকিমাও রেগে গেলেন, "তুই থাম দিকিনি, আমার উপর আর কর্তৃত্ব করতে হবে না। কেন বলব না সত্যি কথা, একশোবার বলব।"

বিভুদা প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি।

"আঃ, মা, কেন বোঝ না যে শুনতে পেলে ব্রজেনদা যদি রেগেমেগে চলে গিয়ে ভোঁদার দলে যোগ দেয়, তখন কি তুমি শ্রীকৃষ্ণ সাজবে নাকি ?"

সেখানে যারা ছিল সব্বাই হাসতে লাগল। বড়কাকিমা রেগেই ছিলেন, চেঁচিয়ে বললেন, "তা অত হাসবার কী আছে এতে ? পারব না নাকি শ্রীকৃষ্ণ সাজতে তোরা ভেবেছিস্! জানিস, ইস্কুলের প্রাইজে আমি আওরঙ্গজেব সেজেছিলাম ? ইয়া গোঁপ এঁকে দিয়েছিল, সে আর কিছুতেই ওঠে না। —সে যাক গে, কিন্তু তুই শ্রীকৃষ্ণ সাজিস্ না কেন রে বিভু ?"

বিভুদা আমতা আমতা করতে লাগল।

"ইয়ে—না—মানে—আমি দ্বিতীয় পাণ্ডব সাজছি কি না—"

"আহা, ভারি তো দ্বিতীয় পাণ্ডব সাজছিস্, তিন লাইন তো কথা বলতে হবে। ও পার্টটা চাঁদকে দিয়ে, তুই শ্রীকৃষ্ণ সাজলেই পারিস্। তুই যখন হলি, দেশ থেকে আমার ধাই-মা তোকে দেখতে এসেছিল। চেয়ে চেয়ে আর চোখ ফেরাতে পারে না। বললে, আহা, ঠিক যেন নীল পদ্মের কুঁড়ি, তেমনি রঙ, তেমনি ঢঙ, মানুষ বলে তো মনে হয় না গো ! শ্রীকৃষ্ণ তোকেই মানাবে।"

বিভুদা ঢোঁক গিলে বললে, "না, মানে, আমি একটু—মানে শ্রীকৃষ্ণ বেশ রোগা ছিলেন কিনা—তা ছাড়া চাঁদের পেটে বালিশ বেঁধে দিলেও ওকে ভীমের মতো দেখাবে না। কি লিকপিকে হাত-পাগুলো দেখেছ ! গোলমরিচ খেলে হেঁচকি ওঠে !"

বলে বড়কাকিমার সামনে আমার হাতের গুলি সেই রকম করে টেনে দড়কচা বানিয়ে দিল। আমার ভীষণ রাগ হল, বড়কাকিমার ওপাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, "আহা ! তুমি তো কুকুরে ভয় পাও ; পাণ্ডবদের সঙ্গে যে কুকুরটা স্বর্গে গিয়েছিল, তাকে দেখলে তো তুমি ভয়ে পালিয়ে যেতে ! আর আমার বন্ধু বিশের মস্ত পোড়া হাঁড়ির মতো মুখওয়ালা কুকুর সিংহকে দেখলে তো তোমার পতন ও মুচ্ছো হয়ে যাবে ! তোমার চোখ উল্টে যাবে।"

আমার সাহস দেখে দারুণ অবাক হয়ে বিভুদার মুখে আর কথা সরে না ! তারপর বললে, "বিশে ? দেখলে মা, এত বারণ করা সত্ত্বেও পাড়ার বখা ছেলেদের সঙ্গে ভাব করেছে। এবার খারাপ কথা বলতে আর বিড়ি ফুঁকতে শিখতে কদ্দিন ! জ্যাঠামশাই শুনলে কি বলবেন

বল তো, তোমাদেরি দোষ দেবেন দেখো।"

অমনি বড়কাকিমা চোখ গোল গোল করে খপ করে আমার কাঁধ ধরে ফেললেন—

"কোথায় পালাতে চেষ্টা করছিস, চাঁদ? বিভু যা বলল সে-সব কি সত্যি? কে ঐ বিশেটা? নাম শুনেই মনে হয় একটা গুণ্ডা পালোয়ান কেউ। কোথায় ওর সঙ্গে তোর দেখা হল বল্ শিগ্গির। পাড়ার যত সব বয়ে-যাওয়া বাজে ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা! বিশে নিশ্চয় ফণি মিত্তিরদের বাড়ির কেউ?"

আমি তো পালাবার পথ পাই নে। রাগের মাথায় বিশের নাম করে ফেলাটা যে কত বড় অন্যায় হয়ে গেছে বুঝতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু থামতে পাচ্ছিলাম না। বিভুদাদের কথায় গা জ্বলে যাচ্ছিল। এদিকে বিভুদাও বারবার বলছে, "বল্, কে ঐ বিশে! ঐ ভোঁদাদের দলের কেউ নাকি? ওঃ! তা হলে এবার বোঝা গেল ভোঁদারা আমাদের ভেতরকার সব খবর কোত্থেকে পায়। বিশ্বাসঘাতক! স্পাই! গুপ্তচর! টিকটিকি!"

শেষটা আমি রেগে চেঁচিয়ে বললাম, "না, না, না, না,—বিশে তোমাদের পাড়ার কেউ নয়। এ পাড়ার কেউ ওকে চেনেও না, ও মোটেই বখাটে বয়ে-যাওয়া স্পাই নয়। তবে ওর গায়ে ভীষণ জোর, বিভুদাকে ও এক হাতে পটকে দিতে পারে, ও কাউকে ভয় পায় না, ও—ও—"

বড়কাকিমা বললেন,

"আহা! ওরকম কচ্ছিস কেন চাঁদ? ওর সঙ্গে তোর কোথায় দেখা হল? তোর বাবা-মা তোকে আজেবাজে কারো সঙ্গে মিশতে দেন না বলেই বলছি।"

আমি আবার চেঁচাতে লাগলাম, মোটেই বিশে আজেবাজে লোক নয়! বিশে কি ভালো! হাঙরমুখো নৌকো চেপে কুকুর নিয়ে আসে!"

"কোথায় আসে?"

"পেরিস্তানে।"

কাকিমা আর বিভুদা তো হাঁ! 'পেরিস্তানে? পেরিস্তান আবার কোন্ জায়গা!'

"হ্যাঁরে, তোর শরীর খারাপ লাগছে না তো রে! গত বছরের আগের বছর যে রকম ম্যালেরিয়াতে ভুগলি, শরীরটাতে সেই ইস্তক আর কিছু নেই!"

আমি বললাম ঃ "না, বিশে বলেছে খুব ভালো আমার শরীর, ওসব যত রাজ্যের বাজে বানানো কথা! কিছু হয়নি আমার! পুতুপুতু করা ভারি খারাপ! ওরকম করলে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাব বলে রাখলাম!"

এই বলে ফস্ করে বড়কাকিমার হাত থেকে গলে বেরিয়ে, একেবারে নিজের ঘরে দরজা দড়াম ও ছিটকিনি! কারো কথায় দরজা খুলি নি, গোঁজ হয়ে অনেক বেলা অবধি ঘরে বসে থাকলাম। তারপরে যে যার নিজের কাজে চলে গেলে, বাইরেটা চুপচাপ হয়ে গেলে, গুটিগুটি বেরিয়ে এসে একটা গোটা পাঁউরুটি আর দুটো বাসি আলুর চপ আর একছড়া কলা ডুলি থেকে বের করে এনে আমার ঘরে লুকিয়ে রাখলাম। বিকেলের জলখাবারের আগে খোঁজ হবে না জানতাম।

আমাকে স্নান করে সকলের সঙ্গে খেতে বসতে দেখে বড়কাকিমা আর বিভুদা যেমনি অবাক হল, তেমনি হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ঠিক জব্দ হয়েছে! আমি বাড়ি ছেড়ে পালালে বাবা আর ওদের কাউকে আস্ত রাখবে না! হয়তো এ বাড়ি থেকেই তাড়াবে! রাখি-পিসিমা বলেছে, ঠাকুরদার ঠাকুরদার বাবার তৈরি এই বাড়িটা নাকি বাবার ভাগে পড়েছে, তাই বাবাকে কেউ চটাতে চায় না। আসলে অবিশ্যি রাখি-পিসিমার ছেলে হরিশেরই নাকি বাড়িটা পাওয়া উচিত ছিল, কারণ ও বাবার চেয়েও বয়সে বড় আর খুব ভালো মাউথ-অর্গ্যান বাজায়।

যাই হোক, আমি আছি দেখে সবাই যেন নিশ্চিন্ত। এমন কি বিভুদাকে ছোটকা বললেন, "চাঁদকে বলেছিস্ নাকি।"

বিভুদা মাথা নাড়ল। ছোটকা বললেন, "দেখ চাঁদ, তুই দ্বিতীয় সৈনিক হবি আর অমরেশকে ঐ মৃত সৈনিকের পার্টটা দিচ্ছি। ওটা খুব সহজ, বেশি রিহারসাল লাগবে না, একবার শুধু কোঁত শব্দ করে পড়ে যেতে হবে, তারপর শিশুপাল বধ হওয়া পর্যন্ত, হাত পা এলিয়ে পড়ে থাকতে হবে।"

বিভুদা বললে,

"আসলে ঐ পার্টটাই তোকে দেবার কথা হয়েছিল, বেশ পালক-দেওয়া শিরস্ত্রাণ পরতে পেতিস। কিন্তু ছোটকা বলছে, তুই স্টেজে শুলে ফুট-লাইটের ওপর দিয়ে তোকে দেখাই যাবে না, আর অস্ত্রশস্ত্রগুলোও বড্ড বড়।"

খেয়ে উঠে কাগজে লেখা পার্টটা পকেটে নিয়ে আবার ঘরে গিয়ে দোর দিলাম। সবাইকে বললাম ঘুম পাচ্ছে, কেউ যেন বিরক্ত না করে। ঘরে

ঢুকে দরজা বন্ধ করে, খিড়কির বাগানের দিকে স্নানের ঘরের দরজা খুলে তিন মিনিটে পেরিস্তান পৌঁছে গেলাম।

দেখলাম কালো-মাস্টারের মেজাজ ঠিক নেই। বললে, "এই এত্ত বেলা করে ঐ রকম শুকনো খাবার আনলে? কই, আমার মাছ তরকারি ভাত কই? নিজে তো একরাশ গিলে এসেছ!"

বললাম, "অনেক কষ্টে এনেছি। খেতে হয় এই খাও, নয় তো উপোস করে থাকো, আমি চললাম। আমারো মন ভালো নেই।"

বলে যেই উঠে দাঁড়িয়েছি, অমনি সে সটাং মাটিতে শুয়ে পড়ে আমার দু পা জড়িয়ে ধরে বললে, "ক্ষ্যামা দাও কত্তা, খিদের চোটে অন্যায় বলেছি! নয় তো দু ঘা লাগিয়ে দাও, কিচ্ছুটি বলব না! কিন্তু আমাকে ছেড়ে যেও না।"

আমি আবার বসলাম, আর সে সাপটে সুপটে পাঁউরুটি, চপ, কলা সব খেয়ে ফেলল। ভেবেছিলাম বিকেলের জন্য কিছু রাখবে, তাও রাখল না। শেষটা বললাম, "বিকেলে আমার রিহারসাল আছে, রাতের আগে আসতে পারব না, তুমি বরং জলখাবারের সময় কুচো নিমকি আর মুড়ির মোয়া খেও।"

সে যেন আকাশ থেকে পড়ল: "ওমা! মুড়ির মোয়া আবার কোত্থেকে আসবে? সে তো আমি টিপিন খেয়েছি, তোমার দেরি দেখে!"

পকেট থেকে আমার-বাঁদর বিস্কুটের ঠোঙাটা শেষ পর্যন্ত দিতে হল। সে মহাখুশি হয়ে তখুনি দুটো বিস্কুট মুখে পুরে বলল, "ওয়াঃ! এর সঙ্গে অমৃতের যে কোনো তপাত নেই, কত্তা! ও হ্যাঁ, রিহারসালের কথা কি বলছিলে? দেখি পার্টখানা; দিয়ে দোব নাকি এইসা এক মওড়া যে সকলের তাক লেগে যাবে!"

বললাম, "মওড়া আবার কি?"

সে তো অবাক!

"ওমা, নাটক করবে, মওড়া জান না? তালিম গো, তালিম! ঐ যাকে বলে রিহারসাল তাই আর কি।"

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, ও লোকটাই বা অত কথা জানল কি করে?

ছয়

পুরো আধটি ঘন্টা ধরে আমাকে দ্বিতীয় সৈনিকের পার্ট শেখাল কালো-মাস্টার। বলল,

"ওতেও হল না, পাখি-পড়া করিয়ে ছেড়ে দোব কেমন দেখো। বাবা! তোমার থেকে কত বড় বড় বাহাদুরকে অমনি অমনি তৈরি করে দিয়েছি না! পরে যখন তাদের পাখনা গজাল তখন আর আমার কথা মনে পড়ে না। সে যাক গে, আজ ঐ ছ্যাঁদাটা দিয়ে তোমাদের মওড়া দেখব। দেখো, কালো-মাস্টারের মান রেখো।"

একগাল হেসে আমার দিকে তাকিয়ে সে আরও বললে, "কি, হল কি কর্তা? আজ মুখটা অমন গোমড়া কেন? কেউ কিছু বলেছে নাকি? বল তো তার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নিয়ে আসি।"

তখন বলতে হল সব কথা।—"দেখ, আমাকে যা খুশি বলুক গে, তাতে আমার ততটা এসে যায় না। কিন্তু বিশেকে নিয়ে ওরা ওভাবে কথা বললে রাগে আমার গা জ্বলে যায়। বিশের বিষয় ওরা কি জানে যে যা-তা বলবে? তাকে দেখেছে কখনো?"

কালো-মাস্টার গম্ভীর হয়ে গেল।

"কেউ দেখল না বিশেকে, শুধু একা তোমার সঙ্গে ভাব? হ্যাঁ গো কত্তা, অপরাধ নিও না, কিন্তু অমন লুকিয়ে-চুরিয়ে সে আসেই বা কেন? ভালোমানুষরা তো বুক ফুলিয়ে সোজা পথে আসে। শেষটা তোমাকে কোনো বিপদে ফেলে দেবে না তো?"

"শুনে আমি লাফিয়ে উঠলাম, কি যে বল কালো-মাস্টার! তুমি বিশেকে জান না তাই ওরকম বলছ। এ বাড়ির লোকরা এত খারাপ, তা বিশে ওদের সঙ্গে মিশবে কেন? তাছাড়া ঐ সিংহ না, ও তো খারাপ লোক দেখলেই তাকে কামড়ে-টামড়ে একাকার করে দেয়। কি করে আমাদের বাড়ির লোকদের সঙ্গে মিশবে শুনি? আমার মা কিংবা আমার ছোট ভাই নিমকি হলে অন্য কথা ছিল।"

"কালো-মাস্টার আমার আর-একটু কাছে ঘেঁষে বসে বলল, "ও, তোমার মা ভাই তাহলে ওকে চেনে? তবে তো কোনো ভাবনা নেই!"

"না, ঠিক চেনে না, মানে দেখে নি তো কখনো, চিনবে কোত্থেকে! তবে আমি বললেই বুঝবে বিশে কত ভালো। বিশে একবার একলা একটা ডাকাত ধরেছিল তা জানো? ওদের দ্বীপের লোকরা সমুদ্রের তলা থেকে মুক্তো তুলে আনে, সেই মুক্তো একটা ঝুলিতে করে বিশে এখানে বিক্রি করতে এনেছিল। প্রাণে ভয় নেই বিশের, রাত্তির বেলায় অন্ধকার গলি দিয়ে একা যাচ্ছে, অমনি ডাকাত এসে দিয়েছে ঝুলিতে টান! আর যাবে কোথায়, অমনি ঘুরে দাঁড়িয়ে ধরেছে বিশে তাকে! ধরেই পিটিয়ে তাকে আধমরা করে ফেলেছে! তারপর তারই গামছা দিয়ে পাছমোড়া করে বেঁধে তাকে থানার উঠোনে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছিল।"

শুনে কালো-মাস্টারের চোখ ছানাবড়া!

"অ্যাঁ! অমনি ফেলে দিয়ে গেল? দারোগার কাছে জিম্মে করে দিল না? আবার যে ডাকাতি করবে।"

"আরে না না, তাকে নাকে খত দিইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল আর কখনো এমন কাজ করবে না, করলে ওকে চুলচেরা করে দেওয়া হবে বলে শাসিয়ে রাখল। পাগল নাকি, আর ডাকাতি করে সে! বিশের ঐ অসুরের মতো চেহারা দেখেই তার হয়ে গেছে! বিভুদা থেকে থেকে আমাকে ক্যাংলা বলে ডাকে, কিন্তু আমার বন্ধু বিশের সঙ্গে শুধু বিভুদা কেন, ছোটকা বিভুদা বড়দা মেজদা সবাই মিলেও পেরে উঠবে না।"

এই বলে উঠে যাচ্ছি এমন সময় কালো-মাস্টার আমার হাতদুটো ধরে বললে, "ও কত্তা, ঐ শিশুপালের পার্টটা কে করবে বললে না?"

"বলব আবার কি? লোকই পাওয়া যাচ্ছে না।"

"কেন, তোমার ছোটকা সবাইকে শেখাচ্ছেন, উনি নিজে করেন না কেন?"

"আহা, ছোটকা করবেন কি করে? ওঁর যে কিছুই মনে থাকে না, উনি পার্ট মুখস্থ করবেন কি করে? উনি তো রোজ বাজার থেকে ভুলে গিয়ে যা-তা আনেন বলে রাগারাগি হয়। কিছু মনে থাকে না বলেই তো কোনো কাজও করেন না। বড়কাকা কারবার দেখতে বলেন, তা উনি হিসেব রাখতেও ভুলে গেছেন বলে সেখানে যান না। উনি পার্ট করবেন কি করে?"

"কালো-মাস্টার তখন বললে, "তা হলে তোমার বন্ধু বিশেকে পার্টটা দাও না কেন!"

"না না, তাই কখনো হয় ?"

"কেন, ও বুঝি থিয়েটার কত্তে পারে না ?"

ভারি বিরক্ত লাগল। এমন বোকার মতো কথা বলে লোকটা! বললাম, "তা পারবে না কেন ? এসব সামান্য পার্ট করা ওর পক্ষে কিছুই নয়। জানো, ওকে একবার শত্রুরা আর-একটু হলেই ধরেছিল, তখন ও শত্রুদের সর্দার সেজে ওদের নাকের সামনে দিয়ে চলে এসেছিল, কেউ টেরও পায় নি!—বললাম না, ও এ বাড়ির লোকদের সঙ্গে মিশবেই না, তা নাটক করবে কি করে ?"

চলে এলাম আবার নিজের ঘরে। তারপর সেদিনকার রিহারসালে সে কি ঝগড়াঝাঁটি! ভোঁদার দলের দুজন লোক মজা দেখতে এসেছিল নাকি! দিয়েছে বিভুদা তাদের মেরে অপমান করে তাড়িয়ে। এসব অবশ্যি আমার চোখে দেখা নয়। রিহারসাল শুরু হবে এমনি সময় ছোটকা হন্তদন্ত হয়ে চাতালে এসে বললেন, "কই, নগা আর ভোলা আসে নি এখনো ?"

ব্যস্, কারও মুখে আর কথাটি নেই। ছোটকা ব্যস্ত হয়ে ইদিক-উদিক ঘোরাফেরা করতে করতে বলতে লাগলেন, "কি মুশকিল! ওরা দুজনেই শিশুপালের পার্ট করেছে, তাই এত খোশামুদি করে কান্তা কেবিনে চা-চপ খাইয়ে রাজি করিয়ে এলাম; ব্যস্, এখন কারো পাত্তা নেই! তুই একবার নগাদের বাড়িতে যা দিকিনি বিভু, ওর পার্ট একেবারে মুখস্থ হয়ে আছে—যা তো চট করে।"

বিভুদা বললে, "যা তো আবার কি ? দুজনেই শিশুপাল সাজবে নাকি ?"

"আহা, তা কেন! একজন সাজবে শিশুপাল, অন্যজনকে দ্বিতীয় পাণ্ডব করে দেব বলে এসেছি।"

বিভুদা তো থ! "দ্বিতীয় পাণ্ডব ?"

"হ্যাঁ, তাতে অত অবাক হবার কি আছে ? তোকে তেমন মানাচ্ছিল না, তাছাড়া তোর তো আরো চারটে পার্ট আছে। আর অন্য দিকেও কাজ থাকবে, লোকজন আসবে—"

বিভুদা থমথমে মুখ করে বললে, "সেগুলো তো আর ঠিক কথা-বলা পার্ট নয়, শুধু সেজেগুজে ঘুরে বেড়ানো আর মাঝে মাঝে 'যে আজ্ঞে' বলা। সে আমার দরকার নেই, আমি চলি।"

আগ্‌নের ভাঁটার মত চোখ করে কোমরে হাত দিয়ে বড়ুদার সামনে গিয়ে ছোটকা দাঁড়ালেন।...... ..

ছোটকা ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "ও আবার কি বিভু? দুজনকেই পার্ট না দিলে যে কেউই আসবে না। তুই বাড়ির ছেলে তুই এইটুকু ছাড়তে পারবি নে? ওসব পারিসও না তো ভালো।"

শুনে বিভুদা রেগেমেগে চলে যায় আর কি! বড়দা মেজদা তখন মাঝখানে পড়ে বললে, আরে, অত রাগারাগির কি আছে রে বিভু? মেরে তো ওদের তাড়িয়েই দিয়েছিস, ওরা তো আর পার্ট কত্তে আসছে না।"

ছোটকা শুনে হতভম্ব!

"—মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে! তার মানে? আমি তাদের বলে-কয়ে পাঠালাম, রাত্রে খেয়ে যাবে বললাম, ওদের জন্য পরটা কাবাব কিনে আনলাম, আর এখন মেরে তাড়িয়ে দিলেই হল কিনা! যা, ফিরিয়ে আনগে যা।"

বলে আগুনের ভাঁটার মতো চোখ করে কোমরে হাত দিয়ে বিভুদার সামনে গিয়ে ছোটকা দাঁড়ালেন। বাবা! দেখে আমারই কেমন বুক টিপটিপ করতে লাগল। একবার তাকিয়ে বাড়ির ভিতের গায়ের ফুটোটার দিকেও তাকালাম, কালো-মাস্টার আছে তো ঠিক? বাইরে থেকে কিচ্ছু বুঝবার জো নেই।

আরো সব ছিল আশেপাশে। সব নিয়ে একুশটা কথা-বলা পার্ট, তাছাড়া দাঁড়ানো পার্ট, জনতা—সে এক ব্যাপার! চাতালে লোক ধরে না। অথচ কারো পার্ট মুখস্থ নেই, ড্রেসের কিছু ঠিক নেই, দাড়িগোঁফ নেই, আর সবচেয়ে খারাপ হল, শিশুপাল নেই। তারপর বিভুদা যদি রেগেমেগে দলবল নিয়ে চলে যায়, তাহলে তো আমার দ্বিতীয় সৈনিক সাজা ঐখানেই হয়ে গেল।

বিভুদা, মেজদা, কুটুবাবু, ঘনাদা, ঘনাদার মামা আরো কারা কারা ছিল। তারা সবাই মিলে বললে, "আহা, বটু ছাড়ান দাও, ছাড়ান দাও, যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন একটু চায়ের ব্যবস্থা করো দিকিনি। ততক্ষণ রিহারসাল চলুক, তুমি বরং নিজেই শিশুপালের পার্টটা পড়ে দাও না।"

চমকে গেলাম। এ যে একেবারে কালো-মাস্টারের মুখের কথা। ছোটকা আমতা আমতা করে বললেন, "না, মানে, আমি কি করে পড়ব, স্টেজ-ম্যানেজার কে হবে তাহলে?"

আমি বললাম, "কেন, বড়কাকিমা হবেন। উনি তো সব জানেন।"

অমনি বিভুদা পারলে আমাকে মারে আর কি।

"যা যা, তোকে অত ফোঁপরদালালি কত্তে হবে না। দাড়িগোঁফের কি ব্যবস্থা করেছিস ?"

ঘাবড়ে চুপসে আমি এতটুকু হয়ে গেলাম। আমাকেই যে আবার দাড়িগোঁফ আনতে হবে তা মনে ছিল না। আবার মনে হল কালো-মাস্টার তো সবই শুনছে, তার সামনে আমাকে যা-তা বলবে আর আমি কিচ্ছু বলব না! চেঁচিয়ে বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেছি যখন তখন নিশ্চয়ই এনে দেব কোথাও থেকে।"

ছোটকা তো হাঁ। বিভুদা বললে, "কোথাও থেকে মানে ? দাড়িগোঁফ কি গাছে হয় যে তুলে আনলেই হল ? জ্যাঠামশাইকে লিখেছিস্ ?"

উঠে পড়ে বিভুদাকে বললাম, "তুমি তোমার নিজের কাজ কর দেখি! দাড়িগোঁফ পেলেই হলো তো!"

ছোটকা বললেন, "আঃ বিভু, কেবল ওর পেছনে লাগা। এখন কালকের মধ্যে একটা শিশুপাল ঠিক না হলে তো নাটক বন্ধ করে দিতে হবে! তুই একবার নগা ভোলার কাছে গিয়ে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে ফিরিয়ে আনবি কিনা বল্!"

বিভুদা বললে, "সে আমি পারব না। এক চড়েই যাদের জিভ বেরিয়ে যায়, তাদের পায়ে আমি ধরতে পারব না।"

"তাহলে কি হবে ? আমিই একবার চেষ্টা করে দেখব নাকি ?"

বিভুদা দারুণ রেগে গেল—"দেখ ছোটকা, যা ইচ্ছে তাই করে করে তোমার বড্ড বাড় বেড়ে গেছে দেখছি। আমার পার্ট যদি অন্য কাউকে দাও, তোমার নাটক কেমন করে হয় দেখব। এক্ষুনি খনা, নন্টু, বাচন, ভুবন, সব্বাইকে নিয়ে ভোঁদার দলে চলে যাব না! কি রে, তোরা আমার সঙ্গে আছিস্ তো ?"

অমনি তারা সবাই চেঁচাতে লাগল,

"হ্যাঁ ওস্তাদ, আমরা সঙ্গে আছি, আমাদের চপ-কাটলেট খাওয়াও।"

ব্রজেনদা এবার গম্ভীর মুখে এগিয়ে এলেন, "দেখ, নাটক সত্যি হবে কিনা বল। রোজ সন্ধেবেলা প্রাইভেট টুইশন বন্ধ রেখে আসব, আর ঝগড়াঝাঁটি ছাড়া আর কিছু হবে না যদি, তো থাক গে, আমার কাজ নেই।"

ছোটকা ও'র হাত ধরে বললেন, "যাস্ নে ভাই, পরটা-কাবাবগুলো না খেয়ে যাস নে।"

শেষ পর্যন্ত রিহারসাল শুরু হল। ছোটকা শিশুপালের পার্ট ভুলভাল করে পড়তে লাগলেন। আমি কালো-মাস্টার যেমন শিখিয়ে দিয়েছিল তেমনি করে বলে যেতে লাগলাম। শেষের দিকে বড়কাকা এসেছিলেন— শুনে বললেন, "বা! বা! তুই যদি আরো এক গজ লম্বা হতিস্ তো তোকেই শিশুপাল করে দিতাম।"

ছোটকা বিরক্ত হয়ে বললেন, "থামো মেজদা, ঠাট্টার সময় ইয়ার্কি ভালো লাগে না।"

সাত

অনেক রাত্রে কালো-মাস্টারের খাবার নিয়ে গুটিগুটি পেরিস্তানে গেলাম। সে তো ঐ খাবার দেখেই রেগে কাঁই! বলে, "খিদেয় পেট জ্বলে গেল, আর এই অর্ধেক রাত কাবার করে শুধু ক্ষীর আর পাঁউরুটি আর কলা আনলে। আমার মাংস-ভাত কই?"

আমি ভেবেছিলাম দেখা হলেই বুঝি কালো-মাস্টার আমার অভিনয়ের সুখ্যাতি করবে; তা নয় উল্টে আবার রাগ দেখানো হচ্ছে। বললাম, "কত কষ্ট করে আনতে হয়, তা তো জান না। ভাত পাব কোথায় শুনি? ডুলি খুলে যা পাই তাই আনি। তাই নিয়ে আবার কত কথা হয়। কত রাগারাগি! তা ছাড়া ভাতের চেয়ে আটা-ময়দা খাওয়া অনেক ভালো।"

কালো-মাস্টার মুখের গ্রাস নামিয়ে রেখে বললেন, "কে বলেছে পাঁউরুটি আটা-ময়দার তৈরি? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শুধু কতকগুলো ফুটো দিয়ে তৈরি। ময়দা দিয়ে কতকগুলো ফুটো একসঙ্গে জুড়ে দিয়েছে, সে কখনো খাওয়া যায়?"

বলে আবার চোখের কোণ দিয়ে আমার মুখটা চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। আমি ঘাসের উপর ওর পাশে বসে বললাম, "দেখ, একটা কাজ করলেই তো পার। রাত্রে এদিকে কেউ থাকে না, তুমি তোমার নৌকোটা করে, আস্তে আস্তে তীরের কাছ দিয়ে দিয়ে গিয়ে কান্তা কেবিন থেকে মাংস-

ভাত কিনে খাও না কেন? ওদের নিজেদের ছোট ঘাট আছে। অনেক মাঝি ওখানে এসে, রান্নাঘরের পেছনে জলের ধারে বসে এত্ত বড় বড় থালায় করে ভাত খেয়ে যায় দেখেছি। লাল লঙ্কা দিয়ে ভাত মেখে খায়। সামনে নৌকো বাঁধা থাকে—"

কালো-মাস্টার হঠাৎ হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরল, "আর বোলো না, কত্তা, জিবে জল ঝরতে লেগেছে। কান্তা কেবিনটা কোথায়?"

কিন্তু কান্তা কেবিন যাবার পথে একটা বিপদ আছে। মাঝখানে পড়ে ঐ রেলের লাইনের সেই লোকটার খুপরি ঘর। সে যদি একবার টের পায়! টং লিং—টং লিং—টং লিং করে লম্বা একটা মালগাড়ি পুল পার হতে লাগল। দেখি লোকটা তার সে জায়গায় দাঁড়িয়ে লাল সবুজ লণ্ঠন তুলে ধরেছে আর বার বার এদিকে তাকাচ্ছে। কিছু দেখা যায় না জানি, তবু খানিকটা সরে বসলাম।

কালো-মাস্টার বললে, "বেশি পহা চাইবে না তো? আমার বড় টানাটানি যাচ্ছে এখন। অথচ দেশের বাড়িতে সোনাদানা গড়াগড়ি যায়। এই গোছা গোছা কাঁসার থালা, তার এক-একটারই ওজন হবে আড়াই সের, আর আমি কিনা একটা ছেঁড়া খবরের কাগজের টুকরোতে একটা নোংরা হাতলভাঙা পেয়ালা বসিয়ে, শুকনো পাঁউরুটি চিবুচ্ছি!"

এই বলে এক টুকরো পাঁউরুটি ছিঁড়ে ক্ষীরে ডুবিয়ে জবজবে করে নিয়ে মুখে পুরল। কাল হবে একচোট ঐ ক্ষীর নিয়ে। নাকি মালপো হবে বলে তুলে রাখা হয়েছে। রোজ বামুন দিদি বিভুদাকে বকাবকি করে, ও আর কদ্দিন সইবে? পাহারা-টাহারা দিয়ে একাকার করবে, তখন খাবার আনাই দায় হবে।

কালো-মাস্টারকে বললাম, "পয়সা আমি কিছু তোমাকে দিতে পারি। দুটো পুজোবার্ষিক কেনবার জন্য মা আমাকে পাঁচ টাকা বারো আনা দিয়েছেন, তার খানিকটা তুমি নিতে পার।"

সে তো গেল রেগে।

"ওঃ, একটা দুঃখী মানুষকে দু বেলা দু মুঠো অখাদ্য দিতে বুঝি ভারি কষ্ট হচ্ছে? থাক তবে, আমি উপোস করেই থাকি!—আচ্ছা, ওদের ঐ রান্নাঘরের পেছন দিকটা বেশ নির্জন তো? বাবুরা আশা করি সেখানে আসে-টাসে না—মানে আমাকে ওরা একবার ধরলে তো আর আস্ত রাখবে না!"

বললাম, "আরে না, না, অত ভয় কিসের? জানো, আমার বন্ধু বিশেকে একবার কুমিরে ধরেছিল। তবু বিশে ভয় পায় নি, এমনি করে কুমিরের দুটি চোয়াল ধরে টেনে হাঁ-টাকে বড় করে দিয়ে কামড় ছাড়িয়ে চলে এসেছিল।"

কালো-মাস্টার বললে, "সে কি! মারল না কুমিরটাকে? আবার শেষটা কাকে ধরবে। নর-মাংসের আস্বাদ পেয়েছে!"

"আহা! কুমিরের কামড়ে আইডিন দিতে হবে না বুঝি? মারবার সময় কোথায়? তাছাড়া কামড় ছাড়াবার সময় এমনি জোরে চাড় দিতে হয়েছিল যে তাইতেই কুমিরটা এক্কেবারে মরে গেছল।"

কালো-মাস্টার বললে, "সাহস দাও তো একটা কথা বলি।—আচ্ছা ঐ আনাড়িটা কে, ঐ যে ভজকট করে শিশুপাল করছিল?"

"ঐ তো আমার ছোটকা, উনি তো শিশুপাল করবেন না।"

"পারবেই না তো করবে কোত্থেকে!—আচ্ছা তুমি দাড়িগোঁফ দিচ্ছ তাহলে? আমি সব শুনেছি।"

আমি আর কি করি, চুপ করে জলের দিকে চেয়ে থাকলাম। হাঙররা এলে ওদের গায়ের সবটা জলের নিচে থাকে, কিচ্ছু দেখা যায় না খালি ওদের তিনকোনা পাখনাটা জলের উপর ভেসে থাকে, আর তাই দেখে মাঝিমাল্লারা সাবধান হয়ে চলাফেরা করে।

কালো-মাস্টার আমাকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, "কই, কিছু বলছ না যে? দাড়িগোঁফ কোত্থেকে কিনছ?—ও কি, মুখ ঢাকছ কেন, কাঁদছ নাকি?"

নাক টেনে বললাম, "না, কাঁদব কেন? আমি তো বিশের বন্ধু। কিন্তু ঐ বিভুদা সারাক্ষণ খালি খালি বলে দাড়িগোঁফ এনে দে, দাড়িগোঁফের কি ব্যবস্থা কল্লি—আর খুব জোরে মারে। এই দেখ, হাতের গুলি টেনে নীল করে দিয়েছে।"

কালো-মাস্টারের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল, একটা আঙুল দিয়ে আমার ব্যথার উপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আমি হেসে বললাম, "ও কিছু না, ও সেরে যাবে। বিশেদের হাত পা কেটে গেলে ওরা পাথর দিয়ে গ্যাঁদাফুলের পাতা ছেঁচে ব্যথার উপর লাগায়, হাড়ভাঙার ডগা বেটে মাখে, এক্কেবারে সেরে যায়। কিন্তু দাড়িগোঁফ আমি কোথায় পাব? কিনতে নাকি অনেক টাকা লাগে। বাবা থিয়েটার ভালবাসেন না। বাবা তো

টাকা দেবেন না। শুনলে হয়তো আমার থিয়েটার করাই বন্ধ করে দেবেন।"

কালো-মাস্টার নদীর দিকে তাকিয়ে বললে, "দাড়িগোঁফ তো ভাড়াও পাওয়া যায়।"

"পাঁচ টাকায় পাওয়া যাবে? তোমাকে মাংস-ভাত খাবার বারো আনা দিলে আমার কাছে যে পাঁচ টাকা থাকবে তাই দিয়ে কি পাওয়া যাবে?"

"বাঃ, পুজোবার্ষিক কিনবে না? কি সুন্দর চকচকে মলাট দেয়া থাকে! কিনবে না? না কিনলে তোমার মা কি বলবেন?"

মা কাছে থাকলে তো কোনো ভাবনাই ছিল না, এক্ষুণি দাড়িগোঁফের ব্যবস্থা করে দিতুম। পরীক্ষার সময় মা আমাকে অঙ্ক বুঝিয়ে দেন, আর মুর্গির স্টু রেঁধে খাওয়ান। মা ঘরে এলেই কিরকম একটা ভালো গন্ধ পাই।

কালো-মাস্টার বললে, "ও কত্তা, মার কথা মনে পড়ে কষ্ট হচ্ছে বুঝি? তা মা কাছে না থাকতে পারে, কালো-মাস্টার তো আছে! পয়সাকড়ির জন্য তুমি ভেবো না, আমার যা আছে তাইতেই আমার কিছুদিন হেসেখেলে চলে যাবে!"

এই বলে ট্যাঁক থেকে একটা ছোট কালো থলি বের করে, তার মুখ খুলে, হাতের তেলোয় এত-এত পয়সাকড়ি ঢেলে দেখাল। আমি তো অবাক্!

"ও কালো-মাস্টার, এত তুমি কোথায় পেলে? ঐ দিয়ে তো তুমি সারা-জীবন সুখে থাকতে পার!"

কালো-মাস্টার বললে, "দেখ, কাল তোমার পুজোবার্ষিক কিনে ফেলো। তার একটা আমাকে পড়তে দিও, কেমন? এখানে একা-একা পড়ে থাকি। বাইরে এসে জলের ধারে পা ডুবিয়ে যে বসে থাকব তারও জো নেই, যদি কেউ দেখে ফেলে!—আচ্ছা রেলের ধারের ঐ খুপরি ঘরের গোঁফওয়ালা লোকটাকে দেখেছ?"

আঃ, শুনে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। গুটিগুটি চলে এলাম। পাঁচিল দিয়ে খিড়কি বাগানে, খিড়কি বাগান থেকে জানালা দিয়ে আমার স্নানের ঘরে, সেখান থেকে আমার শোবার ঘরের মধ্যে।

ঘরে ঢুকে জুতোটা খুলে খাটে সবে বসেছি, এমনি সময় মনে হল কে আমার দরজা ঠেলছে! আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। দাঁতে ছোরা

কামড়ে ধরে, খোঁচা খোঁচা চুল, লাল লাল চোখ, একটা লোক যদি এবার ঘরে ঢোকে ?—বিশে হলে কি করত ?

খাট থেকে নেমে, ঘরে আলো জ্বেলে, দরজার ছিটকিনি খুলে দিলাম, হুড়মুড় করে ছোটকা আমার ঘরে ঢুকলেন, "কি ঘুম রে তোর! সেই কখন থেকে দরজা ঠেলছি, সাড়াশব্দ দিচ্ছিস নে। জোরে ডাকতে পারছি না, বিভু-কাঁকড়াবিছে শুনতে পায়। শোন্, নাটক করে পাট না পেতে পারলে, এ শহরে আর আমি মুখ দেখাতে পারব না। এটা তো বুঝিস্? শোন্, একটা কাজ করে দিস্ তো একটা খুব ভাল জিনিস দেব তোকে।"

আমি বললাম, "কি ভাল জিনিস?"

ছোটকা গেলেন রেগে। চাপা গলায় বললেন, "এমনি দেখে মনে হয় —বুঝি গাল টিপলে দুধ বেরুবে। অথচ ভেতরে ভেতরে এত বিষয়বুদ্ধি! যা, তোকে দুটো টাকা দেব।"

আমি বললাম,

"দু টাকা আমি চাইও না, আর তোমার নেইও। তুমি তো বড়-কাকিমার কাছ থেকে এক টাকা চাচ্ছিলে চা খাবার সময়।"

ছোটকা বললেন, "আচ্ছা আচ্ছা, তোকে একটা ভাল পেনসিল-কাটা দেব। এবার হল তো?"

আমি বললাম, "কোন পেনসিল-কাটাটা? ঐ যেটা বিভুদা নেয় নি, সেটাতে তো শিষ ভেঙে যায়।"

ছোটকা বললেন, "কি মুশকিল! আচ্ছা, তোকে একজোড়া শাদা খরগোশ এনে দোব, আমার বন্ধু জীবনের বাড়ি থেকে। তা হলে হবে তো?"

বললাম, "ইস্, সত্যি দেবে তো?"

"আরে হ্যাঁ! হ্যাঁ! আমার কাজটা করে দে তো আগে।"

"বল, কি কাজ?"

"তোর ঐ বিশেটিকে রাজি করিয়ে শিশুপালের পাট করাতে হবে। তোর কথায় তো মনে হয় ও সব পারে।"

শুনে কাঠ হয়ে গেলাম।

"বিশে তো করবে না, ছোটকা।"

"আহা, তাকে রাজি করাতে হবে। নইলে কি বলছি? তাকে একবারটি আমার কাছে এনে দিতে পারবি তো? নাকি তাও না?"

আমি চুপ করে থাকলাম। ছোটকা উঠে পড়ে বললেন,
"তবে থাকগে। কাল সবাইকে বলে দিই যে নাটক হবে না।"
"ও মা! নাটক না হলে আমি দ্বিতীয় সৈনিক হব কি করে?" ব্যস্ত হয়ে বললাম,
"না, না, ছোটকা, দেখি একবার চেষ্টা করে।"

আট

সকালে মার কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়ে কি যে ভালো লাগল! মা লিখেছেন পূজার কদিন নিমকিকে নিয়ে এখানে কাটিয়ে যাবেন, বিভুদাদের নাটক দেখবেন। নিমকিও চিঠির কোনা দিয়ে এত বড় কাগ এঁকে দিয়েছে। কতদিন নিমকিকে দেখি নি। বিশেকে নিমকির কথা বলেছি; রাত্রে একা উঠতে ভয় পায়, আমাকে সঙ্গে যেতে হয় এসব কথা বলেছি। বিশে বলেছে ওকে সাহসী করতে হবে। নিমকি এখানে এলে বেশ হবে, সাহসী করবার জন্য ওকে পেরিস্তানে নিয়ে যাব। ঐ সরু জায়গাটা একবার পার হতে পারলেই ও সাহসী হয়ে যাবে।

কিন্তু মাকে কিছু বলা যাবে না, বড়রা বড্ড কথা জিজ্ঞেস করে। তাছাড়া বিশের কথা শুনলে কি বলবেন কে জানে। হয়তো বলবেন ওকে ওপরে নিয়ে আয়, আমাদের সঙ্গে চা-জলখাবার খাবে।

বিশে চা খায় না। সিংহকে দিলে হয়তো খেত, কিন্তু বিশে দেয় না। মা তো সিংহকে দেখলে ভয় পাবেন। মা কুকুর ভালোবাসেন না, বলেন ওরা নাকি ভারি নোংরা। একবার বাবা একটা কুকুর বাচ্চা এনেছিলেন; আপিসের সায়েব দিয়েছিল—ছোট্ট, হলদে রঙের, ঝাঁকড়া চুল, কুতকুতে চোখ, বাবার কোলে চড়ে এসেছিল। মা দেখেই প্রায় মুচ্ছো যাবার যোগাড়! বললেন, "এক্ষুণি ফিরিয়ে দিয়ে এসো ওটাকে। কে ওকে খাওয়াবে, চান করাবে, ময়লা পরিষ্কার করাবে শুনি? জগুর যা ছুঁচিবাই, আর আমি তো ছোঁবও না—ও কি করছ, কাছে এনো না বলছি—উঃ!"

বলে মা হাত-পা এলিয়ে সোফার ওপর পড়েই গেলেন।

কত করে বললাম নিমকি আর বাবা আর আমি ওর দেখাশুনো করব,

সে কিছুতেই কিছু হল না। শেষটা বাবা সত্যি সত্যি হরেনকাকাদের বাড়িতে কুকুরটাকে দিয়ে এলেন। ইস্, ওদের বাড়ি গিয়ে দেখেছি কুকুরটা ওদের হাত-পা চাটে! সিংহ রোজ আমার নাকমুখ চেটে দেয়, আমি একটুও ভয় পাই না।

সকালের জলখাবার খেয়ে যে যার কাজে গেলে দেখি একটা তেলে-ভাজাওয়ালা ঝাঁকা নামিয়ে খিড়কি-দোরের ধারে বসেছে। পাঁচিলের ওপর দিয়ে এক-ঠোঙা কিনলাম, কিছু মুড়ি কিনলাম—ওর কাছেই ছিল। লোকটা খুব খুশি, মাথায় ঝাঁকা তুলতে তুলতে বলতে লাগল,

"খেয়ে দেখো খোকাবাবু, সারাজীবন জিভ চুলকুবে!"

খুব ইচ্ছে করছিল তবু একটাও খাই নি, মা বারণ করেন।

পেরিস্তানে গিয়ে দেখি চোরাঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। অনেক ধাক্কাধাক্কি করবার পর কালো-মাস্টার বেরিয়ে এসে বলল, "কি লাগিয়েছ কি বল তো? পাড়া ডেকে এখানে এনে জড়ো করবে নাকি?"

তারপর আমার হাতে ঠোঙা দেখে খুশি হয়ে বলল, "ও কি, এনেছ কি? আহা, বেঁচে থাকো বাপ, একশো বছর পরমাই হোক।"

এই বলে পেঁয়াজি, বেগুনি, ফুলুরি একটা করে মুখে পোরে আর একমুঠো মুড়ি খায়। আমার তাই দেখে দেখে জিভের জলে পেট ঢাক!

খেয়েদেয়ে কালো-মাস্টার নালার জলে হাত ধুয়ে আমাকে বললে, "দেখবে এসো, কি ব্যবস্থা করেছি।"

বলে আমাকে চোরাঘরে নিয়ে গেল।

দেখে আমার মাথা-টাথা ঘুরে একাকার। দেখলাম ঘরের মাঝ-খানকার বেদীটার ওপরে সারি সারি দাড়িগোঁফ সাজানো। লম্বা দাড়ি, বেঁটে দাড়ি, খোঁচা দাড়ি, ছুঁচলো দাড়ি, চার-কোনা দাড়ি, সোজা দাড়ি, কোঁকড়া দাড়ি, কালো দাড়ি, সাদা দাড়ি, হলদে দাড়ি, ছাগল দাড়ি, দোভাগা দাড়ি। আর সে কি গোঁফ! বুরুশ গোঁফ, পাকানো গোঁফ, ঝোলা গোঁফ, সজারু গোঁফ, বেড়াল গোঁফ, মাঝখানে চোঁচাছোলা দুধারে গোঁফ, দুধারে চোঁচাছোলা মাঝখানে গোঁফ, প্রজাপতি গোঁফ, মশার মতো গোঁফ।

দেখে দেখে আর আমার চোখ ফেরে না! এত গোঁফ দিয়ে যে আমাদের সারাজীবন সুখে কেটে যাবে। গলা দিয়ে আমার কথা বেরোয়

না, শেষটা ভাঙা গলায় বললাম, "কোথায় পেলে কালো-মাস্টার? খেতে পাও না, গোঁফদাড়ি কোথায় পেলে?"

কালো-মাস্টার বললে, "আমার নৌকোর ভেতরটা এই দিয়ে ভরে ছিল যে। জলে ভিজে জাবড়া হয়ে এর-সঙ্গে-ও এঁটে ছিল, এর রঙ গড়িয়ে ওর গায়ে লেগে ছিল। এতদিন ধরে রাত জেগে না ঘুমিয়ে না খেয়ে—"

আড়চোখে একবার আমার দিকে চেয়ে আবার বলতে লাগল, "না ঘুমিয়ে, আধপেটা খেয়ে, জট ছাড়িয়ে, রঙ ধোলাই করে, তেল মাখিয়ে, পাতা কেটে, কোঁকড়া আঁচড়িয়ে, তবে সে না ভাল ফিরিয়েছি। এখন একরকম বলা যেতে পারে এরা আমারই হাতে তৈরি। নেবে এগুলো? তাহলে কিন্তু আমার একটা কথা রাখতে হবে।"

দাড়িগোঁফের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে দেখতে লাগলাম। আহা, ঐ লাটাচে পাকানো গোঁফজোড়াটি দ্বিতীয় সৈনিকের গোঁফই বটে। হাত বাড়িয়ে আস্তে আস্তে ছুঁতে গেলাম, ফোঁস করে উঠল কালো-মাস্টার।

অবাক হয়ে চেয়ে দেখি এই একটু আগে মুড়ির সঙ্গে তেলেভাজা খেয়ে যার মুখ খুশিতে ভরে ছিল, এখন তার অন্য রূপ। পিঠ বাঁকানো বন বেড়ালের সঙ্গে আর তার কোনো তফাত নেই। চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, "খবরদার ওতে হাত দিস্ নে বলছি। অধর্মের কাজ করে, প্রাণ হাতে করে ওর জন্য আমি বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়ে আছি। ছুঁয়ো না বলছি। আগে বল আমি যা বলব তাই হবে!"

ছুটে পালাতে যাচ্ছি, খপ করে আমার হাতের কবজি ধরে ফেলে কালো-মাস্টার বললে,

"ওঃ! বিশের বন্ধু বুঝি বিপদের সময় পালিয়ে যায়! আমি কোথাকার একটা কালো-মাস্টার, আমি প্রাণ তুচ্ছ করে দাড়িগোঁফ আগলে আছি, খেতে পাই নে, ভালো একটা বিছানা পাই নে, এই আমি যার চারটে বালিশ আর দুটো বড় পাশবালিশ না হলে ঘুম হত না—আর দরকারের সময় তুমি দিব্যি চম্পট দিচ্ছ! বিশে শুনলে কি বলবে শুনি?"

ব্যস্ত হয়ে বললাম, "ইয়ে—না—চলে তো যাচ্ছিলাম না।"

সে বললে, "তাও ভালো। তবে শোনো, এই দাড়িগোঁফ সব তোমাকে দেব, কিন্তু তার বদলে বিশে সাজবে শিশুপাল।"

আমার মুখে কথাটি নেই। কালো-মাস্টার আমার দিকে চেয়ে বললে, "কি বলতে চাইছিলে বলেই ফেলো। বিশে থিয়েটার করবে না, এই তো?

আহা, তুমিও যেমন! আরে আমিই বিশে হয়ে শিশুপাল সাজব, তাও বুঝলে না?"

উঃফ্, বাঁচা গেল! মনটা হালকা হয়ে গেল। কিন্তু—"

কালো-মাস্টার বললে, "এর মধ্যে আবার কিন্তু কি? এতে কার কি অসুবিধেটা হচ্ছে শুনি? আমি এখান থেকে না যাওয়া পর্যন্ত বিশে আসছে না এটা তো ঠিক? কাজেই সে কোনো গোলমাল করতে পারবে না। তোমার ছোটকারা তো যেমন করে হোক একটা শিশুপাল পেলেই খুশি! তাহলে আর আপত্তিটা কোথায়? আমার জীবনের আশা শিশুপাল সাজব।"

বললাম, "কিন্তু তোমার শত্রুরা যদি তোমাকে ধরে ফেলে?"

কালো-মাস্টার এত জোরে হো-হো করে হেসে উঠল যে আমার ভয় হতে লাগল ওপর থেকে যদি ওরা শুনে ফেলে! কালো-মাস্টার বললে, "কিছু মনে করো না, আমি যাকে শিশুপাল সাজাব অন্য লোক তাকে চিনে ফেলবে এ কথা শুনলেও হাসি পায়। কেউ চিনবে না, বুঝলে। আমি শিশুপাল সাজলে আমি আর আমি থাকব না, সত্যি করে শিশুপাল হয়ে যাব, এও কি বলে দিতে হবে? জানো মণি শালকে এমন জটায়ু সাজিয়েছিলাম যে অনেকদিন পর্যন্ত তার মুখ থেকে কিচিরমিচির ছাড়া কোনো শব্দ বেরুত না।"

বললাম, "পারবে তো কালো-মাস্টার? পার্ট দেখলে না, রিহারসাল করলে না, শেষটা সব ডোবাবে না তো?"

তাই শুনে সে হাত-পা ছুঁড়ে তখুনি শিশুপালের পার্ট আগাগোড়া এমন চমৎকার বলে যেতে লাগল যে আর আমার কোনো আপত্তিই থাকল না। শুধু ওকে ওই বিশে বলে চালানোতেই যা মুশকিল। সে বুঝিয়ে বললে, "বুঝলে, আগে আমি বিশে সাজব। তারপর ঐ বিশে শিশুপাল সাজবে। এতে অসুবিধেটা কোথায় বুঝলাম না।

বললাম, "বিশের বুকে মড়া মানুষের খুলির নীচে ক্রশ করা হাড়ের উল্কি করা আছে।"

"তা আছে তো তাতে হয়েছে কি? আমিও সবুজ কালি দিয়ে চমৎকার মড়া মানুষের খুলির নীচে ক্রশ করা হাড় আমার বুকে এঁকে নেব। ওসব বাজে কথা রাখো। এখন বল বিশে আমার চেয়ে কোন্ দিক দিয়ে ভালো।"

বললাম, "ইয়ে, বিশের মুখটা – "

"কি মুখটা ? আমি দাড়ি কামিয়ে পাউডার মেখে নিলেও বিশের মুখটা ভালো ? বাজে কথা বল না, বল আর কিসে ভালো।"

বললাম, "কি লম্বা-চওড়া বিশে, হাতের পায়ের গুল কি শক্ত! সঙ্গে সিংহ থাকে।"

কালো-মাস্টার তো অবাক।

"সিংহ থাকে! এই সেদিন না বললে কুকুর থাকে?"

"আহা, ঐ একই, কুকুরের নামই সিংহ।"

"কুকুরের নাম সিংহ হবে কেন?—আহা চটো কেন, রিহার্সালের সময় সিংহকে বাড়িতে রেখে আসব। আর হাতের পায়ের গুল যে বলছ, কি এমন মন্দ আমার হাতের পায়ের গুল?"

এই বলে হাত-পা বেঁকিয়ে মাস্‌ল ফুলিয়ে আমাকে আবার দেখাতে লাগল। দেখে হাসি পেল, কিসে আর কিসে! বললাম, "দেখ, তুমি যাই বল না কেন—"

সে আর অপেক্ষা না করে দাড়িগোঁফগুলোকে জড়ো করতে লাগল। দ্বিতীয় সৈনিকের গোঁফে যেই হাত দিয়েছে আমি বললাম, "কথায় কথায় রাগ কর কেন? দেখি একবার ছোটকার সঙ্গে কথা বলে।"

কালো-মাস্টার ছুটে এসে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরল। বলল, "দাও বাপ, চাট্টি পায়ের ধুলো দিয়ে কেতাত্থ করে দাও।"

ঘরে ফিরে এসে ভেবে দেখলাম এতে খুব সুবিধেই হয়ে যায়। শুধু মিথ্যে করে বিশের নামে কালো-মাস্টারকে চালাতে খারাপ লাগছিল। তবে বিশে যে এতে কিছু মনে করবে না এ আমার খুব জানা ছিল। কারণ যদিও বিশে লোকের সামনে বেরোয় না আর আমাদের বাড়ির লোকদের ভারি ঘেন্না করে, তবু সে কথা তো আর এরা কেউ জানে না। ওরা ভাবে বিশে বুঝি এ পাড়ার কাছাকাছি কোথাকার একটা বখা ছেলে। তবে আর কালো-মাস্টারকে বিশে বলতে ক্ষতি কি? আমি অবিশ্যি ওকে কালো-মাস্টারই বলব, বিশে বলে ডাকতে পারব না কক্ষণো।

দুপুরে খিচুড়ির সঙ্গে সাতরকমের ভাজা হয়েছিল। খেতে খেতে সবার সামনেই বললাম, "দাড়িগোঁফের একটা ব্যবস্থা করেছি ছোটকা, আর বিশে শিশুপালের পার্ট করতে রাজি হয়েছে।"

তাই না শুনে যে যার পিঁড়ি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বড়কাকিমার হাতা থেকে আমার পাতে দুটো বড় বড় মাছের ডিমের বড়া পড়ে গেল। এক

বড়কাকা আর আমি বসে থাকলাম।

বড়কাকা খিচুড়ির সঙ্গে কাঁচালঙ্কার কুচিভাজা মাখতে মাখতে বললেন, "দাদাকে শেষ পর্যন্ত মত করালি বুঝি? বাবা, আমি বলতে গেলে সে কি রাগ, পারলে থিয়েটার বন্ধ করে দেয়!"

আমার বুক টিপটিপ করতে লাগল। ডিমের বড়া গলা দিয়ে নামতে চায় না। ছোটকা বললেন, "ও কি, চুপ করে রইলি যে? বিশে কখন আসবে?"

"বিশে সকলের সঙ্গে এখন রিহারসাল করতে চাইছে না। আজ অন্যরা চলে গেলে পরে তোমার আর বিভুদার কাছে পার্ট অভ্যাস করে যাবে বলেছে। পরশু একেবারে সবার সঙ্গে রিহারসাল করবে।"

ছোটকা একগাল হেসে বললেন,

"আঃ, বাঁচালি চাঁদ! মাথা থেকে একটা একশো-মন বোঝা নামল। হ্যাঁরে, সে ভালো করবে তো?"

"ভালো করবে তো মানে? সে ব্রজেনদাকেও শেখাতে পারে। জানো, একবার—"

বিভুদা হাঁড়িমুখ করে বলল, "থাক, এখন আর তার গুণের ব্যাখ্যানা কত্তে হবে না। পার্ট দিচ্ছি ঐ তার পক্ষে যথেষ্ট। আর দাড়িগোঁফ কখন পাচ্ছি? যদি এর মধ্যে কোনো চালাকি থাকে তো—"

ছোটকা এক ধমক দিলেন, "ঢের হয়েছে বিভু, নিজের এদিকে দুটো কথা বলতে গেলেই জিব বেরিয়ে যায় আবার তেড়িবেড়ি!"

বিভুদাও বললে, "তুমিও থামো দিকিনি। নিজে তো লেখা কাগজ সামনে ধরেও যা খেল দেখাও—"

ছোটকা বললেন, "আহা, সে আমার কিছু মনে থাকে না বলে। তাছাড়া প্রযোজক কবে আবার অভিনয় করে?"

বড়কাকা বললেন, "এখন যে যার জায়গায় বসে খেয়ে নাও দিকিনি। হ্যাঁরে চাঁদ, দাড়িগোঁফগুলো পাওয়া যাবে কখন? আমাকে আবার সাজ গোছাবার ভার দিয়েছে কিনা!"

আমি বললাম, "আজ সবাই চলে গেলে বিশে যখন আসবে, ওকে বলে দেব কাল পরশু একদিন সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। ওকে কিন্তু রাত্রে এখানে খেয়ে যেতে বলেছি বড়কাকা।"

ছোটকা বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবিশ্যি খাবে। আজ আমাদের বড় ভালো দিন—পোলাও-মাংসের ব্যবস্থা কচ্ছি, দেখ্-না।"

নয়

রাতের পোলাও-মাংসের কথা শুনে কালো-মাস্টার সেদিন দুপুরে পাঁউরুটি খেতে আপত্তি করল না। শুধু বললে, হ্যাঁ কত্তা, কাপড়চোপড় নেই, তা মণ্ডড়াতে পরব কি?"

বললাম, "সে একটা ব্যবস্থা করে ফেলব। আমার পাঞ্জাবি পাজামা তোমার হবে না?"

সত্যি কথা বলতে কি কালো-মাস্টার মাথায় আমার চেয়ে খুব বেশি লম্বা নয়; রোগা লিকলিকে— ওকে বিশে বলে কি করে যে চালাব তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না। ভাগ্যিস বিশেকে কেউ চোখে দেখে নি! এই ছ ফুট উঁচু ষণ্ডা জোয়ান, হাঁক দিলে গঙ্গার ওপার থেকে শোনা যায়। ওদের দেশে ছোট ছোট নানা রকমের আগ্নেয়গিরি আছে, তার এক-একটার চুড়োয় চড়ে ডেকে ডেকে অন্য চুড়োর লোকদের সঙ্গে ওরা কথা কয়। দূর থেকে জাহাজ আসছে দেখতে পেলে অমনি জানান দেয়। সেইরকম গলাও বিশের।

টং লিং—টং লিং—টং লিং করে লম্বা একটা মালগাড়ি পুলের ওপর চড়ল আর সেই গুঁফো লোকটা অমনি সবুজ নিশান হাতে করে এগিয়ে দাঁড়াল। আমিও বাড়ির ছায়াতে আর-একটু সেঁদিয়ে গিয়ে অবাক হয়ে বললাম, "ও কি কালো-মাস্টার, সবুজ কালি, তুলিকলম দিয়ে কি করবে? ছবি আঁকবে নাকি?"

এই বলে ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম।

ও খুশি হয়ে বলল,

"ছবিই বটে। জানো কত্তা, সারাজীবন কত যে ছবি এঁকেছি তার ঠিকানা নেই। কত কদাকারকে সুন্দর করেছি, সুন্দরকে করেছি কদাকার। কত বুড়োকে ছোকরা বানিয়েছি, ছোকরাকে বুড়ো। কত পালোয়ানকে রোগা বানিয়েছি, রোগাকে পালোয়ান। বিশে হওয়া আমার পক্ষে কি আর শক্ত কথা। এই দেখো, বিশে হওয়ার আমার আর কতটুকু বাকি আছে।"

এই বলে আধময়লা গেঞ্জিটাকে খুলে ফেলল। চেয়ে দেখি ওর হাড়-

জিরজিরে বুকের ওপর সবুজ কালি দিয়ে মড়ার মাথা আঁকা, তার নিচে দুটো হাড় ক্রশ করে বসানো, সে যে মানুষের হাড় সে আর কাউকে বলে দিতে হবে না।

এত ভাল ছবি আঁকে কালো-মাস্টার এ আমি ভাবতেও পারি নি। বললাম, "আমার বুকেও ওইরকম এঁকে দাও-না, কালো-মাস্টার।"

বলে জামাটা খুলে বসলাম।

কালো-মাস্টার জিব কেটে বললে,

"ছি, কি যে বল কত্তা! বিশের বুকে যে উল্কি আঁকা সে কি যার-তার বুকে শোভা পায়? এসো, বরং জোড়া হাঁসের নিচে পদ্মফুল করে দিই।

তাই দিল কালো-মাস্টার। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা তুলিকালির টানে কি যে আরাম লাগল! হয়ে গেলে কালো-মাস্টার বললে, "দেখো, স্নানের সময় যেন জল না লাগে।"

কালো-মাস্টারের যেমন কথা। দু-তিন দিন স্নানই করব না ঠিক করেছি। জামা গায়ে দিয়ে ওপরে যাবার সময়ে ওকে আর-একবার সাবধান করে দিলাম, "খুব সাবধান, কালো-মাস্টার, তুমি যে এখানে আছ কেউ যেন টের না পায়। বিশেষ করে খুপ্‌রিঘরের ঐ লোকটা। জলের ধারে পা ঝুলিয়ে ওরকম করে বসে থাক কেন? ও তোমাকে একবার দেখতে পেলেই হয়ে গেল তোমার শিশুপাল সাজা এ আমি বলে দিলাম।"

তাই শুনে কালো-মাস্টার একেবারে চোরাকুঠরির ভিতরে গিয়ে বেদীটার উপরে টান হয়ে শুয়ে পড়ল। আমিও আস্তে আস্তে উপরে এসে নিজের ঘরে শুয়ে পড়লাম। একটু ভাবনাও হচ্ছিল, কি জানি ঐ লোকটাকে বিশে বলে চালাতে গিয়ে শেষটা না কোনো ফ্যাসাদে পড়ি। বাবা যদি কোনোরকমে টের পান তাহলেই তো গেছি!

বিকেলে কালো-মাস্টারকে আনাই দেখি এক ব্যাপার! সে কিছুতেই পাঁচিলে চড়ে নালার ওপর দিয়ে যেতে পারল না। খালি নিচের দিকে তাকায় আর ওর মাথা ঘোরে। শেষটা ও-পথ ছেড়ে দিলাম। তাছাড়া সরু জায়গাটাতে হয়তো ওর পেটটা গলতই না। কারণ এদিকে রোগা হলে কি হবে, ওদিকে এই কদিনে দিব্যি এক নাহাপাতিয়া বাগিয়েছে।

অগত্যা সন্ধে লাগলে পর নৌকা বের করে কান্তা কেবিনের একটু

আগে গাছগাছড়ায় আড়াল করা একটা আঘাটায় নামলাম দুজনে। কালো-মাস্টার জলকে বিশ্বাস করে না, নৌকো টেনে ডাঙায় তুলে কারখানার উঁচু পাঁচিলের গা ঘেঁষে ঝোপের পেছনে লুকিয়ে রাখল। সেখান থেকে অন্ধকার গলি দিয়ে হেঁটে গেলে আমাদের বাড়িটা বেশি দূরে নয়। গুঁফো লোকটা রুটি সেঁকছিল, কিছুই লক্ষ্য করল না।

চাতালে ছোটকা, বিভুদা, ব্রজেনবাবু সবাই ব্যস্ত হয়ে পায়চারি করছেন আর ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন। আমাদের দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তারপর কালো-মাস্টার আলোর নিচে এসে দাঁড়াতেই মুখে কারো কথা সরে না। ছোটকা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "ইয়ে, এই নাকি সেই অসাধারণ বিশে? আশ্চয তো। ইয়ে, কি বলে, ও পারবে তো পার্ট করতে, চাঁদ? নাকি, এখনো বল, সব বন্ধ করে দিই।"

চেয়ে দেখি কালো-মাস্টারকে ঠিক একটা চোরের মতো দেখাচ্ছে। আমার একটা হাতকাটা খাকি শার্ট আর নীল হাফপ্যান্টের তলা থেকে রোগা-রোগা কালো ঠ্যাং বেরিয়ে রয়েছে, সোজা তাকাচ্ছে না কারো দিকে, সারা গায়ে যেন একটা কেমন ভয়-ভয় ভাব, দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়। মুখ দেখলে মনে হয় ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। যেন চোরের হদ্দ।

এগিয়ে এসে বললাম, "আচ্ছা ছোটকা, রিহারসালের পর পোলাও-মাংস খাওয়া তো? বিশে, পার্ট বল।"

আর বলতে হল না, কালো-মাস্টার চোখের সামনে বদলে গেল। আলোর নিচে এসে আগাগোড়া শিশুপালের পার্ট বলে যেতে লাগল, আর শুধু শিশুপাল কেন, শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির—গলা বদলে বদলে সবার পার্ট করে যেতে লাগল। শুনে সকলে হাঁ, মুখে কারো কথা সরে না। প্রত্যেকটা পার্ট এত অসম্ভব ভালো করে বলে গেল যে আমি সুদ্ধু অবাক। বলে তো ছবি আঁকে, অথচ এত ভালো থিয়েটার করে! আশ্চর্য বটে।

কুড়ি মিনিট ধরে ও একাই বকে গেল, তারপর সে অঙ্কটাকে শেষ করে তবে থামল। ছোটকা অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ছি ছি, তোমাদের লজ্জাও করে না।"

আর-একটু হলেই হয়েছিল আর কি, বিভুদার দল উঠে দাঁড়িয়েছিল পর্যন্ত, এমন সময় কালো-মাস্টার হাতজোড় করে বললে, "আপনাদের সকলের সঙ্গে নাটক কত্তে পারাটাকেই আমি সৌভাগ্য বলে মনে করি,

নইলে আমার এত কাজের মধ্যে আবার নাটক করার সময় কোথায়? তাহলে গোড়া থেকে আবার শুরু হোক, কেমন?"

আর কথাটি নেই, অমনি যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল, যাদের পার্ট শেখা হয় নি তারাও দেখি হাতে একটু সময় পেলেই মুখস্থ করতে লেগে গেছে। অন্যদিন সব পালাই-পালাই করে, আজ রাত এগারোটা বেজে গেল সেদিকে কারো খেয়ালই নেই। তারপর সে কি খাওয়া, অনেকদিন বাদে প্রাণ ভরে কালো-মাস্টার খেয়ে নিল। শেষে আসর ভেঙে গেল, যে যার বাড়ি গেল, কালো-মাস্টারও মুখে দুটো পান পুরে পথ ধরল।

ছোটকা বার বার বলতে লাগলেন, "কাল যেন ছটার মধ্যে আসে—সবাইকে তৈরি করে নিতে হবে তো!"

উঃফ! এতক্ষণে আমার বুকের ঢিপঢিপুনি থামল। সে মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেলে বড়কাকা বললেন, "আশ্চর্য! এরকম তো আমি ভাবতেও পারি নি! ওকে কোথায় পেলি রে চাঁদ?"

আমি তো পালাবার পথ পাই নে। বিভুদা এসে বললে, "এসব থিয়েটারি লোকদের সঙ্গে মিশিস্ কেন রে হতভাগা?"

আমি তো অবাক, এ আবার কেমন কথা! বিপদের সময় উদ্ধার করে দিচ্ছে বলে কোথায় খুসি হবে, না উলটে ধমকানো হচ্ছে! বললাম, "হিংসে হচ্ছে বুঝি? তা ওকে ভালো না লাগে তো চলে যেতে বললেই পার। আমিই তো বলে-কয়ে এনেছি। ও কি সহজে রাজি হয়!

ছোটকা বললেন, "তুমি থামো তো বিভু, নিজে মরা সৈনিকের পার্ট করতে পর্যন্ত ভুল কর, তোমার মুখে ওসব কথা শোভা পায় না। বাবা! ভাগ্যিস বিশেকে পাওয়া গেল, তাই ভোঁদার দলের নাকের তলা থেকে কেমন কাপ ছিনিয়ে আনি দেখো। আর রাত নয়, যা চাঁদ, শুয়ে পড়, কাল আবার আর-একটা দিন আছে তো।"

শুলাম বটে, ঘুম আসে না কিছুতেই। কতরকম যে ভাবনা—কালো-মাস্টার ঠিকমতো পৌঁছেছে তো, বিশে বলে ওকে চালাচ্ছি, শেষটা সব ফেঁসে না যায়। যাক্‌গে, আর ভেবে কি হবে, আর তো কটা দিন। ছোটকা ওকে রোজ রাত্রে খেয়ে যেতে বলেছে, ওর উৎসাহ দেখে কে! আর আশ্চর্য যে অন্য যারা এতদিন ঝিমিয়ে পড়ছিল, তারাও সবাই তড়বড়িয়ে জেগে উঠেছে। আমারি তো নিজের পার্ট আগেই মুখস্থ হয়ে

গেছিল, এখন অন্য অন্য ছোট পার্টগুলো সব মুখস্থ করে নিলাম। বলা তো যায় না, লোকের কেমন হঠাৎ হঠাৎ অসুখ করে, মরেও যায় কত লোক। তখন তো আর ওসব সামান্য কারণে নাটক বন্ধ করে দেওয়া যাবে না।

হঠাৎ মনে হল শিশুপালই যে শুধু পাওয়া গেছে তা তো নয়, দাড়িগোঁফেরও একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কি যে আরাম লাগল সে আর কি বলব! আবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে হাত-পা হিম হয়ে গেল। এই কিছুক্ষণ আগেই নাটক ভেস্তে যাচ্ছিল আর এরই মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল, মায় কালো-মাস্টারের খাওয়ার কথাটা পর্যন্ত। যাবার আগে ছোটকা বড়কার কাছ থেকে পাঁচ টাকা চেয়ে ওর হাতে গুঁজে দিলেন। কালো-মাস্টার একেবারে গলে জল! পরে একলা পেয়ে আমি ওর কানে কানে ব্যস্ত হয়ে বললাম, "ও দিয়ে কি হবে কালো-মাস্টার? আবার যেন দোকানে-টোকানে যেও না।"

সে একগাল হেসে বললে, "অত ভয় করলে কি আমাদের চলে কত্তা? তোমার কোনো ভয় নেই, স্যাঙো আমার জন্য খাবার কিনে এনে দেবে।"

"স্যাঙো! সে আবার কে?"

"ওমা, স্যাঙোকে চেন না? ঐ যে গো রেলে কাজ করে, ঝুলো গোঁফ, খুপরি-ঘরে নিশেন নাড়ে।"

"তুমি ওকে চেন নাকি?"

"বাঃ, ওকে চিনব না। তুমি তো সারাদিন আমাকে একা ফেলে নিজে মজা মার, আমি সে-সময়টা কি করে কাটাই ভেবেছ কখনো? কথা না বলে কেউ থাকতে পারে? তাই ওর সঙ্গে ভাব করেছি, তাতে অন্যায়টা কি হল শুনি?"

আমি বললাম, "তাহলে আমাদের লুকোনো ঘরের কথা ওকে জানিয়েছ, পেরিস্তানের কথাও বলেছ?"

কালো-মাস্টার যেন আকাশ থেকে পড়ল, "আচ্ছা, আমাকে কি ভাব বলো দিকিনি, কত্তা? তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, আমি কখনো অমন কাজ কত্তে পারি? তোমার কোনো ভয় নেই, ওকে বলেছি—আমি কারখানা-বাড়ির পাহারাওয়ালা, দিনরাত আমার ডিউটি থাকে, তাই খাবার কেনবার সময় পাই না। সারাটা জীবন বুদ্ধি ভেজে খেইছি, আর এখন একটা বাইরের লোকের কাছে সব ভেস্তে দোব। আমি সে ছেলে নই!"

শুনে আমি অবাক।

কিন্তু এরই মধ্যে এত কথা হয়ে গেছে?

"আরে শুধু কি তাই? ও আমার জিনিসপত্তর যখন যা দরকার কিসে রাখবে, আমি গিয়ে নিয়ে আসব। এতে ভয়ের কিছু নেই সেটা তো মান?"

বললাম, "আর তার বদলে তুমি কি করবে?"

কালো-মাস্টার বললে, "মুখটা অমন ব্যাজার করে কথা কইছ কেন? তার বদলে ওকে বারোটা কার্ড পাইয়ে দোব বলেছি, ওর বন্ধুদের নিয়ে এসে আমাদের থিয়েটার দেখে যাবে। কথা তো এই। তোমাকে কোনো বিপদে ফেলব না, প্রাণ থাকতে কালো-মাস্টার। যাই, ছোটকা বড়কার কাছে বিদেয় নিয়ে পা বাড়াই।"

বলে চলে গেল তো কালো-মাস্টার, কিন্তু আমার যে কত কথাই মনে হতে লাগল। প্রথম থেকেই কালো-মাস্টারকে বিশে বলে চালানোটা ঠিক হল কিনা ভেবেই পেলাম না। বিশে জানতে পারলে কি বলবে?

দূর থেকে শুনতে পেলাম পুলের ওপর দিয়ে মালগাড়ি যাচ্ছে টং লিং—টং লিং—টং লিং। আওয়াজটা ক্রমে দূরে সরে যেতে লাগল আর আমিও কখন ঘুমিয়ে পড়লাম টের পেলাম না।

দশ

মা নিমকিকে নিয়ে আমাদের নাটক দেখতে আসবেন। বাবাও নাকি আসবেন, বড় পিসিমা গিয়ে কি সব বুঝিয়ে এসেছেন, তাই নাকি বাবা আমার নাটক করা দেখতে আসবেন। এখন দাড়ি-গোঁফের কথা উঠলেই তো আমি গেছি। পরদিন আমার ভাবনার কথা শুনে কালো-মাস্টার দাড়ি-গোঁফের বাক্সটা লুকিয়ে এনে ছোটকার কাছে জমা করে দিল। বলল, "সাবধানে রাখবেন স্যার, এর ওপর মেলা লোকের নজর।"

ছোটকা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "সে কি বিশু, এসব কি তবে চাঁদের আনা নয়?"

কালো-মাস্টার হেসে বললে, "জিনিস চেনেন না তাই ও কথা বলছেন।

এসব জিনিস আজকাল হয়ই না, তা ও পাবে কোত্থেকে? না স্যার, এসব আমারই জিনিস। কতকাল ধরে যে এদের তেল মাখিয়ে, আঁচড়ে, কুঁকড়ে, হাত বুলিয়ে, আঠা জুড়ে, ছুঁচে ফুঁড়ে এইরকম চেহারা বানিয়েছি সে আর কি বলব। এগুলোকে আর এখন নকল চুলদাড়ি বলা চলে না, এগুলোকে মানুষের চুলদাড়ি বলা চলে—একদিক দিয়ে আমারই চুল-দাড়ি-গোঁফ বলতে পারেন। এদের একটা চুল ছিঁড়লে আমার গায়ে লাগে। আর হ্যাঁ স্যার, আমার কিন্তু একটা আবেদন ছিল।"

ছোটকা বললেন, "তা বলেই ফেল না, থামলে কেন? কিছু পয়সাকড়ির দরকার বুঝি? শোন্ চাঁদ, আমার দেরাজের টানাতে—"

কালো-মাস্টার জিভ কেটে হাতজোড় করে বলল, "না, না, ও কি কথা স্যার! আপনার কাছ থেকে আর পয়া নিলে আমার যে পাপ হবে। বলছিলাম কি, আমার জীবনে অনেক রকম ঝামেলা আছে কিনা, তা আমার শিশুপাল সাজার কথাটা একটু গোপন রাখবেন স্যার, নইলে শেষটা টানাটানি পড়ে যাবে, হয়তো শেষ পর্যন্ত দেখবেন নাটকের দিনেই আমি ফেরারী।"

ছোটকার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল, "তাই কখনো হয়? তাহলে যে আমাদের সব্বনাশ হয়ে যাবে! আমি ভোঁদাদের কর্ণার্জুন রিহারসাল দেখে এসেছি, বুঝলে, পাশের বাড়ির ঘুলঘুলি দিয়ে। একেবারে রাবিশ! সাজপোশাকের ওপর দিয়ে মেরে দেবে ভেবেছে, কেউ একবর্ণ নাটক কত্তে পারে না, ঐ সিনেমা অ্যাক্টরটা তো স্রেফ একটি মাকাল ফল। ওদের নাকের ডগা দিয়ে কাপ নিয়ে বেরিয়ে যাব। যারা যারা প্রতিযোগিতায় নামছে সবাইকে কার্ড পাঠাচ্ছি, বিশু, ভোঁদারা এসে দেখে যাক নাটক কাকে বলে! ওদেরও নাকি দাড়িগোঁফের কষ্ট।"

কালো-মাস্টার বললে, "তা আর হবে না? কার সঙ্গে লাগতে এসেছে ভুললে চলবে কেন? আমাকেও বারোটা কাড দেবেন স্যার। আর ইয়ে, স্যার, ওরা রিহারসালে এলে কিন্তু আমি নাটক কত্তে পারব না। প্রাণ হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াই, চারদিকে শত্তুর গিজগিজ করছে, এখানে আসা-যাওয়াই একটা ভাবনার কারণ হয়ে উঠেছে—"

ছোটকা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে শুনলেন, তারপর বলে উঠলেন, "ওঃ! এতক্ষণে বুঝেছি, বিশু। তুমি নিশ্চয়ই কোনো নামকরা কেউ, নাম ভাঁড়িয়ে নাটক করছ। পাছে কেউ চিনে ফেলে তাই এত ভাবনা। এবারে বুঝেছি।"

কালো-মাস্টার বললে, "শুধু চিনে ফেলবে না, স্যার, দড়ি দিয়ে বেঁধে ধরে নিয়ে যাবে, এই আমি বলে রাখলাম।"

ছোটকা ওর পিঠ চাপড়ে বললেন, "বিশু, তোমার কোনো ভাবনা নেই। আমি তোমাকে এমনি লুকিয়ে রাখব যে চাঁদ ছাড়া এ বাড়ির কেউ অবধি জানতে পারবে না। দেখ, চাতালের পাশের ঘরটা আমাদের লাইব্রেরি, ওর দরজাও খোলা হয় না, এমনি সব পড়ুয়া এ বাড়ির লোকরা। ওর চাবি আমার কাছে থাকে। ওর পাশেই আমার চানের ঘর, মাঝখানে দরজা আছে। তুমি ঐ লাইব্রেরি-ঘরে থাকবে, আমার চানের ঘরে চানটান করবে, কাকপক্ষী টের পাবে না। রিহারসালেও কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। এবার নিশ্চিন্দি তো?"

কালো-মাস্টার বললে, "আর আমার খাবার?"

ছোটকা বললেন,

"বাঃ, সে আবার একটা কথা হল নাকি। আমার খাবার আমার ঘরে দিয়ে যেতে বলব, কান্তা কেবিন থেকে চপ-কাটলেট আনব, দুজনে ভাগ করে খাব।"

এর পর কালো-মাস্টার আর কোনো আপত্তিই করল না। কিন্তু আমার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল—কোত্থেকে না আবার কোন নতুন বিপদ হয়। মনে হতে লাগল, এতে কেমন যেন বিশেকে ছোট করা হচ্ছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু কালো-মাস্টারও খুব খুসি, ওকে নিয়ে আর আমাকেও ভাবতে হবে না, আমার পেরিস্তানও নিরাপদ।

কালো-মাস্টার আরও বললে, "একটু বেশি রাত করে আসব, স্যার, তা হলে। এই চাতাল দিয়ে ঘুরে আসব, আপনি লাইব্রেরি-ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে রেখে শুয়ে পড়বেন।"

খাওয়া-দাওয়ার পর টর্চ নিয়ে গেলাম একবার পেরিস্তানে। কালো-মাস্টার আমাকে দেখে চমকে-টমকে একাকার। বললাম, "আবার এখানে এলে কেন। থেকে গেলেই পারতে।"

কালো-মাস্টার বললে, "না কত্তা, এসেছি ভালোই করেছি। নৌকোটাকে তো ঝোপের পেছনে ফেলে রাখা যায় না। এখানে রাখাও ঠিক নয়, তাই লুকিয়েছি কারখানা-বাড়ির ঘাটের নিচের আড়ালে। তা ছাড়া—"

"কি তা ছাড়া?"

"তা ছাড়া আজ বোধ হয় বিকেলে তোমার সত্যিকার বিশে তার সিংহকে নিয়ে এসে থাকবে।"

আমি এমনি চমকে গেলাম যে আর-একটু হলে পড়েই যাচ্ছিলাম। বললাম, "অসম্ভব, বিশে আসতেই পারে না।"

কালো-মাস্টার কোনো কথা না বলে, আমার হাতের টর্চটা নিয়ে সিঁড়ির ধাপের কাছে মাটির ওপর আলো ফেলল। দেখলাম বড় বড় থাবার দাগ। সঙ্গে মানুষের জুতো-পরা পায়ের ছাপও আছে। বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল। "—তুমি কোনো জিনিসপত্র এখানে ফেলে রাখ নি তো, কালো-মাস্টার?"

কালো-মাস্টার বললে, "ক্ষেপেছ! তাপ্পর তাই দেখে আমার সন্ধান পাক আর কি! আমার থাকবার মধ্যে ছিল তো ঐ দাড়িগোঁফ, সেও তোমার ছোটকার কাছে সঁপে দিয়েছি। দেখতে পার, তোমার চোরা ঘর খাঁ-খাঁ করছে, তোমার ঐ জলের বোতল আর খাবারের টিন ছাড়া কোথাও কিচ্ছু নেই। এখানে খুঁজলে কালো-মাস্টারের চিহ্নটুকু পাওয়া যাবে না। তুমি এবার যাও দিকিনি ঘরে, আমিও অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে তোমাদের লাইব্রেরি-ঘরে গিয়ে সেঁদোই। ওরকম কালো মুখ কেন গা? একটু আনন্দ কর, এই দেখ কেমন তোমার পেরিস্তান ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি। আমারই জন্য তোমার বন্ধু বিশে আসে না, সে কি আমি বুঝি নি ভেবেছ? এবার তাকে খবর দাও, সে এসে দেখে যাক পেরিস্তানের এতটুকু ক্ষতি করি নি।"

কালো-মাস্টারের দেখি মহাফুর্তি, থাবার দাগ আমাকে একবার দেখিয়েই সে বিষয় ভুলে গেছে, আমার কিন্তু আত্মাপাখি খাঁচাছাড়া। ও কথাটা বিভুদার কাছে শেখা। খালি মনে হতে লাগল কোথাও একটা গলদ থেকে যাচ্ছে, তাই থেকে এখনও অনেক বিপদের সম্ভাবনা আছে।

উপরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কালো-মাস্টারও ভাঁটার কাদা ভেঙে নদীর ধার দিয়ে রওনা দিল। ওকে নিয়ে আর আমার কোনো ভাবনাই রইল না। কেবলই বড় বড় থাবার দাগের কথা মনে হতে লাগল। ও যে সিংহের থাবা হতে পারে না সে আমি জানতাম···তবে কার?

হঠাৎ চমকে উঠে বসলাম। যদি পুলিশের ডালকুত্তোর হয়? যদি কালো-মাস্টারের শত্রুরা ওর পেছনে ডালকুত্তো লাগিয়ে থাকে? আবার শুলাম···তাও তো হবার জো নেই, জলের ওপর দিয়ে শুঁকে শুঁকে কুকুর

তো আসতে পারে না। আমি জলে নামি না বটে, মা-বাবা বলেন জলে নামলে গায়ে ঠাণ্ডা লেগে আমার সর্দি হবে, সেই সর্দি বুকে বসে আমার নিউমোনিয়া হবে। কিন্তু বিশেদের ছোট ছেলেরা হাঁটা শেখার আগেই নাকি সাঁতার শেখে। দেশ জুড়ে গায়ের শিরার মতো সুন্দর সুন্দর সব নদী, তাতে ওরা দিনরাত হেঁটে বেড়ায়—পথঘাটের চেয়ে নদীর জলে হাঁটিতেই ওদের সুবিধে লাগে। ওদের পেছনে কেউ ডালকুত্তো লাগালেও ওদের ধরতে পারে না। জল পেলেই ওরা জলে নেমে পড়ে, জলের ওপর দিয়ে ডালকুত্তো ওদের গন্ধ পায় না।

শুঁকে শুঁকে কারো খোঁজে ডালকুত্তো পেরিস্তানে আসে নি। পেরিস্তানের গন্ধই আলাদা। ওর শব্দও আলাদা, মানুষের গলার স্বর নেই ওখানে, খালি নদীর কলকল, ছলছল, মাঝে মাঝে দাঁড় বাইবার ছপাত-ছপাত, আর দূরে পুলের ওপর থেকে টং লিং—টং লিং—টং লিং।

এখন আমার ঘর থেকেও শুনতে পেলাম টং লিং—টং লিং—টং লিং—কোনো ভয় নেই, কোনো ভয় নেই।

এপার

এতদিনে সবার মনে হতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি নাটক হবে। কারো মনে এখন আর কোনো ভাবনা নেই; শিশুপালের মতো শিশুপাল এসেছে, বর্ম-অস্ত্র পরালে কে চিনবে কালো-মাস্টারকে। তার ওপরে যখন সবচেয়ে ভালো কোঁকড়া চুলটা আর পাকানো গোঁফটা পরে সেজেগুজে লাইব্রেরি-ঘরে রিহারসালের পর এসে ছোটকার আর আমার সামনে দাঁড়াল, আমরা তো হাঁ! কী একটা রাজা-রাজা ভাব, কে বলবে সত্যিকার শিশুপাল নয়।

সত্যি কথা। বলব? স্বয়ং বিশেও যে এর চেয়ে ভালো পার্ট করতে পারত এ আমার এখনো মনে হয় না। এর চেয়ে বেশি আর কি বলতে পারি? আর সে দাড়িগোঁফেরও তুলনা হয় না। ছোটকা বললেন, "বিশু, আমার চৌত্রিশ বছর বয়স, তার মধ্যে কুড়ি বছর ধরে প্রত্যেক পুজোয় নাটক করেছি, নাটক দেখেছি, কিন্তু দাড়িগোঁফের এমন বাহার আমি কল্পনাও করতে পারি নি।"

ইস, ছোটকা বেচারা যে এতটা বুড়ো তা আমি জানতাম না। এদিকে ফুর্তির চোটে সক্কলের পার্ট মুখস্থ হয়ে গেল, ঝগড়াঝাঁটি বন্ধ হয়ে গেল। এমন কি বিভুদা আমাকে আর একদিনও মারে নি। অবিশ্যি সব সময় কালো-মাস্টার কাছে কাছে থাকত বলেও সেটা হতে পারে।

মহালয়ার দিন সকালে হঠাৎ মা আর নিমকি এসে হাজির। ভালো পড়তে পারুক না পারুক পুজোসংখ্যা দুটোকে দেখে নিমকি যে কি খুসি সে আর কি বলব? তাই শুনে কালো-মাস্টার বললে, "তা হলে এবার ছোটকার কাছ থেকে সেই সাদা খরগোশ-জোড়াও এনে ওকে দাও। দেখো, আরো কত খুসি হবে।"

আরে, সাদা খরগোশের কথা যে ভুলেই গিয়েছিলাম। ছোটকা তখন আহলাদে ভরপুর, দুবার বলতে হল না, অমনি চিঠি লিখে দিলেন। সেই চিঠি হাতে করে, আমি নিজে গিয়ে খরগোশ দুটোকে নিয়ে এলাম। বড়কাকা একটা খাঁচাও কিনে দিলেন। নিমকিটা এমনি বোকা, আমাকে বললে, "ইস দাদা, তোমার মতো কেউ নাটক করতে পারে না। কি ভালো খরগোশ রে!" বলে খরগোশের গোঁফে হাত বুলোতে লাগল।

সে যাকগে, অন্যবারের মতো এবারও নাটক হল আমাদের বাড়ির মস্ত পুজোর দালানে। আজকাল আর পুজোটুজো হয় না সেখানে, তবে ছোটকাদের ক্লাবের নানান ব্যাপার হয়। কি চমৎকার উঁচু স্টেজ বাঁধানো সেখানে। তার দু পাশে পুজোর জিনিস রাখার ঘর দুটো বেশ আমাদের সাজের ঘর হল।

ড্রেস তো যে যার নিজেরটা যোগাড় করবে। কালো-মাস্টারের, আমার, বিভুদার আর আমাদের বাড়ির অন্যান্য যারা নাটক করছিল, সক্কলের ড্রেস বড়কাকা কলকাতার একটা বড় দোকান থেকে ভাড়া করে আনলেন। কালো-মাস্টারকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন, সে কিছুতেই গেল না। জিব কেটে বললে, "তাই কখনো হয়? সব যে আমার চেনাজানা, গেলেই হাতে হাতকড়া পড়বে।"

বড়কাকা অবাক হয়ে বললেন, "সে কি বিশু, তুমি কি কোনো অন্যায় কাজ করে গা-ঢাকা দিয়ে আছ নাকি? তাহলে তো—" বড়কাকা আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ছোটকা রেগে উঠলেন, বললেন, "দেখ মেজদা, যা করেছে করেছে, নাটক শেষ হবার পর তুমিও যা হয় কর। এখন যদি টুঁ শব্দটি কর তো ভালো হবে না বলে রাখলাম।"

কালো-মাস্টার বললে, "কি আর হবে ? আমাকে ফাটকে দেবে আর ভোঁদাবাবু কাপ পাবেন। ইনি হয়তো তাই চান।"

বড়কাকা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "কিন্তু চুরি-টুরি কর নি তো, বিশু ?"

কালো-মাস্টার বললে,

"অন্যরা যা ইচ্ছে বলতে পারে, আমি ওকে চুরি বলি না। নিজের জিনিস কেউ কখনো চুরি করে ?"

বড়কাকা বললেন, "ঐ তা হলেই হল, বিশু। এ নিয়ে আর আমি কিছু বলব না।"

লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের রিহারসাল চলতে লাগল। ওদিকে পুজোর সাত দিন আগে থেকেই অন্য যত সব প্রতিযোগিতার দলের নাটক শুরু হয়ে গেল। দশটা ক্লাব নাম লিখিয়েছিল। বড়কাকা ব্যবস্থা করে এসেছেন, আমাদেরটা হবে সবার শেষে, নবমী পুজোর দিনে। তার আগের দিন ভোঁদারা কর্ণার্জুন করবে।

দল বেঁধে আমরা রোজ নাটক দেখতে যাই, শুধু কালো-মাস্টার যায় না। বলে,

"হ্যাঁঃ, আর হাঁসাবেন না স্যার। সারাটা জীবন দেশের সেরা অভিনেতাদের সং কারবার করে এলাম, আর এখন আমাকে রিসড়ে-সেওড়াফুলির বাহাদুরদের দেখাচ্ছেন। সে সময়টুকু বরং দাড়িটাড়িগুলোকে গুছোলে কাজে দেবে। ওগুলো জ্যান্ত জানোয়ারের মতো স্যার, রোজ ওদের চেহারা বদলায়।"

গেল না কালো-মাস্টার। আমি তাতে নিশ্চিন্তই হলাম। সকলেই এত খুসি, এমন কি কালো-মাস্টার নিজেও, আর শুধু আমারই কিনা বার বার মনে হত, ওকে বিশে বলে চালানোটা বোধ হয় ঠিক হল না। অথচ তা না করলে নাটকও হত না, না চালিয়ে করিই বা কি ? ও তো আর নিজের নামে অভিনয় করবে না। নিজের কথা কিছু বলতেই চায় না।

বাবা এলেন সপ্তমীর আগের দিন সন্ধ্যেবেলায়। আমরা তেজারতি ক্লাবের 'কংসবধ' দেখে ফিরে এসে দেখি হাঁড়িমুখ করে বাইরের ঘরে বসে আছেন। বড়কাকাকে দেখেই জ্বলে উঠলেন, "তুইও যদি ওদের দলে গিয়ে জুটিস শম্ভু, তবে আর ওদের কি বলব।—গলার বোতাম লাগাও, চাঁদ।—এসে দেখি বাড়িতে একটা লোক নেই, শূন্য পুরী খাঁ-খাঁ কচ্ছে, বামুনদিদি পর্যন্ত বিকেলে রাঁধাবাড়া সেরে থিয়েটার দেখতে গেছে। বলি,

তোদের পাড়ার চোরগুলোরও নিশ্চয় থিয়েটার দেখার শখ আছে, নইলে বাড়ির বেবাক জিনিস পাচার হয়ে যায় নি কেন? তবু ঐ খেমো চেহারার চাকরটা ছিল, সে-ই আমাকে চা-টোস্ট খাওয়াল। নইলে পৈতৃক বাড়িতে, পুজোর আগের দিন বাবুরা সব যা অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। —বিকেলে দুধ খেয়েছিলে, চাঁদ?—চাকরটা বলল, রোজই নাকি এইরকম হয়। নাঃ, চাঁদটার আর কিছু হবে না বুঝতে পারছি, রোজ কড্‌লিভার অয়েলটা খাচ্ছিস্ তো?—যা ইচ্ছে করো গে তোমরা, তবু যে দয়া করে চাকরটাকে রেখে গেছিলে সেইজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। যদিও বেটার চেহারাটা স্রেফ চোরের মতো।"

আমরা এ ওর মুখের দিকে চাইলাম। চাকরটা বলতে যে কালো-মাস্টার ছাড়া আর কেউ নয়, এ আমাদের বুঝতে বাকি রইল না। একটু হাসিও পাচ্ছিল এই ভেবে যে এখন যাকে চোর চোর করছেন, একবার তার শিশুপালের সাজ দেখলে তাক লেগে যাবে না!

এদিকে বাবা এসেই আমার রাতে নাটক দেখা বন্ধ করে দিলেন। পাছে নবমীর দিন আমার নাটক করাও বন্ধ করে দেন, সেই ভয়ে কোনো আপত্তি করলাম না। আমি যাব না শুনে নিমকি খুব খানিকটা কেঁদে নিল। শেষটা মা-ও গেলেন না, নিমকিও গেল না। আমাদের তাই ভোঁদার দলের 'কর্ণার্জুন' দেখা হল না। রাতে ফিরে এসে খেতে বসে ছোটকারা খুব হাসাহাসি করতে লাগলেন। নাকি ভালো দাড়িগোঁফ পায় নি, সৈনিকদের সব আঁকা দাড়ি, ঘামে গালে গলে চটচট করছিল। গোড়ায় দাড়িগোঁফের নাকি কি ব্যবস্থা হয়েছিল, শেষ মুহূর্তে ঝগড়াঝাঁটি হয়ে সব ভেস্তে গেছিল। ছোটকা বললেন, "সহজে বলতে কি চায় ওরা? বুঝলে বিশু, তবু আঁচে জানলাম সিনেমার ঐ ভবেশ রায় যে কর্ণ সাজল—কি ছিরির অভিনয় তার, বলিহারি!—ও-ই শেষ মুহূর্তে কোত্থেকে একটা লোক ধরে এনেছিল, সে-ই সবাইকে সাজিয়েছে। নিয়েওছে নাকি দুশো টাকা, এখন সে টাকা কোত্থেকে আসে তার ঠিক নেই।"

কালো-মাস্টার ব্যস্ত হয়ে বললে, "কি নামটা লোকটার বললেন? দুশো টাকা নিয়েছে? বেশি নিয়েছে। দেওয়া উচিত হয় নি। আমাদের—"

বাবা চমকে গিয়ে ছোটকাকে বললেন—"ও কে বটু? ঐ তো আমাকে চা খাওয়াল।"

বড়কাকা বললেন, "ও আমাদের বিশু, চাঁদের বন্ধু। শিশুপালের বাবা

তার কান ধরে টেনে নিয়ে যাবার পর বটুরা তো কেঁদে ভাসাতে লাগল, তখন চাঁদ গিয়ে ওর বন্ধু বিশুকে ধরে নিয়ে এল। তাই তো আমরা বেঁচে গেলাম।"

বাবা বললেন, "ও।" বলে অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থাকলেন। আমিও অমন ভালো পায়েসটাকে না খেয়েই গুটিগুটি কেটে পড়লাম আমার শোবার ঘরের দিকে। সেখানে নিমকি খরগোশের খাঁচা মাথার কাছে রেখে দিব্যি ঘুমোচ্ছে। ওর কি মজা! ওর জীবনে কোনো ভাবনা চিন্তা নেই।

"স্-স্-স—"

চমকে ফিরে দেখি খিড়কির বাগানে দাঁড়িয়ে কালো-মাস্টার আমাকে জানালা দিয়ে ডাকছে। আস্তে আস্তে গিয়ে বললাম, "কি?"

কালো-মাস্টার বললে, "মাপ দ্যান কত্তা, আমার জন্যে আপনাকে কতই না ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হচ্ছে। আর তো কালকের দিনটি, কাল তোমাদের কাপ পাইয়ে দিয়ে হাওয়া হয়ে যাব, আর বিরক্ত করব না।—আর দেখ কত্তা, পরে যদি কেউ কিছু বলে কালো-মাস্টারের নামে, কিছু বিশ্বাস কর না। আর তোমার বন্ধু বিশের কাছে আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিও।"

কান্না পেতে লাগল, গলার কাছটাতে ব্যথা করতে লাগল। এত-সব হাঙগামার মধ্যে বিশের কথা মনেও ছিল না। বললাম,

"ও কালো-মাস্টার, আর গেছিলে পেরিস্তানে? আমি যে যেতে পারি না, নিমকি আমাকে ছাড়েও না, আবার পাঁচিলে চড়তে ও ভয় পায়।"

কালো-মাস্টার জিভ কেটে বললে, "পাগল! বিশের আর সিংহের পায়ের ছাপ দেখেছি, আর কি আমি যাই সেখানে? তার নামে চরে বেড়াচ্ছি। এখন কালকের দিনটা ভালোয় ভালোয় কাটলে বাঁচা যায়। তাপ্পর একেবারে কপ্পূর হয়ে যাব, এ এলাকায় কেউ আমার টিকিটি দেখতে পাবে না—ও কি কত্তা, তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে নাকি?"

চোখ মুছে বললাম, "ধেৎ! অম্বলটা বড্ড ঝাল ছিল কিনা!—কিন্তু ও বিশের আর সিংহের পায়ের ছাপ নয়, কালো-মাস্টার, আর কেউ এসেছিল।"

"সে আবার কি, কত্তা? কি করে জানলে তুমি?"

আমি খালি বললাম, "সে আমি জানি, কালো-মাস্টার। তাদের আসা সম্ভব নয়।"

কালো-মাস্টার চলে যাবার অনেকক্ষণ পর মা শুতে এসে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "বা রে, এই এক মাসে তুই তো দিব্যি বড়সড় হয়ে উঠেছিস চাঁদ। হাত-পা গুলো কি শক্ত রে বাবা। আর দেখ চাঁদ, তোর বাবা বলছিলেন কি ঐ রকম আজেবাজে বয়সে-বড় লোকদের সঙ্গে ভাব করিস নে আর, তুই এখনো ছোট ছেলে—"

আমি বললাম, "না মা, নিমকি ছোট ছেলে, আমার এগারো বছর কবে পূর্ণ হয়ে গেছে। বিশেরা"—ঐ অবধি বলে থেমে গেলাম।

মা বললেন, "সে কথাই তো বলছি, ঐ বিশুটির বয়স কম করে ধরলেও ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের কম নয়—"

আমি বললাম, "কি যে বল মা, ও তো পঁচিশ বছর ধরে থিয়েটারেই কাজ কচ্ছে, বেশ বুড়ো আছে। তা ছাড়া—"

মা বললেন, "তা ছাড়া কি? থামলি যে বড়?"

কি আর করি, ও যে বিশে নয়, আমি মিথ্যে করে ওকে বিশে বলে চালাচ্ছি, এ কথা মাকে কি করে বলি? তাই হাই তুলে বললাম, "এখন আমার ঘুম পাচ্ছে, মা।"

মা আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আলো নিবিয়ে চলে গেলেন। কি যে খারাপ লাগছিল। কালকের দিনটা কেটে গেলেই বাঁচি।

কালকের কথা মনে পড়তেই আবার উঠে বসলাম, কাল আমাদের কাপ পাইয়ে দিয়েই কালো-মাস্টার কর্পূর হয়ে যাবে, আর এ এলাকায় তার টিকিটি দেখা যাবে না।

পরদিন বললামও কালো-মাস্টারকে, "তুমি কলকাতায় আমাদের বাড়িতে এসো, কেমন? আমার ডাকটিকিটের খাতা তোমাকে দেখাব।"

কালো-মাস্টার জিব কেটে বললে, "কি যে বল কত্তা, তোমার একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই। আজ রাতে তোমাদের নাটককে কাপ পাইয়ে দিয়ে বেমালুম ডুব দেব। কোনো ডালকুত্তাও আর আমাকে শুঁকে শুঁকে বের করতে পারবে না। ও কি, নাক দিয়ে জল পড়ছে কেন, কত্তা? কেমন তোমার গোরিস্তানে আবার যাবে, সেখানে তোমার বন্ধু বিশে আসবে—সিংহ আসবে—আমি জলের বোতলে আবার জল ভরে রেখেছি; খালি টিনে মুড়ি, ডালমুট, কুচো নিমকি ভরেছি, বিশেদের খেতে দিও; একটা শিশিতে কিছু মুড়ি-স্যাবেনজুশও রেখে এসেছি, খেয়ো তোমরা।"

আমি বললাম, "সে কি, তুমি আবার গেলে কি করে? নালা টপকাতে

তো তোমার ভয় করে, অথচ তোমাকে বিশে বলে চালাচ্ছি! বিশেদের দেশে কি গভীর সমস্ত—"

থেমে গেলাম। কালো-মাস্টার বললে—

"বেশ তো, কাল থেকে আমি গায়েব হয়ে যাব, তোমার সাহসী বিশেকে নিয়ে থেকো তুমি। আচ্ছা, এতই যদি ভালো তোমার বিশে, তা হলে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে চেনা করিয়ে দাও নি কেন শুনি।"

আমি বললাম, "কে ভালো কে খারাপ সে তুমি বুঝবে না। যে-ই তোমাকে ভালো খাবার খাওয়ায় তুমি তো তাকেই ভালো বল। বিশে আমাদের বাড়ির লোকদের ঘেন্না করে বলেছি না তোমাকে। ভালো খাবারে সে ভোলে না।"

আর বেশি কথা হল না। ড্রেস-রিহারসালের জন্য সব লোকেরা এসে পড়ল। অবিশ্যি ড্রেস-রিহারসালে বিশে ছাড়া আর কেউ ড্রেস পরল না—ওমা, কাকে আমি বিশে বলছি, কালো-মাস্টারকে সবাই সারাক্ষণ এমন বিশু-বিশু করে যে আমার সুদ্ধু ভুল হয়ে যাচ্ছে। অথচ কিসে আর কিসে! যাই হোক, দুপুরে শেষ রিহারসাল হয়ে গেল, তারপর যে যার সাজপোশাক গুছিয়ে রাখল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে বিভুদাও গড়গড় করে পার্ট বলতে লাগল! আর বাবা পর্যন্ত বললেন,

"তা মন্দ কচ্ছে না বটুরা। সমরেশ কি সত্যিই পাঁচশো টাকা দিচ্ছে নাকি?"

বড়কাকা বললেন, "না দিলে তো আমাদের বাবুরা চোখে সর্ষেফুল দেখবেন, কান অবধি সব দেনায় ডুবে রয়েছেন! বটুকে কান্তা কেবিনের পথ দিয়ে হাঁটা বন্ধ করতে হয়েছে, ধারে আর কদিন চালানো যায়!"

কালো-মাস্টারও বললে, "আপনারা ভাববেন না, স্যার, আমরা মেরে বেরিয়ে যাব। নইলে আমার নাম কা—উঃ! চিমটি কাটছ কেন চাঁদ?"

আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম, "কোথায় চিমটি কাটলাম! চেয়ারের ফাঁকে তোমার ওখানটা চিপকে গিয়েছে বোধ হয়।"

পরে বললাম, "আচ্ছা, তোমার কি এতদিনেও একটু আক্কেল-বুদ্ধি হল না, আর-একটু হলেই তো সব ফেঁসে যাচ্ছিল। আমি ভুলে যাই যে তুমি সত্যিকার বিশে নও, আর তুমি ভুলতে পার না?"

কাছেপিঠে তখন কেউ ছিল না, কালো-মাস্টার চট্ করে আমাকে

একটা প্রণাম ঠুকে বললে, "আহা, তাই যেন হয়, স্টেজে উঠে সবাই যেন তাই ভাবে।—একটা কথা ছিল, কত্তা, অভয় দাও তো বলি।"

বললাম, "কি কথা বল।"

সে বললে, "কাপ তোমরা পাবে ঠিকই, সমরেশবাবুও তোমার বড়-কাকার হাতে পাঁচশো টাকা খুসি হয়ে দিয়ে দেবে। সব হবে, কিন্তু সন্ধ্যেটা নির্বিঘ্নে কাটবে বলে মনে হয় না। তোমার বড়কাকাকে একটু ডাকো দিকিনি, দুটো দরকারী কথা আছে।"

ডাকলাম বড়কাকাকে, লাইব্রেরি-ঘরের পিছনে একটা ফালি বারান্দা, সেখান থেকে গঙ্গা দেখা যায়, সেইখানে নিরিবিলি গিয়ে আমরা বসলাম। কালো-মাস্টার বললে, "স্যার, সন্ধ্যেবেলায় কয়েকটা ষণ্ডা-গোছের ভলেণ্টিয়ার রাখবেন, যে-ই গোলমাল করবে তাকেই যেন বাইরে নিয়ে যায়। আর অচেনা অজানা বাজে লোকদের খবরদার ঢুকতে যেন না দেয়—আমার অনেক শত্তুর স্যার, নাটক পণ্ড করে দিতে পারলে তারা ছাড়বে না। হ্যাঁ, তবে আমার বন্ধু স্যাণ্ডোকে বারোটা টিকিট দিয়েছি, তারা বারোজন আসবে। কোনো ভয় নেই স্যার, তাদের কতক কতক বলে রেখেছি, কেউ গোল করলেই তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে বাইরে নিয়ে যাবে—কিছু বললেন ?"

বড়কাকা বললেন, "কাজটা কি খুব ভালো হবে, বিশু ? সবাই আমাদের নিমন্ত্রিত অতিথি, একটু যদি গোলমালও করে—এই যেমন কাল বটুরা কতবার শেম শেম বলে চেঁচিয়ে এল ভোঁদাদের অভিনয় দেখতে গিয়ে।"

কালো-মাস্টার হেসে ফেলল, "ওরকম গোলমালের কথা বলছি না, স্যার, আজকের অভিনয় দেখে অমন কথা কারো বলতে ইচ্ছেই করবে না। আমি বলছিলাম, আমার শত্তুররা যদি আমার নাটক করা বন্ধ করে দিতে চায়—ধরুন আপনাদের কাছেই যদি মিছে কথা লাগিয়ে আমাকে ধরে নিয়ে যায়—"

বড়কাকা বললেন, "সে আমরা দেব কেন ? সবই যখন শুনলাম, তখন বিভুর দলকে ডেকে ওদের ছাতুপেটা করে দেব না—তোমার কোনো ভয় নেই, বিশু। আরে, চাঁদ দিনরাত তোমাদের সাহসের আর গুণ্ডাপনার গল্প করে করে আমাদের কানের পোকা নড়িয়ে দেয়, তুমি এখন ভয় খেলে চলবে কেন ? চল, আর খুব বেশি সময়ও নেই, সাজপোশাক শুরু কত্তে হয়—।"

কালো-মাস্টার বললে, "কিন্তু যদি পুলিস আসে? ওরা ধরুন পুলিসের কান ভাঙিয়ে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে এল? কিংবা নিজেরাই ধরুন পুলিস সেজে এল? থিয়েটার-করা লোক সব, চেনবার জো থাকবে না।"

বড়কাকা এবার ঘাবড়ে গেলেন। বললেন, "তা হলে কি হবে, বিশু?"

কালো-মাস্টার হাসল, "আরে, এতটুকুতেই মুষড়ে পড়লেন? আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না, শুধু গেটের ভলেন্টিয়ারদের বলবেন যে অচেনা লোকদের ঢুকতে দেবে না। আমার বন্ধু স্যাণ্ডোর দল একটা করে গাঁদাফুল কানে গুঁজে আসবে, তাই দেখে তাদের চিনবে। তাছাড়া কিন্তু পুলিস এলেও বাইরে বসিয়ে রাখবে নাটক না ভাঙা পর্যন্ত। তারপর নাটক ভাঙলে পর, আপনাদের কাপ পাওয়ার কথা সবাই শুনলে পর, স্বচ্ছন্দে আমাকে যার খুসি ধরে নিয়ে যেতে পারে। অবিশ্যি যদি আমার নাগাল পায়।"

এই বলে কালো-মাস্টার উঠে পড়ে সাজগোজের ব্যবস্থা করতে গেল।

বারো

আমাদের ঐ নাটকের বিষয় বেলুড় বালি থেকে হুগলি চুঁচড়ো বদ্যিবাটি পর্যন্ত লোকরা আজও গল্প করে। এমন নাটক কেউ দেখে নি। যেমনি তার সাজসজ্জা, তেমনি, অভিনয়ের বাহাদুরি। আজও লোকে বলে সবচেয়ে ভালো অভিনয় করেছিল, বিশ্বনাথ বলে লোকটা, যদিও তার সত্যিকার পরিচয় এখনো রহস্যে ছড়ানো। সব বলছি।

চমৎকার করে স্টেজ সাজানো, পেছনে গঙ্গার কুলকুল কলকল শব্দও শোনা যাচ্ছে না, প্যাঁপ্যাঁ পোঁপোঁ করে এমনি ভালো বাজনা বাজছে। তা আর বাজবে না। দি গ্রেট গ্যাঞ্জেস কন্‌সার্ট পার্টি যে বড়কাকিমার মাসতুতো ভাইয়ের নিজের দল।

দেয়ালে সব গাঁদাফুলের তোড়া ঝোলানো হয়েছিল, তাতে বিভুদাদের দলের পাণ্ডা সুকুমার নিজের হাতে পিচকিরি দিয়ে গোলাপজল ছিটিয়ে দিয়েছিল, চারদিক গন্ধে ভুরভুর করছিল। আমি একবার পর্দা ফাঁক করে উঁকি মেরে দেখি বাবা। শুধু মাথা—গুনগুন করে সব কথা বলছে,
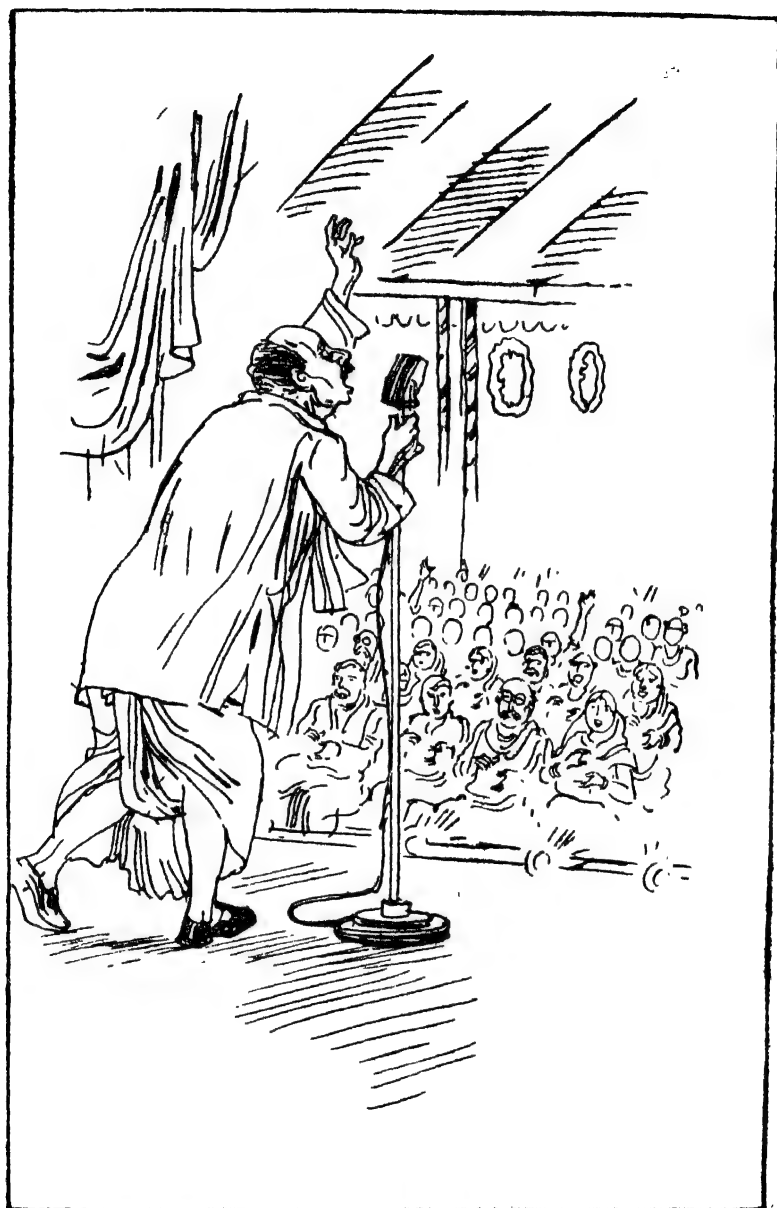
সমরেশ বাবু……মাইকের কাছে গিয়ে চিৎকার করে বললেন……

মৌচাকের মত শব্দ হচ্ছে। একটু পেট ব্যথা করতে আরম্ভ করে দিয়েছিল, ঐ অতগুলো লোকের সামনে দ্বিতীয় সৈনিক সেজে আমি ধপ করে পড়ে মরি কি করে। ভাবছিলাম ওরই মধ্যে কোথাও স্যাণ্ডো আর তার বন্ধুরা বারোজন কানে গাঁদাফুল গুঁজে বসে আছে, বিশের শত্তুররা এতটুকু ট্যাঁ-ফুঁ করলেই তাদের টুঁটি চেপে ধরবে।

তারপরেই কোথায় একটা ঘণ্টা বাজতে লাগল, আমার তো হাত-পা ঠাণ্ডা। বারে বারে বিশের—মানে কালো-মাস্টারের—মুখের দিকে তাকিয়ে সাহস পেতে চেষ্টা করলাম। তা ওকেও কি চেনবার জো ছিল। আমাদের সবাইকে সাজিয়েছে কলকাতা থেকে আনা সেই কোম্পানির লোকেরা, শুধু কালো-মাস্টার নিজে সেজেছে।

কি চমৎকার দেখাচ্ছিল ওকে! রং মেখে ফর্সা ধবধব করছে, লালচে দাড়িগোঁফ-চুল পরেছে, যেখানে সেখানে গয়না জ্বলজ্বল করছে, ভুরু দুটোকে সোজা করে টেনে মাঝখানে জুড়ে দিয়েছে, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে; মাথার ওপর মণিমানিক্য-দেওয়া পাগড়ি পরে এই এতখানি উঁচু দেখাচ্ছে; গায়ে মখমলের সাজ, হাতে একটা গোলাপফুল। সত্যিকার রাজা দেখেছিলাম একবার, কালো কোটপ্যাণ্ট পরা, সে এর কাছে দাঁড়াতেও পারত না। কানের পেছনে একটু আতর মেখে নিয়ে এক্ষুণি বধ হতে যাবে, বীর আর কাকে বলে!

আমরা যে অভিনয় করছি ভুলে গেলাম। মনে হল সত্যি সত্যি পঞ্চপাণ্ডব এসেছেন, ঐ বুঝি শ্রীকৃষ্ণ—তবে শ্রীকৃষ্ণের হাতের গয়নাগুলো বড্ড কেটে বসেছিল, সাজের বাবুরা তাই নিয়ে হাসাহাসি করছিল, কেষ্ট-ঠাকুরের গতর কত! ব্রজেনদা মনে মনে রেগে টং।

শেষ দৃশ্যে শিশুপালের অভিনয় দেখে সবাই কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছিল, তারই মধ্যে একটা চাপা শোরগোল শোনা গেল—চুপ-চুপ শব্দ, খুব নড়াচড়া, কারা যেন বেরিয়েও গেল। সব যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমার পর্যন্ত কান্না পাচ্ছে, হঠাৎ অবাক হয়ে দেখি, দুদিকে চেয়ারের সারি, মাঝখানে যাবার রাস্তা, তারই মধ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে ভোঁদা চেঁচাচ্ছে আর বড়কাকা, ছোটকা আরো দশ-বারোজন বড়রা ওকে ধরে, একরকম ঠেলতে ঠেলতে দরজার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। অন্য লোকেরা সবাই মিলে বলছে স্-স্-স্, তারই মাঝখানে শিশুপাল মরে গেল, স্ক্রীন পড়ে গেল। আর সে কি আকাশ-ফাটানো হাততালি!

হাততালির মাঝখানে আর-একবার স্ক্রীন উঠল, আর সমরেশবাবু ছুটে এসে, খচমচ করে স্টেজে চড়ে, মাইকের কাছে গিয়ে চিৎকার করে বললেন, "শিশুপাল-বধকেই আমরা পাঁচশো টাকা পুরস্কার দিলাম, আর শিশুপালকে বিশেষ পুরস্কার দেড়ভরি সুবর্ণপদক।

শিশুপালও ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, সমরেশবাবু অমনি তাকে বুকে জাপটে ধরেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ধন্য ধন্য রব আর আবার স্ক্রীন পড়ে যাওয়া।

এতক্ষণ স্টেজেই এত আনন্দ-কোলাহল হচ্ছিল যে বাইরের কথা কারো মনে ছিল না। এবার চারদিক থেকে কিলবিল করে লোকেরা সব স্টেজে উঠতে লাগল। বড়কাকা, ছোটকা, ভোঁদা, সেই চিত্রতারকা ভবেশ রায়, আর ওদের দলের আরো কত কে। কি রাগ সবার।

বড়কাকা বললেন, "চাঁদ!"

শুনে আমি থ! আমরা জিতেছি, কাপ পেয়েছি, তবে এরা এত গম্ভীর কেন! আর শুধু গম্ভীর কি বলছি, ভোঁদারা তো রেগে থরথর করে কাঁপছে।

বড়কাকা বললেন, "দাঁড়াও, কেউ যেও না। ভবেশবাবু, দাড়িগোঁফ চিনে নিন। এগুলোই কি আপনাদের? একটু ভেবে বলবেন।"

ভবেশ রায় গেল ঘাবড়ে, এর দাড়িতে হাত দেয়, ওর চুল দেখে, মুখটা কাঁচুমাচু, বললে,

"না, মানে, দাড়িগোঁফ কি আর সে রকম চেনা যায়? সব সময়ই ওদের চেহারা বদলায়!"

দারুণ চমকে উঠলাম, এ যে কালো-মাস্টারেরই কথা! কিন্তু কালো-মাস্টার কই? এক্ষুনি যেখানে ছিল এখন তো আর সেখানে নেই!

ছোটকা বললেন, "বিশে কোথায়, চাঁদ? সে নাকি এদের দাড়িগোঁফ চুরি করে পালিয়ে এসেছে?"

আমি ভয়ংকর রেগে গেলাম, হাত-পা ছুঁড়ে বললাম, "না, না, না, ও কক্ষনো চোর না!"

বড়কাকা বললেন,

"জিনিসই নেয় নি তো চোর কিসের? আপনাদের দাড়িগোঁফ ছাড়িয়ে নিয়ে যান।"

ভোঁদা বললে, "কিন্তু—কিন্তু—তাহলে তোমরা কাপ পাও কি করে? ও সাজ তো আমাদের!"

সমরেশবাবু বললেন, "আহা, কি জ্বালা, সাজের জন্যে তো আর কাপ দেওয়া নয়। অভিনয় কত্তে হয় তো এরাই করেছে! কিন্তু মশায়, ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন তো, কিছুই যে বুঝলাম না।"

ভোঁদা বললে, "কি আবার ব্যাপার? ভবেশ ওকে আনল, বললে আমাদের থিয়েটারের মেকাপম্যান, নাম কালো-মাস্টার, এত ভালো সাজাতে কেউ পারে না। তা সে বেটা একদিন রিহারসাল দেখেই বলে, আমাকে কর্ণ সাজাও, ভুবুবাবু কিচ্ছু পারছে না। ব্যস্, ওই ওর এক কথা! এদিকে ভবেশ করছে কর্ণ, যা-তা একটা বললেই তো আর হল না। তখন কালো-মাস্টার করল কি, স্রেফ দাড়িগোঁফ নিয়ে কেটে পড়ল। কোম্পানিকে টাকা দেওয়া হয়ে গেছে, আর আমাদের টাকা কোথায় যে আবার দাড়ি-গোঁফ ভাড়া করব? বলুন দেখি কি অন্যায়! আবার আমাকে হল থেকে ঠেলে বের করে দেওয়া হয়েছে!"

কখন বাবাও এসে স্টেজে উঠেছেন আমি দেখি নি। আমার দিকে ফিরে বাজের মত গলায় বললেন,

"চাঁদ, কোথায় পেলে ওকে? সে যা-ই হোকগে, ওকে এখন ধরা হোক, হাজতে পোরা হোক। কিন্তু কোথায় ওর সঙ্গে আলাপ হল, হতভাগা?"

আর কি আমি সেখানে থাকি! একনিমেষে এক্কেবারে হাওয়া। পেছনে শুনলাম একটা হৈ-হৈ ধর-ধর শব্দ, তারপরেই পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে, পাঁচলে চড়ে সরু ফাঁক দিয়ে গলে, নালা ডিঙিয়ে এক্কেবারে পেরিস্তানে!

বুকটা ঢিপঢিপ করছিল। এমন সময় শুনলাম টং লিং—টং লিং—টং লিং করে পুলের ওপর দিয়ে মালগাড়ি যাচ্ছে, স্যাণ্ডো বেরিয়ে এসে সবুজ নিশান নাড়ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ওরই ঘরের ছাদ থেকে গেঞ্জি-পরা কালো একটা লোক মালগাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত নাড়তে নাড়তে চলে গেল। উঃফ্, আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম!

এতক্ষণে খেয়াল হল আমি একা নই, আমার সামনে আমার সমান বয়সের একটা ছেলে আর তার চেয়ে একটু ছোট একটা মেয়ে আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। আর একটা পোড়া হাঁড়ির মতো মুখওয়ালা লেজকাটা কুকুর আমার পায়ের গোড়ালি শুঁকছে।

ছেলেটা বলল, "আমরা পাশের গুদোম-বাড়িতে থাকি, ঐ নালা পার

হয়ে এসেছি। আমার নাম কালো, ও আমার বোন আলো। আর কুকুরটার নাম বাঘা। আমরা মাঝে মাঝে এখানে আসি, ভারি ভালো লাগে এ জায়গাটা—তুমি রাগ করবে না তো ?"

আমি বললাম, "না, মোটেই রাগ করব না, এখন থেকে তোমরা আমার বন্ধু। আমার বড় বন্ধুর দরকার। এক্ষুণি আমাকে ধরবার জন্য লোকরা আসবে, তোমরা ভয় পাবে না তো ?"

তারা বলল, "মোটেই না, আমরা তোমার দলে থাকব। তোমাকে সাহায্য করব।"

এবার আসুক ওরা, ধরুক আমাকে। একটুও ভয় পাব না। বলব, "কালো-মাস্টার চোর নয়, দেখে আসতে পার, সঙ্গে কিছু নেয় নি, সাজের ঘরে গয়না-পোশাক ছেড়ে রেখে গেছে। তার সুবর্ণপদকও নেয় নি, ওটা বিক্রি করে, ভোঁদারা কোম্পানিকে দাড়িগোঁফের জন্য যে টাকা দিয়েছিল সেটা পুরিয়ে দাও, ব্যস্, চুকে গেল! হাঁ করে দেখছ কি ? তাকে পাচ্ছ না, সে চলে গেছে!"

তখন বিভুদা হয়তো বলবে, "আর তোর বন্ধু বিশে, সে কোথায় ? তার সিংহ কুকুর কোথায় ?" বলে আমার মাথায় গাঁট্টা মারতে চেষ্টা করবে।

আমিও তখন ওর হাত ধরে মুচকে দিয়ে বলব, "তাকেও ধরতে পারবে না। সেও নেই, সিংহও নেই, ছিলও না কোনোদিন। আমি তাদের বানিয়েছিলাম। আমার গায়ে জোর ছিল না, আমার বন্ধু ছিল না, ভয় লাগত, একলা লাগত, তাই তাদের বানিয়েছিলাম। এখন আমার গায়ে জোর কত ; আমার সত্যিকার বন্ধু হয়েছে, আর বিশেরা আসবে না। আরে, বিশে বলে কেউ আছে নাকি যে তাকে ধরবে ?"

ভেবেও হাসি পাচ্ছে।

সুকুমার রায়

এক

পঞ্চাশ বছরের পুরানো একটা খাতা, কালচে রঙ ধরা লাল খেরোয় বাঁধানো, ময়লা দড়ি দিয়ে জড়ানো। প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে লেখা, হিজিবিজি খাতা, উড়ো খাতা, ফালতো খাতা, এমনি খাতা, বাজে খাতা, খসড়া খাতা, জাবেদা খাতা।

চলন্তিকায় জাবেদার মানে দেওয়া আছে দৈনিক হিসাবের খাতা। এ খাতাটাও একটা মানুষের মনের নোট বই। প্রথম পাতার উপরের কোণায় ছোট্ট করে তারিখ লেখা, মে ১৯১৮ আর নিচের কোণায় আরো ছোট করে একটি নাম লেখা, সুকুমার রায়।

ভিতরে পাতায় পাতায় আঁকিবুঁকি, ছবি, নক্সা,—একটা দাড়িওয়ালা মুখের ছবির নিচে লেখা 'নাজিমোভা'—কবিতার খসড়া, প্রবন্ধের কাঠামো, পেনসিলে কিম্বা কালিতে, এলোমেলো, যেমন তেমন, মানুষের মনের মতন। তারি মধ্যে এক জায়গায় কাটাকুটি সহ লেখা আছে,

"রসের মাঝে মজবি যদি মন,
বাস্তবের এই বস্তুলীলার তত্ত্ব কথা শোন্।
জড়জগতের বাস্তুভিটায় বস্তু করেন বাসা,
নিংড়ে দেখ রসের মধু মৌচাকে তাঁর ঠাসা।"

এই চিন্তাটাই ছিল এই অসাধারণ মানুষটির মনের মূলে; এরি মধ্যে তাঁর অসাধারণত্বের বীজ। বাস্তব আর রস, গাম্ভীর্য আর হাসি উল্টো জিনিস নয়, একসঙ্গে তারা লেপটে থাকে। বিজ্ঞান আর কাব্যও পরস্পর-বিরোধী নয়, বরং পরস্পরকে তারা সম্পূর্ণতা দেয়, অর্থময় করে তোলে। অর্থাৎ আয়নার পিছনে যেমন পারাটুকু মাখানো থাকবে, কাচের উপর আলো পড়বে, তবেই না তাতে জীব-জড়ের ছবি ফুটে উঠবে, তেমনি বাস্তবের গায়ে রসের প্রলেপ লেগে থাকবে, তার উপর বুদ্ধির আলো পড়বে, তবেই না সত্যকে চেনা যাবে।

মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে যদি এই অসাধারণ মানুষটির আয়ু শেষ হয়ে না যেত, তা হলে ধ্বনি আর অক্ষরকে তিনি কি সমৃদ্ধি দিয়ে যেতে পারতেন কে জানে। বিজ্ঞান ও রসজ্ঞান, যারা অখণ্ড ও এক, যাদের মধ্যে বিরোধ থাকা নিতান্ত অসম্ভব, তাদের মর্ম নিয়ে এত ভুল বোঝাবুঝি হয়তো তিনি অনেকখানি ঘুচিয়ে দিতেন। তাঁর একটি অসম্পূর্ণ রচনা 'বর্ণমালাতত্ত্বে' তিনি লিখেছেন,

"পড় বিজ্ঞান, হবে দিকজ্ঞান, ঘুচিবে পথের ধাঁধা,
দেখিবে গুণিয়া এ দীন দুনিয়া নিয়ম নিগড়ে বাঁধা।
কহে পণ্ডিতে জড় সন্ধিতে, বস্তু পিণ্ড ফাঁকে,
অণু অবকাশে রন্ধ্রে রন্ধ্রে, আকাশ লুকায়ে থাকে।"

(অর্থাৎ inter molecular space এ-ও আকাশের কণিকা থাকে)

"হেথা হোথা সেথা জড়ের পিণ্ড আকাশ প্রলেপে ঢাকা,
নয়কো কেবল নীরেট গাঁথন, নয়কো কেবলি ফাঁকা।
জড়ের বাঁধনে বদ্ধ আকাশে, আকাশ বাঁধন জড়ে,
পৃথিবী জুড়িয়া সাগর যেমন, প্রাণটি যেমন ধড়ে।"

সুকুমার রায়ের বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে সূচনাতেই এত কথা বলতে হয়, তার কারণ—বেশির ভাগ লোকের ধারণা হল যে সুকুমার রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই যে তিনি আবোল-তাবোলের আবিষ্কারক এবং কে না জানে যে ছোটদের জন্য লিখতে হলে আবোল-তাবোলই সব চাইতে সহজ। মানের বালাই নেই অথচ কান বেশ খুশি হয়। অনেক অনুকারকও দেখতে দেখতে জুটে গেল যাদের রচনাতে না রইল অর্থ, না রইল রস। সুকুমার রায়ের দোহাই দিয়ে অনেক সমালোচকও এদের সমর্থন করলেন। ফলে বাংলার শিশু-সাহিত্যের পিঠে এক বিষম বোঝা চেপে গেল।

সব চাইতে মজার কথা হল সুকুমার রায় নিজে কখনও এমন একটিও পদ রচনা করেন নি, যার মধ্যে অর্থ এবং রস দুই-ই নেই। যা অসম্ভব ও অপ্রকাশিত, অভাবনীয় ও অনির্বচনীয়, তাকে যদি কথা দিয়ে প্রকাশ করতে হয়, অরূপ ও অপরূপকে যদি রূপ দিতে হয়, তা হলে তা কি রকম দাঁড়ায়, সুকুমারের লেখা আর আঁকার মধ্যে তার নমুনা দেখা যায়। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি আঁচড় অর্থে আর রসে টৈটুম্বুর।

ধ্বনিকে তিনি এত শ্রদ্ধা করতেন যে হেলায়-ফেলায় শব্দ ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। অভিধানে উল্লিখিত শব্দই হক আর লোকমুখে ব্যবহৃত শব্দই হক, উচ্চারিত ধ্বনিই হক বা লিখিত অক্ষরই হক, শব্দের অসাধারণ শক্তি সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই সচেতন ছিলেন।

'কলম ও কালি' নামক তাঁর ছোট্ট একটি কবিতাতে হাসির ছলে এই শ্রদ্ধার কথাটি কেমন প্রকট হয়ে উঠেছে, যথা :—

"মনের কথাটি ছিল যে মনে,
রটিয়া উঠিল খাতার কোণে।
আঁচড়ে আঁকিতে আখর কটি,
কেহ খুশি, কেহ উঠিল চটি।
রকম রকম কালির টানে
কারো হাসি কারো অশ্রু আনে।
মারে না ধরে না হাঁকে না বুলি,
লোকে হাসে কাঁদে কি দেখি ভুলি?
সাদায় কালোয় কি খেলা জানে,
ভাবিয়া ভাবিয়া না পাই মানে।"

এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে সুকুমার রায় আবোল-তাবোল নাম দিয়ে বই লিখলেও, আবোল-তাবোলের আবিষ্কারক তিনি নন, বরং সব দেশের লোক-কথা চিরকাল আবোল তাবোল দিয়ে ঠাসা। যে সব আবোল-তাবোল কালের পরীক্ষায় পাস করেছে, সেগুলিকে নিতান্ত অর্থহীন প্রলাপও বলা যায় না, কারণ অনুপ্রাস ও ধ্বনিগত তাৎপর্যের ফলে তারা ক্রমে রস এবং রূপ দিয়ে মণ্ডিত হয়ে ওঠে, তখন আর তাদের অর্থ নেই এ কথা বলা চলে না।

সুকুমার রায় অবশ্য এভাবেও আবোল-তাবোল লেখেন নি; অর্থের বাঁধন কেটে দিলে কি অনর্থের সৃষ্টি হতে পারে তাই নিয়েই তাঁর গোটা একটি নাটিকা রচিত হয়েছিল। সে নাটিকার নাম শব্দকল্পদ্রুম, যথাস্থানে তার আলোচনা হবে।

সারা জীবন ধরে তিনি 'হিউমর'কে,—অর্থাৎ বাংলায় যাকে হাস্যরস, কিম্বা শুধু রস বলে, তাকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে রসের ব্যবহার ছিল না এ কথা বলা যায় না; কিন্তু তার

কোনো মর্যাদাই ছিল না। হয় সে ছিল ভাঁড়ামি, গম্ভীর নাটকের দুটি গম্ভীর দৃশ্যের মাঝখানে, দর্শকদের হাঁপ ছাড়বার অবকাশ দেবার উদ্দেশ্যে, একটুখানি সঙের খেলার মতো। নয়তো সে ছিল তীব্র শ্লেষে ভরা ব্যঙ্গ-রচনা। রসরচনা আর ব্যঙ্গরচনার মাঝখানে অতল সাগর বয়ে যায়। সম্মান পাবার যোগ্য নির্ভেজাল রস বাংলায় খুঁজে পাওয়া দায় ছিল। সে রস পরিবেশন করার আধারও বড় একটা চোখে পড়ত না।

এ ধরনের রসকে বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করতে হয় না, এ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অতিশয় প্রকট। এর একটি সাধারণ ও সর্বজনীন দিক আছে, যাকে চিনতে ছেলেবুড়ো কারও বেশি বিদ্যার দরকার হয় না; কিন্তু যাকে সৃষ্টি করার শক্তি ধরে অতি অসাধারণ দু-এক জনা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অনেকেই কোনো না কোনো সময়ে রসরচনা লিখেছেন। হুতোম প্যাঁচা, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন এবং আরো কেউ কেউ ব্যঙ্গরচনায় দক্ষ। এসব রচয়িতারা চোখে বিচারকের ঠুলি এঁটে অন্য লোকের দোষ-দুর্বলতা দেখিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু ব্যঙ্গের পাত্রের সংগে এক আসনে বসেন নি। নিছক হাস্যরসের পরোক্ষ কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, তাকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা যায় না। সুকুমার রায়ের আগে আমাদের দেশে এ ধরনের লেখক বেশি চোখে পড়ে না। সেকালের যাত্রার পালা যাঁরা লিখতেন তাঁরা এই ভাবধারাটি খানিকটা বুঝলেও, তাঁদের রচনা উঁচুদরের সাহিত্যের স্তরে উঠতে পারে নি। একমাত্র অবনীন্দ্রনাথের অনেক লেখার মধ্যেই এই শ্লেষ-শূন্য রসের অবতারণা দেখা যায়, কিন্তু তাঁর রসরচনার মন-কেমন-করা ভাবের জন্য অনেক সময়েই হাসির সঙ্গে কান্না পায়। কাজেই তাকে অনাবিল হাস্যরস বলা যায় না। আবার মাঝে মাঝে তাঁর অতিশয় উদ্ভট কল্পনা শক্তি এসে হাসির রঙ্গমঞ্চে বাগড়াও দেয়। সুকুমার রায়ের রসরচনার স্রোত কাচের মতো স্বচ্ছ, তাতে সূর্যের আলো পড়ে নানা রঙ ঠিকরোয় এবং যে সব চলায়মান প্রতিবিম্ব দেখা যায়, সে-গুলি যেমন অন্য লোকের ছায়াও হতে পারে, তেমনি দর্শকের নিজের ছায়াও হতে পারে। যারই ছায়া হক তারা দেখতে ভারি মজার। তাদের দেখে প্রচুর হাসিও পায়, আবার ভিতরে ভিতরে নিজের সম্বন্ধে খানিকটা অস্বস্তিও হয়।

সুকুমার রায়ের ছোটদের লেখক বলে খ্যাতি থাকলেও, তাঁর রচনা-গুলি নিছক শুধু ছোটদের জন্য নয়। তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই

যে যে-সব ছোটদের বই সমঝদার বয়স্কদের সমর্থন পায় না, সেগুলি প্রথম শ্রেণীর শিশুসাহিত্য নয়। ছোটদের ভালো বই বড়দেরো ভালো লাগা উচিত। সত্যি কথা বলতে কি, এইখানেই তাদের আসল পরীক্ষা, সহানুভূতিশীল বড়রাও তাদের ভালো বলেন কিনা। ছোটদের অপরিণত বুদ্ধি সব সময় ভালোমন্দ যাচাই করতে পারে না ; তাদের কাছে যেটা ভালো লাগে, আসলে সেইটেই সব চেয়ে ভালো, এমন কোনো কথা নেই। অনেক খেলো জিনিসও তাদের ভালো লাগে ; তাদের রুচির কোনো মানদণ্ডই তৈরি হয় নি। তবে এ কথাও সত্যি যে বয়স্ক সমালোচকরা হাজার প্রশংসা করলেও, যে বই ছোটদের আনন্দ দিতে পারে না, রসের সভায় তাকে পাস নম্বর দেওয়া যায় না। এই দিক দিয়েও সুকুমার রায়ের রচনা-সম্ভারকে বিচার করতে হয়।

ঠাকুমার ঝুলির গল্পগুলির আদি রচয়িতা যে কে বা কারা, এ কথা আজ আর কেউ জিজ্ঞাসা করে না। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার গল্পগুলি সংগ্রহ করে দিয়েছেন, এই যথেষ্ট। রচনা যখনি দেশের জনসাধারণের সম্পত্তি বলে স্বীকৃত হয়, তখনি তার পরম শুভ মুহূর্ত এসেছে বলে ধরে নেওয়া যায়। অনেক সময়ই দেখা যায়, ঠিক সেই সঙ্গেই রচয়িতার নামটি লোকে ভুলে যেতে বসেছে বা নাম জানলেও তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল শুধু দু-চারজন জিজ্ঞাসু পাঠক ছাড়া, বিশেষ কারো নেই। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সুকুমার রায় সকলের ভাগ্যেই এই প্রায়-বিস্মৃতি লেখা ছিল। এখনো তাঁদের বইয়ের নতুন সংস্করণ বেরুলে, ছেলেবুড়ো অবাক বিস্ময়ে পড়ে, কিন্তু মানুষগুলির সঙ্গে তাদের পরিচয় ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে, অথচ বাংলা সাহিত্যে তাঁদের অবদানের মূল্য কতখানি সে কথা চিন্তা করবার এই হল সময়।

বাণীর বীণায় যারা নতুন সুর চড়াতে পারে, সাহিত্যের সভায় তাদেরি আসন সব চাইতে উঁচুতে। সুকুমার রায় বাংলার রসসাহিত্যে যে নতুন সুর বেঁধে দিয়েছিলেন, তাতে হাসির মর্যাদা গাম্ভীর্যের মর্যাদার সমান হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য এই নতুন সুরের মর্ম সবাই নেবেও না, মানবেও না। সুকুমারের নিজের একটি নাটক থেকে এই কথাগুলি উদ্ধৃত :—

'এসব কথা শুনলে তোদের লাগবে মনে ধাঁধা
কেউ বা বুঝে পুরো-পুরি, কেউ বা বুঝে আধা।
(কেউ বা বুঝে না।)

কারে বা কই কিসের কথা, কই যে দফে দফে,
গাছের পরে কাঁঠাল দেখে তেল মেখো না গোঁফে !

(কাঁঠাল পাবে না ;)

একটি একটি কথায় যেন সদ্য দাগা কামান,
মন বসনের ময়লা ধুতে তত্ত্ব কথাই সাবান !

(সাবান পাবে না)

কি রকম মানুষ ছিলেন সুকুমার রায় ? যে মানুষ নিজের ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ স্ফুরণের আগেই ছত্রিশ বছর বয়সে, ১৯২৩ সালে পরলোকে চলে গেলেন, তাঁকে জানত শুনত এমন লোকই বা ক-জন বাকি আছে ?

দুই

প্রতিভা কারো ঘরে তিন পুরুষ ধরে বাঁধা রয়েছে, এমন বড় একটা শোনা যায় না। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর তাঁর সন্তানদের মধ্যে অনেকেই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন বটে, কিন্তু তৃতীয় পুরুষে সেই বলিষ্ঠ প্রতিভার ধারা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। সুকুমার রায়দের বেলা এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে।

ময়মনসিংহের মসূয়াগ্রামের এই রায় পরিবার সর্বদাই গতানুগতিকের চেয়ে একটু আলাদা বলে খ্যাত ছিল। এঁদের শারীরিক শক্তি, বিদ্যানুরাগ, বাক্যরচনা ও সঙ্গীতে পারদর্শিতার সকলে প্রশংসা করত। সেই সঙ্গে ছিল গভীর ধর্মভাব ও সাংসারিক বিষয়ে ঔদাসীন্য। সুকুমারের প্রপিতামহ লোকনাথের একদিকে যেমন গণিত শাস্ত্রে ও জরিপের কাজে অসামান্য দক্ষতা ছিল, অন্যদিকে ছিল তন্ত্রসাধনায় প্রবল অনুরাগ। পাছে তিনি সংসারত্যাগী হন, এই ভয়ে বাপ মা তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন। তাতে কোন ফল হল না দেখে শেষে একদিন তাঁর তন্ত্রসাধনার উপাদানগুলিকে তাঁর বাড়ির পাশেই ব্রহ্মপুত্রের জলে ফেলে দিলেন। ক্ষোভে দুঃখে লোকনাথ সেই যে শয্যা নিলেন, আর উঠলেন না। একটি শিশুপুত্র রেখে গিয়েছিলেন। তার নাম কালীনাথ, সবাই তাকে শ্যামসুন্দর বলে ডাকত।

শ্যামসুন্দর বড় হলে, তাঁর বলিষ্ঠ দেহ ও নানান ভাষায় ব্যুৎপত্তি দেখে

লোকে অবাক হত। সংস্কৃত, আরবী, ফার্সিতে এমন সুপণ্ডিত কম দেখা যেত। শোনা যায় এই তিনের মধ্যে যে কোনো ভাষার রচনা সামনে রেখে, অন্য দুই ভাষায় এমন গড় গড় অনুবাদ করে যেতেন যে শ্রোতারা বিশ্বাসই করতে পারত না যে তিনি মূল রচনা থেকে পড়ছেন না, মুখে মুখে তর্জমা করছেন। লোকে তাঁকে শ্যামসুন্দর মুন্সি বলত। বেশি দিন বাঁচেন নি তিনি।

শ্যামসুন্দরের দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল কামদারঞ্জন। পাঁচ বছর বয়সে তাঁকে হরিকিশোর রায় চৌধুরী নামক একজন একটু দূর সম্পর্কের কাকা দত্তক নিয়েছিলেন। এখন থেকে তাঁর নাম হল উপেন্দ্রকিশোর। অসাধারণ এবং বহুমুখী প্রতিভা ছিল তাঁর। এক দিকে যেমন শিল্পে ও সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন, অন্য দিকে তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভাও ছিল অসামান্য।

ছবি আঁকা শিখবার জন্য কলকাতায় এসে বাস করবার সময় তখনকার সমাজসংস্কারকদের সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোর পরিচিত হন এবং পরে ব্রাহ্ম হন ও সমাজসেবক তেজী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। পরে উপেন্দ্রকিশোরের বৈজ্ঞানিক খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর হাফটোন ব্লক প্রিন্টিং এর নতুন প্রণালী ইউরোপের বিশেষজ্ঞরাও সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিট্যানিকাতে তাঁর নামোল্লেখ আছে। তা ছাড়া কবিতা, গান, গল্প, রচনা তাঁর মতো কম লোক পারত। অপূর্ব বেহালা বাজাতেন, বাজাতে বাজাতে বহির্জগৎকে ভুলে যেতেন।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও উপেন্দ্রকিশোর কয়েক বছরের মধ্যে বাংলার শিশুসাহিত্যের নতুন যুগ প্রবর্তন করে দিলেন। তাঁদের বইয়ের যেমন লেখা, তেমনি ছবি আর তেমনি সর্বাঙ্গসুন্দর প্রকাশন। আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে তাঁরা বাংলা শিশুসাহিত্যকে যেন পরিণতি ও সমৃদ্ধি দিয়েছিলেন, তার ফলে আজ পর্যন্ত তার উচ্চ মান ক্ষুণ্ণ হয় নি। দুঃখের বিষয়, সে উচ্চ মান আজ পর্যন্ত কেউ অতিক্রম করে নি।

উপেন্দ্রকিশোরের জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেন সুকুমার রায়; সুকুমারের একমাত্র সন্তান সত্যজিৎ। চলচ্চিত্র পরিচালনার জন্য সত্যজিতের জগৎজোড়া খ্যাতি আছে তো বটেই, তার উপরে ছোটদের জন্য গল্প-

রচনাতেও তিনি সুদক্ষ। ১৯৬৭ সালের বাংলা শিশুসাহিত্যের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার তাঁর সুযোগ্য হাতে অর্পিত হয়েছে। বইয়ের নাম প্রফেসর শঙ্কুর ডায়ারি। বিজ্ঞানভিত্তিক্ কল্পনার সৃষ্টি, উদ্ভট অদ্ভুত। এই তিন পুরুষের প্রতিভা ; তাঁর মধ্যে সুকুমারই সম্ভবত সব চাইতে বলিষ্ঠ শক্তি নিয়ে জন্মেছিলেন, কিন্তু কাজ শেষ করে যাবার সময় পান নি। কেবলমাত্র প্রথম বই আবোল-তাবোলের ডামি কপিটি ছাড়া, নিজের কোনো রচনাকেই বই হয়ে বেরুতে দেখে যান নি।

তিন

১৮৮৭ সালে, ১৩নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে লাহাদের বিশাল বাড়ির দোতলার একটি ঘরে সুকুমারের জন্ম হয়। ঐ বাড়ির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল; দু-চারটি করে ঘর ভাড়া নিয়ে তখনকার কয়েকটি সাহসী ও স্বাধীনচেতা পরিবার সেখানে বাস করতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্ম হয়েছিলেন ; রাস্তার ওপারেই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনাগৃহ। উৎসবাদিতে অনেক সময় এ বাড়ির লম্বা ছাদে সারি সারি পাত পড়ত।

তাছাড়া এই বাড়ির নিচের তলায় বিখ্যাত ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের ক্লাস চলত। ছোট একটি বোর্ডিংও ছিল। বিকেলবেলায় সব ছেলে-মেয়েরা ছাদে গিয়ে খেলা করত। বলা বাহুল্য সুকুমারের ও তার ভাই-বোনদের ঐ স্কুলেই অক্ষর পরিচয় হয়েছিল এবং ঐ ছাদেই খেলাধুলো চলত। সুকুমারের বড় বোন বাংলা দেশের সব ছেলেমেয়েদের চেনা। তাঁর নাম সুখলতা রাও। তাঁর লেখা দেশী ও বিদেশী রূপকথা, মধুর কবিতা ও গান যে পড়েছে সেই মুগ্ধ হয়েছে। তার উপর চমৎকার তেল ও জল রঙের ছবিও আঁকতেন। ছোটবেলায় অমন শান্ত লক্ষ্মী মেয়ে খুব বেশি দেখা যেত না। দিদি শান্ত লক্ষ্মী হলে কি হবে, সুকুমারকে কেউ অতটা বলতে পারত না। মাঝে মাঝে বিকেলে ছাদে উঠে বড়রা দেখতেন একজন কোঁকড়া চুল মোটাসোটা মিষ্টিমুখো শ্যামল ছেলে ঢিলে কুর্তা আর পাজামা পরে ডাণ্ডা হাতে মেয়েদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ছেলেটির ডাকনাম

'তাতা' ; তার ছোট দিদিটিরো একটা ডাকনাম ছিল 'হাসি', কিন্তু সে সর্বদা এত গম্ভীর মুখ করে থাকত যে শেষ পর্যন্ত ও নাম সবাই ভুলেই গেল। বলা বাহুল্য উপেন্দ্রকিশোরের বন্ধু রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' থেকে ছেলে-মেয়েদের ঐ নামকরণ হয়েছিল।

তেরো নম্বরের বাড়িটা ছোট ছেলেমেয়ে দিয়ে ঠাসা ছিল। সারাদিন পড়াশুনা, গানবাজনা, অভিনয়, খেলাধুলো, সিঁড়ি দিয়ে কেবলি দুপ্ দুপ্ করে ওঠানামা লেগেই ছিল। তার উপর সুকুমারদের পরিবারটিও নেহাৎ ছোট ছিল না। সুকুমারের পরেই খুসি বলে একটি দুরন্ত বোন। তার ভালো নাম পুণ্যলতা ; অনেক পরে 'ছেলেবেলার দিনগুলি' নাম দিয়ে একটি বই লিখে তিনি তাঁদের শৈশবটিকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছেন। খুসির পর মণি ; শান্ত সুদর্শন রসময় সুবিনয় রায়, যিনি গান গাওয়ায়, অভিনয় করায়, ছোটদের জন্য গল্প ও প্রবন্ধ লেখায় ওস্তাদ ছিলেন ; কিন্তু যাঁকে দাদার বলিষ্ঠতর প্রতিভা আড়াল করে রাখত, যতদিন না এক দুঃখের দুপুরে সেই দাদা চিরকালের মতো বিদায় নিলেন। তাছাড়া নানকু আর টুনি বলে ছোট ভাইবোন ছিল, তারাও ভালো কবিতা লিখত, গল্প লিখত। নানকুর আসল নাম সুবিমল, তাঁর লেখা উদ্ভট কল্পনার কাহিনীর জুড়ি হয় না। তিন ভাইয়ের মধ্যে কেউই আজ আর জীবিত নেই।

এ ছাড়াও উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ি বারোমাস আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, দুঃস্থ ও নিরাশ্রয় অতিথি অভ্যাগত নিয়ে গমগম করত। তারা থাকা খাওয়ায় ভাগ বসাত, ভিড় বাড়াত। এই পরিবেশে ছেলেমেয়েগুলোর লোভী ও স্বার্থপর হবার উপায়ই ছিল না।

এই প্রসঙ্গে বহু বছর পরের একটি ঘটনা মনে পড়ছে, যার মধ্যে দিয়ে সুকুমারের ভিতরকার মানুষটাকে একটু চেনা যায়। তখন উপেন্দ্রকিশোর ইহলোকে নেই, সুকুমারের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। রোজ সকালে বুড়ো মাস্টার মশাই ওঁদের বাড়িতে এসে চা টোস্ট খেয়ে যান। বুড়ো হয়েছেন, সব দিকে আর খেয়াল থাকে না। চায়ের টেবিল অপরিষ্কার করেন, মুখ থেকে খাবার ফেলেন, সিক্‌নি মোছেন ; অন্য সকলে তাতে খুবই বিরক্ত হন। শেষ পর্যন্ত একদিন মাস্টার মশাইয়ের জন্য আলাদা একটা ছোট টেবিলের বন্দোবস্ত হল। একতলায় চা খেতে এসে, নতুন ব্যবস্থা দেখে, সুকুমার এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে, তখুনি ঘুরে আবার দোতলায় নিজের ঘরে চলে গেলেন।

মেয়েরা ব্যস্ত হয়ে তার কাছে গিয়ে বুঝিয়ে বলতেই, বললেন, 'বেশ, তাহলে কাল থেকে ঐ ছোট টেবিলেই আমাকেও চা দিও।' বলা বাহুল্য ছোট টেবিল তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

এঁদের আত্মীয়স্বজনও নিতান্ত কম ছিলেন না, আলাদা বাড়িতে বাস করলেও, উপেন্দ্রকিশোরের আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের গুণে সবাই তাঁকে ঘিরে থাকতেন। ঐ তেরো নম্বরের তিনতলায় সুকুমারদের দাদামশাই দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী থাকতেন। তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কাদম্বিনী একজন অসাধারণ মহিলা ছিলেন। ভারতের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট, তার উপর প্রথম পাস করা মহিলা ডাক্তার। স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত গিয়ে ডিগ্রী এনেছিলেন; সেকালের লোকে মেয়েদের এমন কৃতিত্বের কথা ভাবতেও পারত না। যদিও পাস করেছিলেন, তবু তাঁকে এখানে ডিগ্রী দেওয়া হয় নি মহিলা বলে।

কাদম্বিনী ছিলেন সুন্দরী ও সুগৃহিণী এবং বয়সে প্রায় সুকুমারের মায়ের সমান সমান বলে, সুকুমারদের মামা-মাসিরা তাদের খেলার সাথী ছিল। এই উচ্চশিক্ষিত ও আধুনিক পরিবারটির প্রভাবে, সকলের মনেই একটা কুসংস্কার-মুক্ত স্বাধীনতার হাওয়া বইত। মেয়েরা স্কুলে ও পরে কলেজে পড়ত, অনেকখানি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করত।

উপেন্দ্রকিশোরের চারটি ভাই-ই গুণী ছিলেন। পারিবারিক দোষ-গুণগুলি বংশে বংশে কি আশ্চর্যভাবে বর্তায়, এই পরিবারটিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। সবার বড় সারদারঞ্জন বহুদিন মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁকে লোকে বাংলা ক্রিকেটের জনক বলত; একাধারে তিনি গণিত ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন; তাঁর লেখা পাঠ্যপুস্তক আজো আদর পায়। তাঁর খেলার সরঞ্জামের দোকান ও বইয়ের দোকান বিখ্যাত ছিল।

সারদারঞ্জন বিশ্বাস করতেন যে শুধু পড়ার ক্লাসে মানুষ তৈরি হয় না। মানুষ তৈরির কাজ খেলার মাঠেও চলে, নইলে অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। খেলার মাঠে তাঁর দাড়ি-বিশিষ্ট লম্বা-চওড়া চেহারাখানি প্রায় একটা অনুষ্ঠানের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর বজ্রকণ্ঠের হাঁক কম ছাত্রের অপরিচিত ছিল। তখনকার টাউন ক্লাব পত্তন ও তিন পুরুষ ছাত্রদের শরীর মন একসঙ্গে গঠিত করার কৃতিত্ব বড় কম নয়। গুরুগম্ভীর মাস্টারমশাই যে কত উৎসাহী খেলোয়াড় তাই দেখে সবাই আশ্চর্য হত।

বাকি তিন ভাইও খেলায় দক্ষ ছিলেন। গণিতের অধ্যাপক

মুক্তিদারঞ্জন ও পরে তাঁরি তিন ছেলে শৈলজা, হৈমজা ও সম্প্রতি পরলোক-গত নীরজা, সবাই সারদারঞ্জনের হাতে গড়া। চতুর্থ ভাই কুলদারঞ্জন যেমন ভালো ক্রিকেট খেলতেন, তেমনি ভালো ছোটদের বই লিখতেন। কনিষ্ঠ প্রমদারঞ্জনও নামকরা খেলোয়াড় ছিলেন এবং জরিপবিভাগে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী 'বনের খবর' লিখে স্মরণীয় হয়ে আছেন। বলা বাহুল্য খেলার আলোচনায় ওঁদের বাড়ি মুখরিত ছিল। দল বেঁধে খেলা দেখা হত। মাছ ধরাতেও ভারি উৎসাহ ছিল।

উপেন্দ্রকিশোরের ছোট ভগ্নীপতি হেমেন্দ্রমোহন বসু শুধু যে ব্যবসার ক্ষেত্রে কুন্তলীন তেল ও দেলখোসের প্রস্তুতকারক বলে বিখ্যাত ছিলেন তা নয়, গান-বাজনায় তাঁর ভারি উৎসাহ। তখনকার দিনে গ্রামোফোন বা রেকর্ড তৈরি সম্বন্ধে এদেশে কেউ-কিছু জানতেন না, কিন্তু হেমেন্দ্রমোহন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' গানের রেকর্ড করেছিলেন। দুঃখের বিষয় ঐ সিলিণ্ড্রিকেল রেকর্ড বাজাবার যন্ত্র এখন সহজে পাওয়া যায় না।

এই রকম উদার পরিবেশে মানুষ হতে পেরেছিলেন, সুকুমারের সেটি পরম সৌভাগ্য। আর শুধু সুকুমার কেন, ও-বাড়ির সংস্পর্শে যারাই এসেছিল তাদের কপাল ভালো। তবে সুকুমার যে অন্যান্য আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের মতো নয় সে কথা তার শৈশবেই বোঝা যেত। ওদের বাবার একটা জন্তু-জানোয়ারের সচিত্র বই ছিল, সুকুমার সেই ছবি দেখিয়ে ভাই-বোনদের আশ্চর্য সব গল্প বলত। তাছাড়া অনেক মনগড়া গল্পও বলত। তার কথায় কথায় লোকজনে ঠাসা ঐ বিশাল বাড়িটা রহস্যে ভরপুর একটা আশ্চর্য জায়গায় পরিণত হত। ভবন্দোলা বলে একটা জানোয়ারের কথা বলত, খুব মোটা, হেলেদুলে থপথপ করে হাঁটে। মস্ত পাইনের নাকি খুব সরু লম্বা গলা, সেটাকে পেঁচিয়ে গিঁটে পাকিয়ে রাখে। অন্ধকার বারান্দার কোণে দেয়ালের পেরেকে গোল মুখ ভ্যাবা চোখ কোম্পুকে নাকি ঝুলে থাকতে দেখা যায়। এর মধ্যে পরবর্তী কালের অনেক রচনার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। এর আরেকটি অব্যবহিত ফল হয়েছিল রাত্রে ছেলেমেয়েরা কেউ একা উঠতে রাজী হত না। কি জানি কোম্পু যদি থাকে।

ছোটদের জন্য লেখা কোনো মজার কবিতা পেলেই সুকুমার তাকে মুখস্থ করে ছোটদের শেখাত। এমনি মুখস্থ বলা নয়, ভাব দিয়ে অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে আবৃত্তি। ভালো অভিনেতা ছিল সে। অদ্ভুত মুখভঙ্গীও

করত, হাসিমুখ কান্নামুখ রাগমুখ ভয়মুখ ন্যাকামখ বোকামুখ। যা বই পেত, তখনি পড়ে ফেলত, প্রথমে 'সখা' আর 'সাথী' তারপর দুই মিলে 'সখাসাথী', তারপর 'মুকুল'। এই মুকুলেই আট নয় বছর বয়সে সুকুমারের নিজের প্রথম কবিতা বেরিয়েছিল। একটির নাম 'নদী' আর একটির নাম 'টিকটিকটক'।

বাড়িতে সমস্তক্ষণ ছোটদের বই সম্বন্ধে বাপ কাকা ও তাদের বন্ধুদের মধ্যে আলোচনা, শুধু ছোটদের জন্য গান গল্প কবিতা প্রবন্ধ রচনা করার বিষয়ে অলোচনা নয়; সে তো হল কাজের প্রথম অর্ধেকটুকু। লেখা হয়ে গেলে তাকে ছাপাতে হয়; ছবি এঁকে বা সংগ্রহ করে তার ব্লক তৈরি করতে হয়; তারপর ছাপতে হয়, রঙ দিয়ে ছাপতে পারলে তো কথাই নেই। ওঁদের সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের খুব ঘনিষ্ঠতা; যোগীনবাবু সিটিস্কুলে মাস্টারি করেন; ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের গণ্ডী পার হয়েই সুকুমারও সেইখানে পড়ত। উপেন্দ্রকিশোরের আগেই যোগীনবাবুর ছোটদের জন্য বই বেরিয়েছিল। ছোটদের বই ছাপানোর অনেক সমস্যা; ছবি দিতেই হবে কিন্তু দাম বেশি করলে কেউ কিনবে না, আবার দাম খুব কমালে ব্লক করার খরচ উঠবে না; প্রকাশকরা ছাপবেন কেন? শেষ অবধি যোগীনবাবু নিজের প্রকাশনী ও ছাপাখানা করলেন, তার নাম সিটি বুক সোসাইটি। সেখান থেকেই উপেন্দ্রকিশোরের 'ছোটদের রামায়ণ' আর 'ছেলেদের মহাভারত' বেরুল।

ছবিছাপা নিয়ে উপেন্দ্রকিশোর নিজেও অনেক পড়াশুনো করেছিলেন, বিলাত থেকে বই ও যন্ত্রপাতি এনে অনেক পরীক্ষাও করেছিলেন।

জ্ঞানচক্ষু ফুটে অবধি সুকুমার এইসব দেখে আসছে; লেখা, পড়া, ছবি আঁকা, ছবি ছাপা, বই আকারে লেখা প্রকাশিত করা, এরি মাঝে সে যে নিজের জীবনের কর্মক্ষেত্র বেছে নেবে তাতে আর বিচিত্র কি?

নিটোল সুন্দর শৈশব। বাবার সঙ্গে কলকাতা এবং আশেপাশের দ্রষ্টব্য জিনিস দেখা; যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, ছবির প্রদর্শনী, স্বদেশী মেলা, কোনো কিছু বাদ নেই। যেখানেই যাওয়া হয়, বাবা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সব বুঝিয়ে দেন। অন্য দর্শকরাও সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। আকাশের রহস্য বোঝান বাবা, মস্ত টেলিস্কোপ দিয়ে চাঁদের পাহাড় দেখান, সৃষ্টিরহস্যের কথা বলেন। ভবিষ্যতে যে কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করবে, তার জ্ঞানের বনেদ পাকা হওয়া চাই। যুক্তির ব্যবহার যে জানে,

কার্য-কারণের সম্বন্ধ বোঝে, কেবল মাত্র সে-ই আজগুবি রচনা করে মানুষকে মুগ্ধ করতে পারে।

চার

ছুটিতে মাঝে মাঝে দেশে যাওয়া হত ; দেশ মানেই তো পূর্ব বাংলার মৈমনসিংহ জেলা ; গান-গল্পের দেশ, 'মহুয়া' চন্দ্রাবতী-র পালা গেয়ে সেখানে গাইয়েরা গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরত ; কিছুদিন আগেও সেখানে পাড়ার মাঝখানে বাঘ দেখা যেত, সেই বাঘের গল্প শুনে ছেলেমেয়েরা কাঁথামুড়ি দিয়ে রাতে ঘুমত ; রস-রোমাঞ্চের এমন জায়গা আর কোথায় আছে ?

দেশে যাওয়ার পর্বটিও ছিল রোমাঞ্চকর ; প্রথমে রেলগাড়ি, তারপর নৌকো, তারপর হাতি চেপে। নিজেদের দুটি হাতি ছিল ; একটার নাম যাত্রা-মঙ্গল, তার মেজাজ হঠাৎ হঠাৎ বিগড়ে যেত ; অন্যটা শান্ত-শিষ্ট, তার নাম-কুসুমকলি ; তাদের খাওয়ার বহর দেখে সুকুমাররা স্তম্ভিত ! কলকাতার পর এ একটি অন্য রাজ্য ; চারদিকে ছায়ায় ঘেরা ফুলফলের বাগান, বাঁশঝাড় ; বড় বড় পুকুর। মানুষগুলো সাদাসিধে, সাজগোজের বালাই নেই, কিন্তু এক পয়সায় কত মাটির হাঁড়িকুড়ি জন্তুজানোয়ার নাকে ফুটো পুতুল ; কত চিনির তৈরি হাতি ঘোড়া রথ ; কত তিলের নাড়ু ক্ষীরের ছাঁচ। বেতগাছ থেকে বেতগোটা পেড়ে তেল নুন লঙ্কা দিয়ে ঝাঁকিয়ে কত খাওয়া ! ঘর-বাড়িও অন্যরকম ; মাঝখানে একটা দোতলা পাকাবাড়ি ও পুজোর দালান, তার চারপাশে মাটির ঘর, উঠোন পেরিয়ে একটা থেকে আর একটাতে যেতে হয়।

দেশে আবার নানারকম ভয়, গোসাপ, হুতুমপ্যাঁচা। একদিন পুকুর-পাড়ে রঙ-মাখা ছুরি হাতে একটা লোকের সঙ্গে দেখা ; তাকে দেখে বোনেরা ভয়ে জুজু, সুকুমার তাদের পিছনে ঠেলে দিয়ে হিংস্র লোকটার পথ আগলে দাঁড়াল। সে হাত জোড় করে বলল তার কাজই হল বাবুদের বাড়ির পাঁঠা কাটা।

এখানে ওখানে চেঞ্জে যাওয়া হত, গিরিডি, মধুপুর, পচম্বা, চুণার, পুরী, দার্জিলিং। যেখানেই যাওয়া হয় বাবা তার ছবি এঁকে আনেন। আস্তে

আস্তে সুকুমারের চোখও চারিদিক নজর করে দেখতে শিখল, ছবি আঁকার শখ তৈরি হল।

কাকারাও অনেক সময় সঙ্গে যেতেন, তাঁদের বয়স কম, বেড়ানোটা জমতো ভালো। ছেলেমেয়েরা জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে আর বাড়ি ফিরতে চায় না, ছোটকাকার কথা শোনে না, তাই তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একটু পরেই যখন সন্ধ্যা নামল, ছেলেমেয়েরা কাকাকেও পায় না, বাড়ি ফেরার পথও পায় না, হতাশ হয়ে প্রায় বসেই পড়ছিল এমন সময় গাছের আড়াল থেকে ছোটকাকার 'কু-উ'।

আরেকবার মধুপুরে ডিমওয়ালার কাছে কেনা অন্য ডিমের সঙ্গে একটা অদ্ভুত ডিম পাওয়া গেল, প্রকাণ্ড বড়, সরু লম্বা। বড়রা বললেন ফেলে দে, সাপের না কুমীরের না কিসের ডিম কে জানে? কিন্তু ধনকাকা সেটাকে পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে ভেজে খেয়ে বললেন, 'যারই ডিম হোক, খেতে খাসা।' এঁরাই সুকুমারের নিত্যসঙ্গী।

উপেন্দ্রকিশোরের মনের ইচ্ছা ক্রমে বাস্তবে পরিণত হতে চলল, নিজে ব্লক করে ছবি ছাপবেন। বিলেত থেকে মস্ত মস্ত প্যাকিং বাক্স করে যে সব যন্ত্রপাতি, বই ও সরঞ্জাম এল, তেরো নম্বরে তার জায়গা কুলোল না। ওঁরা এতদিনের আস্তানা ছেড়ে শিবনারায়ণ দাস লেনে নতুন বাড়িতে উঠে গেলেন, স্টুডিও হল, ছোট একটা প্রেস্ বসল, হাফটোন ব্লকের ছবি ছাপা শুরু হল। আর সেই সঙ্গে ব্লক নিয়ে অনলস গবেষণা। তাছাড়া হল ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো করার জন্য আলাদা ঘর; তেরো নম্বরের স্কুলের কুমুদিনী মাসিমার বদলে এলেন নতুন মাস্টার মশাই।

সুকুমারও ততদিনে আরো বড় হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, স্কুলে পড়াশুনায় ভালো ছেলে বলে নাম হয়েছে, বন্ধুবান্ধবের তার অন্ত নেই। যেখানেই যায় আমোদের একটা ঢেউ তুলে চলে। বাড়ির মাস্টার মশাই কড়া মানুষ চোখ পাকিয়ে বললেন, 'খবরদার মাটিতে কোনো জিনিস ফেলে রাখবে না, সব তুলে ডেস্কে ভরবে।' মাস্টার মশাই চলে গেলেই টপ করে মাটিতে বসা ছোট বোন টুনিকে তুলে সুকুমার ডেস্কে ভরে ফেলল; টুনির সে কি চীৎকার। কত রকম নতুন খেলা তাতার মাথা থেকে বেরুত। একটা খেলা হল 'রাগ বানানো', হয়তো কারো উপর রাগ হয়েছে, কিন্তু সে বিষয়ে কিছু করা যাচ্ছে না, কিংবা হয়তো সত্যি রাগ হয় নি, তবে হলেও হতে পারত, এমন ক্ষেত্রে রাগ বানাতে হয়। অর্থাৎ ভেবে নিতে হয় সে লোকটা

কেমন কেমন অবস্থায় পড়লে সেও বেদম জব্দ হয় আর যারা খেলছে, তাদেরো ভারি মজা লাগে। এই খেলার সব চেয়ে মজা হল যে খেলতে খেলতে কাল্পনিক ভাবে সে লোকটাও খুব জব্দ হয়, আবার তার উপর থেকে সমস্ত সত্যিকার রাগ একেবারে চলে যায়।

বোঝাই যাচ্ছে বাড়ির ছেলেমেয়েরা দেখতে দেখতে তাতার কেমন ভক্ত হয়ে উঠেছিল। একবার কে যেন মেয়েদের তিনটি চারাগাছ দিয়েছিল; তারা সেগুলিকে মাটির টবে পুঁতে রোজ নিজের হাতে জল দিয়ে, খুব যত্ন করে বড় করতে লাগল। তারপর একদিন সুরমামাসির আর সুখলতার আর খুসির গাছে কুঁড়ি ধরল, কি আনন্দ সকলের! কিন্তু কুঁড়ি যখন ফুটল, তখন দেখা গেল সুরমামাসির আর সুখলতার গাছে কি সুন্দর নীলফুল, খুসির গাছের ফুল একেবারে সাদা। খুসির চোখে জল এল, সবাই মিলে সান্ত্বনা দিল, কেন সাদা ফুল মন্দ কি? পরদিন সকালে খুসি উঠে দেখে তার গাছেও কত রঙের কি চমৎকার সব ফুল ফুটে রয়েছে, তখন আর তাকে পায় কে! অনেক পরে গাছের গোড়ায় রঙের ফোঁটা দেখে বোঝা গেল, তাতাই রাতারাতি ফুলের উপর রঙ দিয়েছে! সকলের এত মজা লাগল যে খুসির দুঃখ একেবারে দূর হয়ে গেল।

বাড়িতে বড়রা অনেকে আসতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক শিবনাথ শাস্ত্রী। নবদ্বীপচন্দ্র দাশ বলে আরেকজন আসতেন, পারিবারিক উপাসনায় তিনি আচার্য হতেন। আরো অনেকে আসতেন, জগদীশ বসু, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইত্যাদি। সকলের সঙ্গেই ছেলেমেয়েদের পরিচয় হল। মাঝে মাঝে বেশ রগড়ও হত; তাতার মুখে সদাই চটপট কথা; একবার এক হাঁড়ি সন্দেশ দেখিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী, বললেন—এই এত সন্দেশ কে একলা খেতে পারে? কারো মুখে কথা নেই, কিন্তু তাতা টপ করে বলল—'আমি পারি।' তারপর ফিসফিস করে বলল, 'কিন্তু অনেকদিন ধরে।' শুনে শাস্ত্রী মশাই খুব হাসলেন, 'ইতি গজ' নাকি? নবদ্বীপ বাবুকে বড়রা মামা বলতেন, কাজেই ছেলে-মেয়েদের তিনি দাদামশাই, ঠাট্টার সম্বন্ধ। মোটা মানুষ, বন্ধুরা তাঁকে 'জালা' বলে ডাকেন। তাঁর জন্য খাবার জায়গা হয়েছে, পিঁড়ি পাতা হয়েছে, তাতা ছুটে গিয়ে তার উপরে একটা বিঁড়ে বসিয়ে দিল। বিঁড়ে ছাড়া জালা সোজা থাকবে কি করে?

সুকুমারের একটা গাম্ভীর্যের দিকও বরাবরাই ছিল, যতই বড় হতে

লাগল, ওর চরিত্রের মধ্যে একটা বলিষ্ঠতাও প্রকাশ পেতে লাগল। জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ সে সইতে পারত না। একবার একজন গুরুজনকে ছোট শিশিতে বড় মাগুর মাছ পেঁচিয়ে ঢোকাতে দেখে সুকুমার প্রবল আপত্তি করে এবং তাই নিয়ে বাড়িতে খানিকটা অশান্তিও হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত গুরুজনটি সুকুমারের কথাই শুনেছিলেন।

বাইরের প্রভাব গ্রহণ করবার জন্য নিজের চিত্তকে সে সর্বদা উন্মুক্ত রাখত। তখন নতুন চলচ্চিত্র হয়েছে, অবিশ্যি নির্বাক ছবি, তারো অনেক বিরোধী। সুকুমারদের একজন শিক্ষক বায়োস্কোপের নিন্দা করাতে, সে আপত্তি জানিয়ে বলেছিল যে সব ছবি তো মন্দ হয় না, ভালো ছবিও হয়। এক রকম জোর করেই তাঁকে 'লে মিজেরাবল' দেখিয়ে ছাত্র শিক্ষক মহাশয়ের মত বদলিয়ে দিয়েছিল।

মনের জোর ক্রমে আরো প্রকট হল। কোনো সাম্প্রদায়িক কাগজে শিক্ষিত মেয়েদের সম্বন্ধে অপমানকর উল্লেখ প্রকাশিত হওয়ায়, সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করে পরের সংখ্যায় মন্তব্যটি প্রত্যাহার করতে সুকুমার তাঁকে বাধ্য করেছিল। তার দাদামশাই দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনেও অনেক দিন আগে প্রায় অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। তবে দ্বারিকবাবুর তখন বয়স বেশি ছিল, গায়ের জোরও বেশি ছিল, তিনি কাগজের টুকরোটিকে গুলি পাকিয়ে সম্পাদক মহাশয়কে সেটি জল দিয়ে গিলিয়ে ছিলেন, যাকে বলে 'made him eat his words'। এসব ছোট ঘটনা থেকে অনেক সময় স্পষ্ট বোঝা যায় পারিবারিক প্রভাব মানুষের চরিত্রগঠনে কতখানি কাজ করে।

সুকুমার মুখে মুখে মজার মজার ছড়া বানিয়ে ফেলত, তার খাতাপত্রের পাতায় পাতায় মজার মজার ছবি আঁকা থাকত, বইয়ের ছাপা ছবিতে যত্ন করে রঙ দেওয়া হত। ফটোগ্রাফির শখ তো অনেক দিন থেকেই ছিল; ক্রমে তাকে পাড়ার বে-সরকারি ফটোগ্রাফার বলা চলত।

ততদিনে শিবনারায়ণ দাশ লেনের ছোট বাড়ি ছেড়ে, উপেন্দ্রকিশোর ২২নং সুকিয়া স্ট্রীটে উঠে এসেছেন। ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স কোম্পানির পত্তন হয়েছে। একতলায় প্রেস বসেছে, দোতলায় তিনতলায় থাকা হয়। পরিবারের লোকসংখ্যাও বেড়েছে। ধনকাকা কুলদারঞ্জনের স্ত্রী বিয়োগের পর তিনটি মাতৃহীন ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনিও এই স্নেহের নীড়ে আশ্রয় নিয়েছেন এবং যতদিন ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স এঁদের হাতে ছিল, তার জন্য

হাসিমুখে অনলস ভাবে তিনিও পরিশ্রম করেছিলেন। এই ২২ নম্বরের বাড়িটি পাড়ার ছেলেদের একটা মহা কৌতূহলের ও আকর্ষণের জায়গা ছিল, এখান থেকে চমৎকার রঙীন ছবি সংগ্রহ করা যেত। বাড়ির ছেলেমেয়েদের কথা তো ছেড়েই দেওয়া গেল।

পাঁচ

১৮৯৮ সালে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরলোক গমন করেছিলেন; তাঁকে সাক্ষাৎ কাছে না পেলেও তাঁর কথা পারিবারিক কিংবদন্তী হয়ে ছিল। কাদম্বিনীর প্রভাবও দেখা যেত। কিন্তু ক্রমে উপেন্দ্রকিশোরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা বলিষ্ঠ স্বকীয়তা দেখা যেতে লাগল। এই বয়স থেকেই সুকুমারকে অনেক লোকে চিনত; বিলিতী কাগজ আসত বাড়িতে, 'বয়জ ওন পেপার' ইত্যাদি, তাতে ছবির প্রতিযোগিতা থাকত, ফটো তোলা, হাতে আঁকা সব রকম ছবি। সুকুমার তাতে যোগদান করে অনেকবার পুরস্কার পেয়েছিল।

সিটি স্কুল থেকে এনট্রান্স পাস করে সুকুমার প্রেসিডেন্সি কলেজে কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে বি-এস্ সি পড়তে লাগল। উপেন্দ্রকিশোর ততদিনে সাফল্যের শিখরে উঠেছেন, ছোটদের জন্য অনেকগুলি বই রচনা করে, নিজে সুন্দর ছবি এঁকে, নিজের উদ্ভাবিত নতুন প্রণালীতে নিখুঁতভাবে ছেপে দেশের ছেলে-বুড়োকে মুগ্ধ করেছেন। তাঁর এই নতুন প্রণালীটি ছিল ইউরোপে প্রচলিত হাফটোন ব্লক প্রিন্টিং-এর উন্নত সংস্করণ। বিলেতের পেন্‌রোজ অ্যানুয়েলে তার যথেষ্ট প্রশংসা বেরিয়েছিল এবং সব চেয়ে আশার কথা ১৯১১ সালে বিলেতে গিয়ে সুকুমার তার বাবার উদ্ভাবিত প্রণালীর প্রচলন দেখে কত খুশি হয়েছিল।

এর মধ্যে অনেকগুলি বইও লিখেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর, তার মধ্যে কবিতায় ছোট্ট রামায়ণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া মহাভারতের গল্প, টুনটুনির বই ইত্যাদি তুলনা হয় না। নাটক লেখারো শখ ছিল; 'মুকুল'-এ কেনারাম ও বেচারাম বলে তাঁর একটা হাসির নাটক প্রকাশিত হল। বাড়িতে কার জন্মদিনে ছেলেমেয়েরা সবাই মিলে সেটিকে অভিনয় করল।

তাদের উৎসাহ দেখে কে, পুরোনো কাপড় কেটে ড্রেস হচ্ছে সীন হচ্ছে ; মা আবার তাই দেখে দাড়ি গোঁফ পরচুলা কেনার পয়সা দিলেন। চমৎকার নাটক হল।

বাড়িতে নিজেদের কেনা দাড়ি গোঁফ নিয়ে সবাই মহাখুশি। তার মধ্যে একটা দাড়ি ছিল খুব লম্বা, সেইটে পরে সুকুমার বেঁটে বামুন সেজে সবাইকে হাসাত। একদিন সেইটে পরে গণকঠাকুর সেজে এক বন্ধুর সঙ্গে তাদের বাড়ি গিয়ে সুকুমার উপস্থিত হল। তাকে দেখবামাত্র বন্ধুর মা ঢিপ করে এক প্রণাম! সুকুমার পালাবার পথ পায় না!

একটা যেন নতুন পথ খুলে গেল ; ভালো নাটক পেলেই তার অভিনয় করতে হবে। বাড়ির লোকরা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই যোগ দেয়। সুকুমারই শেখায়, নিজেও অভিনয় করে, বোকা হাঁদার পার্ট সে সব চেয়ে পছন্দ করে। তারপর শুরু হল নাটক লেখা। প্রথম হাসির নাটক হল "রামধন বধ" অর্থাৎ অহঙ্কারী র‍্যামস্‌ডেন সাহেব কি করে জব্দ হল। সে এক ভারি মজার ব্যাপার। এখন থেকে সুকুমারের নিজস্ব ধারায় একের পর এক নাটক বেরুতে লাগল ; ঝালা-পালা, লক্ষ্মণের শক্তিশেল ইত্যাদি।

উৎসাহীর দল সর্বদা তাকে ঘিরে থাকত, বাইরের লোক, যারা শুধু কৌতূহল মেটাতে এসেছে এমন কেউ এর মধ্যে ছিল না ; আস্তে আস্তে আপনা থেকেই একটা ছোট দল গড়ে উঠল। ক্লাবের নাম হল ননসেন্স ক্লাব ; ক্লাব হলে তার একটা মুখপত্রও চাই। মুখপত্রের নাম হল সাড়ে বত্রিশ-ভাজা। সেকালের একটা জনপ্রিয় খাদ্যর নামে নাম, সেই খাদ্যে বত্রিশ রকম উপকরণ লাগত আর সবার উপরে থাকত আধখানা শুকনো লঙ্কা ভাজা। হাতে লেখা কাগজ, তাতে অনেক মজার কথা, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ছবি, বেশির ভাগই সুকুমারের নিজের হাতে লেখা বা আঁকা। মাঝে মাঝে গম্ভীর বিষয়েরো অবতারণা হত। 'পঞ্চ-তিক্ত পাঁচন' নামক সম্পাদকীয় মন্তব্যটুকু বড়রাও মন দিয়ে পড়তেন।

বহুকাল পরে সুকুমারের মেজো বোন পুণ্যলতা চক্রবর্তী, অর্থাৎ খুসি, তাঁর অননুকরণীয় 'ছেলেবেলার দিনগুলি'-তে লিখছেন, 'ননসেন্স ক্লাবের অভিনয় এমন চমৎকার হত, যারা নিজের চোখে দেখেছে তারাই জানে। মুখে বর্ণনা করে তার বিশেষত্ব ঠিক বোঝান যায় না। বাঁধা স্টেজ নেই, সীন নেই, সাজসজ্জা ও মেক্‌আপ বিশেষ কিছুই নেই, শুধু কথায় সুরে ভাবে ভঙ্গীতে তাদের অভিনয়ের বাহাদুরি ফুটত। দাদা নাটক লিখত,

অভিনয় শেখাত আর প্রধান পার্টটা সাধারণত সে নিজেই নিত। প্রধান মানে সব চেয়ে বোকা আনাড়ির পার্ট। হাঁদারামের অভিনয় করতে দাদার জুড়ি কেউ ছিল না। অন্য অভিনেতাদের মধ্যেও অনেকেরি হাসাবার ক্ষমতা খুব ছিল। অভিনয় করতে ওরা নিজেরা যেমন আমোদ পেত, তেমনি সবাইকে আমোদে মাতিয়ে তুলত।······ছোটবড় সকলেই সমানে সে আনন্দ উপভোগ করত। ননসেন্স ক্লাবের অভিনয় দেখার জন্য সকলে উৎসুক হয়ে থাকত।'

আস্তে আস্তে সুকুমারের অদ্বিতীয় চরিত্র দানা বাঁধছিল। নানান দিক থেকে কলেজের ছাত্র সুকুমারের চিত্রটিকে ফুটে উঠতে দেখা যেত। কৈশোরের বন্ধু বিমলাংশুপ্রকাশ রায় ১৯৬৬ সালে তত্ত্ব-কৌমুদীতে লিখছেন, 'সুকুমারের শুধু একটা দিকই এখানে দেখাতে চেষ্টা করেছি; তাঁর গুণে আকৃষ্ট হয়ে যে দলটি তাঁর পাশে গড়ে উঠেছিল তারি অভিজ্ঞতার একটু অভিব্যক্তি এটুকু। "এসো আমরা একটা দল পাকাই।" বলে সুকুমার কোনোদিন তাঁর দল গড়ে তোলেন নি। তাঁর দল গড়ে উঠেছিল অতি সহজ স্বাভাবিক ভাবে, যেমন করে জলাশয়ের মধ্যকার একটা খুঁটিকে আশ্রয় করে ভাসমান পানার দল গিয়ে জমাট বাঁধে।······তাঁর বন্ধুপ্রীতি ছিল অপূর্ব। তার স্নিগ্ধ শান্ত উদার চোখ দুটির মধ্যে একটা সম্মোহিনী শক্তি ছিল।···এ ছিল প্রেম-প্রীতির আকর্ষণ।'

দলের আসর ছিল পথে পথে, এর বাড়িতে ওর বাড়িতে। সত্যি কথা বলতে কি কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের পাশের গলিটি ছিল আড্ডা দেবার পক্ষে পরম উপযুক্ত স্থান। সেখানে কারো রকে হয়তো দলের আলোচনা চক্র বসল; যারা জায়গা পেল না, তারা দাঁড়িয়ে রইল। সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, শিল্প, সব বিষয়ে তর্কাতর্কি হত; মাঝে মাঝে উত্তেজনার চোটে চ্যাঁচামেচিও হত। প্রবীণ গৃহবাসীরা বিরক্ত হতেন। তাঁদের মধ্যে একজন হয়তো বললেন, 'ওদের কাঁধে চেপেই যখন যেতে হবে, করুক গে চ্যাঁচামেচি।' কিন্তু শোনা যায় শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পিতৃদেব নাকি শেষ পর্যন্ত তাঁদের বাড়ির সামনের রকটুকুকে মিস্ত্রী ডাকিয়ে কাটিয়ে ফেলেছিলেন।

দলের ছেলেদের অধিকাংশই উৎসাহী উৎসুক উদারচেতা ও সমাজ-সেবায় সুদক্ষ। তাদের মধ্যে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্রেরা, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ও গুরুচরণ মহলানবিশদের বাড়ির ছেলেরা

আরো অনেকে ছিলেন। যতই সুকুমার বড় হতে লাগল তার চরিত্রের দৃঢ়তা আরো প্রকট হয়ে উঠল; বন্ধুবর্গের স্বাভাবিক নেতা ছিল সে। হাসিখুশির অন্তরালে একটা স্থির বুদ্ধি কাজ করত। ব্রাহ্মসমাজের এই ছেলেগুলিকে ঠিকভাবে চালাতে পারলে দেশের অনেক কাজ হতে পারে এই বিশ্বাস নিয়ে ব্রাহ্ম যুবসমিতির পত্তন হল। সপ্তাহে একদিন সকলে মিলে আলোচনা, মাসে একবার এখানে ওখানে চড়িভাতি, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বালিগঞ্জের বিশাল বাগানবাড়িতে কিম্বা বালিতে মথুর গাঙ্গুলীর ছেলে সুধাংশু গাঙ্গুলীর বাড়িতে। গঙ্গাস্নান, মধ্যাহ্নভোজন, গানবাজনা, আলোচনা।

১৯১০ সালে সমিতির মাসিক পত্রিকা 'আলোক' প্রকাশিত হল; ব্রাহ্ম মিশন প্রেস থেকে ছাপা তার প্রথম সংখ্যাটি নিলাম হল; দশ টাকা দিয়ে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক ছেলে সেটি কিনে নিল। ভারি সুনাম হল পত্রিকার, সুকুমারের অনেক রচনা এতে প্রকাশিত হয়েছিল।

ছয়

কৈশোরের গণ্ডী পেরিয়ে সুকুমার এখন বড়দের দলে ঢুকেছেন, যদিও বাড়িতে আগের মতোই অঙ্গভঙ্গী করে ভেংচি কেটে ভাইবোন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের হাসাতে ছাড়েন নি। কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে বি, এস্-সি পাস করলেন সুকুমার; তারপর গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি লাভ করে বিলেত যাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। সেখানে ফটোগ্রাফি ও প্রিন্টিং টেকনলজিতে উচ্চতর শিক্ষালাভের আশা! সালটা ১৯১১; এই সময় আরেকজন বন্ধু জুটে গেল, তার নাম কালিদাস নাগ। পঁয়ত্রিশ বছর পরে কালিদাস নাগ লিখছেন—

'রবীন্দ্রনাথের যখন ৫০ বছর বয়স তখন একবার আমরা থার্ড ক্লাসের টিকিট করে শান্তিনিকেতন যাই। পথে পরিচয় হয় সুকুমার রায়ের সঙ্গে। তিনি বিলেত যাবেন। তখনি দেখেছি সত্যকে ভেতর থেকে টেনে বের করে তার যে-রূপ দেখলে হাসি পায়, সেই রূপ ফুটিয়ে তোলবার জন্মগত অধিকার ছিল তাঁর। তাঁর প্রকাশক্ষমতা ছিল অসাধারণ।…রবীন্দ্রনাথের

আশ্রমে তখন পয়সার টানাটানি। শালপাতায় নুন রেখে কাঁকরভরা চাল ডাল খেতে হত। তখন সুকুমার রায়ের হাসির হররা শোনা গিয়েছিল! খাচ্ছেন আর মুখে মুখে গান রচনা করছেন···রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে, এই তো ভালো লেগেছিল আলুর নাচন হাতায় হাতায়···

সুকুমার রায় অভিনেতা এটা আমরা কেউ কল্পনাও করি নি। (ননসেন্স ক্লাবের খ্যাতি কালিদাস নাগের কানে তখনো পৌঁছয়নি নিশ্চয়!) একবার রবীন্দ্রনাথ জেদ ধরলেন গোড়ায় গলদ অভিনয় করতে হবে। অভিনয়ে গগনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ নেমেছিলেন। সেই সঙ্গে সকুমার রায়ের অপূর্ব অভিনয় দেখলাম। তাঁর মধ্যম ভ্রাতা সুবিনয়··· ও আর সকলে মিলে বেসুরের ভূমিকা করেছিলেন। যত বেসুর হয় তত ভালো লাগে। রবীন্দ্রনাথের মতো সুরজ্ঞের মধ্যে বেসুরের অভিনয় আশ্চর্য জিনিস।'

কালিদাস নাগের এই মন্তব্য পড়ে আরো মনে হয় যে আসলে এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই, রবীন্দ্রনাথের মতো সুরবানই বেসুরের রস দেখাতে পারেন; সকুমার রায়ের মতো যুক্তিবান বৈজ্ঞানিকই অসম্ভবের ছন্দ খুঁজে পান।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই একটু একটু করে দেশাত্মবোধ দানা বাঁধছিল। যুবকবৃন্দের কারো পক্ষেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তার প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তখনো আন্দোলন ব্যাপক রূপ নেয় নি, কিন্তু বঙ্গভঙ্গের পর থেকে সকলের মনে অনেকখানি তিক্ততার গ্লানি জমেছিল। দেশটা যেন হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠেছিল; সুকুমারও একটি দেশপ্রেমের গান রচনা করেছিলেন, 'টুটিল কি আজি ঘুমের ঘোর' ইত্যাদি।

অনেকে দিশী জিনিস ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন। এ বিষয়ে সুকুমারের মধ্যম ভ্রাতা সুবিনয় ভারি উৎসাহী ছিলেন; সারা কলকাতা চষে নানারকম দিশী জিনিস তিনি কিনে আনতেন, বাড়ি সুদ্ধ সকলে সেগুলি ব্যবহার করতেন। এ বিষয়ে সুকুমার একটা গান না বেঁধে পারলেন না। গানের নাম দিশী পাগলার দল।

'আমরা দিশী পাগলার দল,
দেশের জন্য ভেবে ভেবে হয়েছি পাগল' ইত্যাদি।

তারপর তখনকার দিশী জিনিসের চমৎকার বর্ণনা—

'দেখতে খারাপ, টিকবে কম, দামটা একটু বেশি ;
তা হোক না, তাতে দেশেরি মঙ্গল.' ইত্যাদি।

একথা প্রায়ই শোনা যায় যে শিক্ষার উদ্দেশ্যেই হক, কিংবা কাজের জন্যেই হক, যারা বিদেশে যায়, তারা একদিকে যেমন বিদেশের প্রভাব দেশে পৌঁছে দেয়, তেমনি অন্যদিকে প্রত্যেকেই যেন দূত সেজে দেশের কথা বিদেশে নিয়ে যায়। তাদের দেখে তাদের দেশকে বিদেশীরা বিচার করে। একথা এখন যতখানি সত্য, ছাপ্পান্ন বছর আগে আরো অনেক বেশি সত্য ছিল, কারণ তখন শুধু মুষ্টিমেয় বাছাই করা ছাত্র ও কর্মী বিদেশে যাবার সুযোগ পেতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই হেলায় ফেলায় সেখানে সময় না কাটিয়ে, নিজের পাঠ্য বিষয়ের বাইরেও যতটা সম্ভব দেখে শিখে আসতেন। সুকুমারও তাই করেছিলেন।

১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে S. S. ARABIA জাহাজে তিনি বিলেত যাত্রা করেছিলেন এবং জাহাজ ছাড়ার প্রথম মুহূর্ত থেকে শুরু করে, ১৯১৩ সালে আবার দেশে ফেরা পর্যন্ত নিজের চোখকানকে সর্বদা সজাগ রেখেছিলেন। সেখান থেকে বাপ মা ভাইবোনকে লেখা চিঠি পড়ে মনে হয় বিলেত যাওয়াটা তিনি যেমনি উপভোগ করে-ছিলেন, তেমনি উপকৃতও হয়েছিলেন। বাঙালী আবহাওয়াতে মানুষ, প্রথম প্রথম বিলিতী পোশাক পরতে, টাই বাঁধতে সময় নিত ; জাহাজের ডাইনিং হল্-এ খেতে যেতে ইচ্ছে করত না। দেখতে দেখতে সে সব ভয় কেটে গেল।

তাঁর দুটি উদ্দেশ্য ছিল ; ফটোগ্রাফি ও প্রিন্টিং-এর কাজ হাতে কলমে ভালো করে শিখে, দেশে ফিরে সে বিদ্যাকে ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্সের কাজে লাগাবেন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বাবার উদ্ভাবিত উন্নততর হাফটোনের কাজ ও-দেশের বিশেষজ্ঞদের সামনে হাতে-কলমে করে দেখাবেন। বলা বাহুল্য, উভয় আশাই সফল হয়েছিল।

পৌঁছেই লণ্ডনের স্কুল অফ ফটো এনগ্রেভিং অ্যান্ড লিথোগ্রাফিতে ভর্তি হয়ে কাজ শুরু করে দিলেন। পড়ার ক্লাসের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিল না ; কারখানা লেবরেটরির ও স্টুডিওর কাজই বেশি, তাছাড়া বড় বড় ফ্যাক্টরি ও প্রদর্শনী দেখা ; লিথোগ্রাফি ভালো করে শিখবার জন্য একজন দক্ষ শিক্ষকের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থা হল ; এঁর কথা সুকুমার সর্বদা কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করতেন।

পরের বছর ম্যাঞ্চেস্টারের স্কুল অফ টেকনলজিতে বিশেষ ছাত্র হিসাবে ভরতি হয়েছিলেন। বড় প্রতিষ্ঠান, সেখানে ২০-২৫ জন ভারতীয় ছাত্রও কাজ শিখত। বহুতলা বাড়ি, ইলেকট্রীক লিফ্‌ট্‌ চলে সেখানে, তখন এসব জিনিস ভারতবর্ষে বড় একটা দেখা যেত না।

এ বিষয়ে ওদেশের শিক্ষক ও কর্মীদের যথেষ্ট প্রশংসা করা উচিত যে নতুন কিছু জানবার তাঁদের অসীম আগ্রহ; এমন কি বাঙালী ছাত্রের কাছ থেকেও। সুকুমার মাকে লিখেছেন, 'সামনের সপ্তাহে স্টুডিওতে বাবার multiple stop দিয়ে কি রকম করে কাজ করে তাই demonstrate করব, প্রিন্সিপ্যাল ও টীচাররা সব থাকবেন।' বাবাকে লিখছেন, 'Litho transfer আর halftone litho যত fine বা শক্ত হোক এখন হাতে নিতে ভরসা পাই।' আরো লিখছেন 'সুবিধা হলে একটা কোনো বিষয়ে systematic research করবার ইচ্ছা আছে। মনে করেছি নানারকম dot এর দরুন ছবির gradation আর etching characteristics এর যে তফাৎ হয় সেইটা quantitatively দেখাতে পারলে মন্দ হয় না। তাছাড়া intaglia halftone block থেকে Woodbury type-এর মতো করে gelatine pigment নিয়ে ছাপবার একটা process কতকটা work out করেছি···।

ছাপাখানার কাজে নিজে নিবেদন করবার প্রস্তুতি এসব। বড় বড় কারখানা দেখতে যেতেন।

এই তো গেল কাজের কথা: অকাজের ক্ষেত্রেও সুকুমার কম উপকৃত হন নি। গিয়েই যা কিছু দ্রষ্টব্য সব দেখতে শুরু করলেন, আর্ট গ্যালারি, মিউজিয়ম, হ্যাম্পটন কোর্ট প্যালেস, কিউ গার্ডেন্স। অ্যালবার্ট হলে ক্রাইস্‌লারের বাজনা শুনছেন, আবার রঞ্জির ক্রিকেট খেলাও দেখতে যাচ্ছেন।

সাত

এই সময় রবীন্দ্রনাথও বিলেতে ছিলেন, তখনো নোবেল পুরস্কার পান নি, কিন্তু যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা হয়েছে ওদেশে। তাঁর চারিদিকে একদল শিল্পী,

সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ্ জড়ো হয়েছিলেন। সৌভাগ্যবশত তাঁদের সঙ্গে সুকুমারও পরিচিত হলেন। তাঁদের মধ্যে হ্যাভেল ও রোথেন্‌স্টাইনের মতো শিল্পীও ছিলেন, ব্রিজেস্ ও ইয়েটসের মতো কবিও ছিলেন ; তাছাড়া ফক্স স্ট্র্যাংওয়েস্, সিলভান লেভি এবং পিয়ার্সনও ছিলেন। এঁরা পরে ভারতবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত ছিলেন, কিন্তু যখন সুকুমারের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়, এদেশে এঁদের কেউ জানত না।

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ইত্যাদি অনেক পুরানো বন্ধুদের সঙ্গেও পুনর্মিলন হল, নতুন বন্ধুও জুটল। সে সময় স্যার কে. জি. গুপ্ত ও ডাক্তার পি কে. রায় কার্যব্যপদেশে ইংলাণ্ডে বাস করছিলেন। ডাঃ পি. কে. রায়ের অনন্যসাধারণ পত্নী সরলা রায়ের বাড়িতে প্রতি রবিবার স্থানীয় বাঙালীরা মিলিত হতেন। একসঙ্গে লুচি তরকারি খাওয়া, দেশ ও বিদেশী সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা হত। সরলা রায় চিরকাল স্ত্রী-শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করতেন। বিলেতে গিয়ে একজন করে ভারতীয় মেয়ে যাতে তিন চার বছর পড়াশুনা করতে পারে, সেইজন্য তিনি তখন টাকা তুলতে ব্যস্ত। ভিক্ষা করে টাকা নয়, ভারতীয় পৌরাণিক বিষয় নিয়ে মুখ-অভিনয় করে অর্থ সংগ্রহ।

তার জন্য সকলকেও যেমন খাটাতেন, নিজেও তেমনি খাটতেন। সুকুমারকে ভার দিলেন হিন্দু দেবদেবীদের আকার আকৃতি ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করে দিতে হবে। এইজন্য সুকুমারকে বেশ কিছুদিন লাইব্রেরিতে গিয়ে বই ঘাঁটতে হয়েছিল। প্রচুর টাকাও উঠেছিল।

এঁদের বাড়িতে সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সাহিত্যানুরাগী লোকের অভাব ছিল না। পিয়ার্সন সাহেব একটু একটু বাংলা জানতেন, এদিকে রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ; তাঁর বাড়িতে মাঝে মাঝে ছোটখাটো জমজমাট সাহিত্য সভা বসত। সুকুমারকে তিনি ধরে বসলেন রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্পর্কে কিছু লিখে এনে পড়তে। সুকুমারের মনের মতো কাজ ; প্রবন্ধ লেখা হল, দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতার অনুবাদ হল। তার মধ্যে ছিল 'পরশ পাথর,' 'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে,' ইত্যাদি।

অকুস্থলে গিয়ে সুকুমার দেখেন সামনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বসে। দেখেই হাত-পা ঠাণ্ডা, তবু সাহস করে পড়ে দিলেন এবং উপস্থিত সকলেই অতিশয় প্রীত হলেন। এর ফলে সুকুমারের খ্যাতি বাড়ল। East and West

Society-তে ডাক পড়ল ; তাঁদের আসরে "The Spirit of Rabindranath প্রবন্ধ পড়তে হল ; 'Quest' পত্রিকায় সেটি ছাপা হল। নানান জায়গা থেকে আমন্ত্রণ আসতে লাগল।

নোবেল পুরস্কার পাবার আগেও যে রবীন্দ্রনাথ বিলেতের লোকদের হৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন, তার ছোটখাটো প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময়ে Royal Court Theatre-এ ইংরেজীতে 'ডাকঘর' অভিনয় হল। মালিনী ও চিত্রাঙ্গদার মহড়া চলতে লাগল।

এসব ছাড়াও সাধারণ দৈনিক জীবনও মন্দ কাটাত না। তখন ইংল্যাণ্ডের মেয়েরা ভোট দেবার অধিকার নিয়ে আন্দোলন করছিলেন, এই মেয়েদের সাফ্রাজেট্ বলত। তাঁরা দলে দলে পথে বেরিয়ে শোভাযাত্রা করতেন ; ভালোভাবে উদ্দেশ্য সাধন করতে না পেরে, তাঁরা রুদ্ররূপ ধরলেন, পার্লামেণ্টের সামনে হট্টগোল ও ঢিল ছোঁড়া ; বহু বড় দোকানের প্লেট গ্লাসের শো উইণ্ডো ভেঙে, কারাবরণ করা ইত্যাদি। পুলিসের লোকদের আঁচড়ে-কামড়েও দিতেন মাঝে মাঝে। সুকুমার ছোট বোনকে লিখলেন—দেড়শো জন মেয়ে গিয়ে হ্যারডস্-এর ফ্যাসানেবল্ দোকানের জানালা ভাঙল, একশো গ্রেপ্তার হল, দলের পাণ্ডা বিখ্যাত হাসির গল্প রচয়িতা W. W. Jacobs-এর স্ত্রী।

বয়সের তুলনায় সুকুমারের মানসিক বিবর্তন অনেকখানি এগিয়েছিল ; তাই বলে বয়সোপযোগী তারুণ্যের মোটেই অভাব ছিল না। চিরকালই দোহারা চেহারা, অল্পেই গায়ে মাংস লাগে ; বিলেত যাত্রার সময় ওজন ছিল চোদ্দ স্টোন ; সেটাকে কমিয়ে প্রায় তেরো স্টোনে এনে একদিকে যেমন খুশি, অন্যদিকে একটু ক্ষোভের সঙ্গে বাড়িতে লিখছেন 'আর কমবে বলে মনে হয় না'।

১৯১৩ সালে উপেন্দ্রকিশোরের ছোটদের অতুলনীয় মাসিক পত্রিকা 'সন্দেশ' প্রকাশিত হল। সুকুমার প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় হয় হাসির গল্প, নয় তো কবিতা লিখতেন ; সঙ্গে ছবি এঁকে দিতেন। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে ভালো লেখা সংগ্রহের চেষ্টা করতেন।

দেখতে দেখতে বিলেত বাসেরও মেয়াদ ফুরুল। সুকুমার F. R. P. S. উপাধি পেয়ে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তাঁর আগে কোনো ভারতীয় এই সম্মান লাভ করেন নি। শেষ দুই মাস যেখানে যত ভালো ছাপার কাজ হয় নিজের চোখে সব দেখে, কণ্টিনেণ্ট বেড়িয়ে, তবে

সুকুমার আবার দেশে ফিরলেন। ভাবনা-চিন্তা নেই, মাথার উপরে অসাধারণ বাবা, সম্মুখে স্বর্ণময় ভবিষ্যৎ।

আট

দেশে ফিরে সাগ্রহে ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্সের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন সুকুমার। দুঃখের বিষয় এই সময় উপেন্দ্রকিশোরেরও মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে স্বাস্থ্য ভাঙতে শুরু করল। সুখের উপাদানের অভাব ছিল না তাঁর, ১০০ নং গড়পার রোডে নিজের সুন্দর বাড়ি হয়েছে; তারো একতলায় প্রেস, দোতলার সামনের দিকে অফিস, বাকি অংশে বাস করা হয়। উপেন্দ্রকিশোরের মনটা নিশ্চয় সুখশান্তিতে ভরা ছিল। বড় ছেলে বিলেত থেকে কৃতিত্ব অর্জন করে এনেছে; পিতার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ে এখন সে তাঁর ডান হাত। উপযুক্ত পাত্রী দেখে এবার তার বিবাহ দিলে উপেন্দ্রকিশোরের ষোলকলা পূর্ণ হয়।

পাত্রীর নাম সুপ্রভা, দীর্ঘাঙ্গী শ্যামা শিখরদশনা। মাথাভরা কালো কোঁকড়া চুল আর কোকিলের মত কণ্ঠ। ঢাকার খ্যাতনামা সমাজ-সেবক কালীনারায়ণ গুপ্তর দৌহিত্রী, সুকুমারের সঙ্গে বিলেতে আলাপ সেই স্যার কে. জি. গুপ্তের ভাগিনেয়ী। সুকুমারের বিবাহ সম্বন্ধে একটা গল্প শোনা যায়; কি রকম মেয়ে তাঁর ভালো লাগে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি নাকি বলেছিলেন এমন মেয়ে যে গান গাইতে পারে আর যাকে রসের কথা বুঝিয়ে বলতে হয় না। সুপ্রভা ছিল ঠিক তেমনি মেয়ে। তাকে দেখেই সুকুমারের ভালো লেগেছিল; মাত্র দশ বছরের বিবাহিত জীবন তাঁদের সুখে ভরা ছিল।

শিল্পীর চোখ ও হাত ছিল সুপ্রভার, রসবোধ ছিল প্রচুর, কিন্তু মানুষটি ছিলেন গম্ভীর, কর্তব্যপরায়ণা, অনলসভাবে কাজ করে যেতেন। পতিগৃহে এসে সবাইকে সুখী করেছিলেন। গম্ভীর মেয়েটিকে প্রথমে কেউ কেউ অহঙ্কারী ভেবেছিলেন, কিন্তু বছর না ঘুরতে তাঁরাও তার প্রীতির কণা লাভ করে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। যেমন গান গাইতে পারতেন, তেমনি গৃহকর্মে সুনিপুণা। বড়বৌদির হাতের রান্না খেয়ে পুরুষরা যেমন তৃপ্ত

হতেন, তাঁর কাছে রান্না শিখে মেয়েরা সবাই কৃতার্থ হয়ে যেতেন।

১৯১৫ সালে বাহান্ন বছর বয়সে উপেন্দ্রকিশোর পরলোক গমন করলেন। সুকুমার ও তাঁর মধ্যম ভ্রাতা সুবিনয়ের হাতে ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্সের সমস্ত দায়িত্বের ভার পড়ল। সুকুমারের বয়স তখন মাত্র ২৮ বছর, সুবিনয় আরো বছর পাঁচেকের ছোট। দু-বছরের বেশি বিলেতে বাস করেও সুকুমার সাহেব বনে যান নি; পোশাক-পরিচ্ছদ আগের মতোই সাদাসিদে; অভ্যাসগুলোও অনেকটা তাই; পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে সেইরকম প্রীতির সম্বন্ধ; সমাজ পাড়ার গলিতে সেই তর্কাতর্কি।

তবে তফাৎ যে একেবারেই ছিল না তাও নয়। মাঝে মাঝে ছবির প্রুফ হাতে ছাপাখানার লোক সমাজ পাড়ার গলিতে উদয় হত; সুকুমার তখন আলোচনা ছেড়ে মনোযোগ দিয়ে প্রুফ দেখতেন। হয় তো প্রবাসী পত্রিকার জন্য ছবি; রামানন্দবাবুও ঐ পাড়ার বাসিন্দা, প্রুফ নিয়ে গেলেন সুকুমার তাঁকে একবার দেখিয়ে আনতে।

ব্রাহ্ম যুবক সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক নেতা তিনি, ঘরে বসে যতই হাসিঠাট্টা চলুক, নিজেদের মধ্যে যতই মস্করা চলুক, বাইরের গাম্ভীর্য রক্ষার দিকে সুকুমারের সদাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভ করবে, দায়িত্বপুর্ণ কর্মভার গ্রহণ করবে,—কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সামনে রেখে, সুকুমারের পক্ষে এসব সমর্থন করাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে বাইরের আচরণে কোনো লঘুতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। বাংলাদেশের মেয়েরা সকলের সম্মানের যোগ্যা হবে, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন।

কোনো গোঁড়ামি ছিল না সুকুমারের, উদার খোলা মন। সামাজিক জীবনেই হোক আর শিল্প বা সাহিত্য জগতেই হোক সুকুমারের মানস সর্বদা স্থির যুক্তিসংগত চিন্তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মাঝে মাঝে তর্ক-বিতর্কে জড়িত হয়ে পড়তেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি নিতান্ত অপটুও ছিলেন না, ছাত্রজীবনেই সমাজ পাড়ার গলিতে শিক্ষানবিশী করেছিলেন। বিখ্যাত শিল্পজ্ঞ ও. সি. গাঙ্গুলীর সঙ্গে একবার প্রবাসীর পাতায় ভারতীয় শিল্পের স্বরূপ সম্বন্ধে এমনি বাক্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন যে শেষ পর্যন্ত প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয় ধৈর্য হারিয়ে জোর করে আলোচনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, শ্রদ্ধেয় গাঙ্গুলী মহাশয়ও তখন নব্য যুবক ছিলেন।

ক্রমশ সুকুমারের চারদিকে অনেকগুলি গুণী-লোকের সমাগম হল;

তাঁদের মধ্যে অনেকেই সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী, সাহিত্যিক, নিদেন সঙ্গীতে, শিল্পে ও সাহিত্যে অনুরাগী। দেখতে দেখতে মণ্ডে ক্লাব নামক রস-চক্রটি দানা বাঁধল। সভ্যরা এর বাড়িতে ওর বাড়িতে সমবেত হতেন। কখনো গানবাজনা, কখনো প্রবন্ধ, গল্প বা কাব্যপাঠ, কখনো দেশী কখনো বিদেশী সাহিত্য নিয়ে আলোচনা, কখনো রসালাপ, কখনো অভিনয়, কখনো বা স্রেফ ক্লাবের মিটিং। এই সঙ্গে অবশ্য প্রচুর খাদ্যদ্রব্য থাকত।

এই মণ্ডে ক্লাব সম্পর্কে আরো কিছু বলা অবশ্যক, কারণ এরকম ক্লাবের কথা, অন্তত এদেশে, আর কখনো শোনা যায় নি। অনেকের মতে ভাবের আদি নাম 'মণ্ডা ক্লাব'। খাওয়া দাওয়ার আতিশয্যের কথা ভেবে এই উৎপত্তি অসম্ভব বলে মনে হয় না।

১৯১৭-১৮ সালের ক্লাবের তৃতীয় বার্ষিক বিবরণী দেখে চমৎকৃত হতে হয়। সভ্য সংখ্যা পঁচিশ। তার মধ্যে অন্যান্যদের সঙ্গে আছেন কালিদাস নাগ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অমলচন্দ্র হোম, অতুলপ্রসাদ সেন, ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, জীবনময় রায়, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র শর্মা, কিরণকুমার বসাক ইত্যাদি। এঁরা সকলেই পরবর্তী জীবনে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন।

মণ্ডে ক্লাবে অবিশ্যি কারো মুখ উজ্জ্বল করার কথা উঠত না; দরকার হলে সেক্রেটারী মশায়ের কাছে সকলকেই দাঁতখিঁচুনি খেতে হত। সেপ্টেম্বর ১৯১৭ থেকে আগস্ট ১৯১৮-এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে সাড়ে চল্লিশটি অধিবেশন হয়ে ছিল। ঐ ফালতু আধখানা অধিবেশন সম্পর্কে কোনো তথ্য সংগ্রহ করা গেল না।

আলোচিত বিষয়াদি দেখলে আশ্চর্য হতে হয়, আলোচ্য বিষয় জুট ইণ্ডাস্ট্রি, বিবেকানন্দ। তিন-চারবার আলোচ্য বিষয় বাংলা আঞ্চলিক ভাষা। এগুলি সম্ভবত শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমারের দায় ছিল। তাছাড়া Strindberg, Turgenev, Plato ইত্যাদি, কেউ বাদ যান নি।

আয়-ব্যয়ের তালিকায় দেখা যাচ্ছে সুনীতিবাবুর প্রেমচাঁদ ভোজে সাড়ে ষোল টাকা খরচ হয়েছিল, তেমনি তিনি দানও করেছিলেন সতেরো টাকা।

এই ক্লাবের নিত্য চাহিদা মেটাতে সুকুমার প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক লিখতেন; অন্যান্যরাও কেউ কেউ যেমন করতেন। তাঁর এই সব প্রবন্ধ

নাটক পরে সংকলিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

দিন চলে যেতে লাগল; সুকুমারকে চেনে না বাংলাদেশের লিখতে-পড়তে পারে এমন ছোট ছেলে বোধ হয় কেউ বাকি ছিল না। শারীরিক পরিশ্রমে বিরূপ এই হাসিখুশি মানুষটির সারাদিন কালি কলম রঙ তুলি ক্যামেরা ছাপাখানা নিয়েই কাটত। ইউ রায় অ্যান্ড সন্সের অনেক দায়-দায়িত্ব। সুকুমার সুবিনয়ের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট নয়। যদি আরো কিছুদিন বাবার কাছে শিক্ষানবিশী করার সুযোগ পেতেন, তাহলে পরিণাম অন্যরূপ হত কিনা বলা যায় না, কিন্তু এমনিতে দিনে দিনে ব্যবসায়ে নানান সমস্যা দেখা দিতে লাগল। নানান দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে দিন কাটলেও, সুকুমারের হাসির স্রোত বন্ধ হল না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চিরকালই স্নেহ করতেন; উপরন্তু সুপ্রভা সুগায়িকা, কবির কাছে তারো কদর কম নয়। মাঝে মাঝে ওঁরা শান্তিনিকেতনে গিয়ে দিনকতক কাটিয়ে আসতেন। একবার সেখানে পূর্ববঙ্গ সম্মেলন হল; সুকুমার ময়মনসিংহের ছেলে, তাকে সভাপতির আসনে শুধু যে বসিয়ে দেওয়া হল তা নয়, উপরন্তু বাঙাল ভাষায় ভাষণ দিতে বাধ্য করা হল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীযুক্তা সীতা দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে ভাষণের বাঙাল ভাষা খুব সুবিধার হয় নি, বরং সুপ্রভাকে মঞ্চে বসালে কাজে দিত।

এইভাবে কাজে কর্মে আহ্লাদে আনন্দে, সুকুমারের দিন কেটে যেতে লাগল। ১৯২১ সালে তাঁর ঘরে সুন্দর একটি পুত্রের জন্ম হল। সেই ছেলের নাম সত্যজিৎ রায়। সেই বছরেই সুকুমার কঠিন রোগে পড়লেন। কালাজ্বরের তখনো ভালো চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয় নি, যদিও নানান পরীক্ষা চলছিল। ক্রমে সুকুমারের শরীর ভাঙতে শুরু করল। তবু তিনি বৃথা কালক্ষেপ করেন নি, অনলস তাঁর তুলি কলম আর যে এসেছে তার সঙ্গে দুটো রসিকতা। প্রথম বই বেরুচ্ছে 'আবোল-তাবোল,' তার ছবি আঁকা, তাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে তৈরি করা এই নিয়ে দিনগুলি ভরা থাকে। ঐ বইয়ের dummy copy-টি ছাড়া আর তৈরি বই দেখা হল না।

মনে মনে তিনি যাবার জন্য নিজেও প্রস্তুত, সুপ্রভাকেও দুঃখ বরণ করার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। জীবনমরণের রহস্যের পটভূমিকায় 'অতীতের ছবি' কাব্যে লেখা হল। সমস্ত পরিবারের উপর ধীরে ধীরে

শোকের ছায়া নেমে আসতে লাগল। মণ্ডে ক্লাবের হাসিও চিরকালের মতো থেমে গেল।

আবোল-তাবোলের শেষের কবিতায় সুকুমার লিখেছিলেন,

"আপনাকে আজ আপন হতে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে।
ছুটলে কথা থামায় কে?
আজকে ঠেকায় আমায় কে?
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ তবলা বাজে………
আদিম কালের চাঁদিম হিম,
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর,
গানের পালা সাঙ্গ মোর।"

২৩শে ভাদ্র ১৩৩০, সুকুমার বৃদ্ধা বিধবা হতভাগিনী মাকে, ঊনত্রিশ বছর বয়স্কা অনন্যসাধারণ স্ত্রীকে, দু-বছরের পুত্রকে আর সমস্ত বৃহৎ আত্মীয়কুল ও বন্ধুবান্ধবদের শোকাচ্ছন্ন করে চিরদিনের মতো চলে গেলেন। দু-বছর পরে ইউ রায় এ্যাণ্ড সন্সও উঠে গেল।

নয়

আগেই বলা হয়েছে সুকুমার রায় আবোল-তাবোলের ডামি কপি ছাড়া নিজের রচনার একটিকেও পুস্তকাকারে দেখে যাবার সময় পান নি। তাঁর প্রথম ও সম্ভবতঃ সব চাইতে জনপ্রিয় বই ঐ আবোল-তাবোলের অনেকগুলি ছবিই রোগশয্যায় বালিশে ভর করে আঁকা। ভিতরের ছবি আঁকা হল, মলাট আঁকা হল—এমন মলাট ভারতে কেউ কখনো আঁকে তো নি-ই, পৃথিবীতে কেউ এঁকেছে কিনা সন্দেহ। পাঠ্যাংশের প্রায় সবটুকুই দশ বছর ধরে সন্দেশের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। যে মাসের সন্দেশে সুকুমারের আবোল-তাবোল না থাকত, তরুণ পাঠক-পাঠিকারা মুখ ভার করত। আবোল-তাবোলের

ছেচল্লিশটি কবিতার সম্ভবতঃ প্রথম ও শেষটি ছাড়া প্রত্যেকটিই আগে শিশু-জগতের সমর্থন পেয়ে, তারপর বই-এ স্থান পেয়েছে।

স্বচ্ছন্দে বলা চলে আবোল-তাবোলের জুড়ি নেই। অনেকে এর অনুকরণের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কি ভাবে, কি ভাষায়, একটিও উৎরোয় নি। আবোল-তাবোলের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৩ সালে, ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স থেকে। তারপরে একে একে সুকুমারের সংক্ষিপ্ত জীবনের রচনাগুলির মধ্যে এক-আধটি ছাড়া প্রায় সবই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। রচনার তারিখের সঙ্গে প্রকাশনের তারিখের কোনো সম্বন্ধ নেই, সুবিধামতো সাজিয়ে বইগুলিকে বের করা হয়েছিল ; তাদের মধ্যে সুকুমারের অসাধারণ ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করা তাই সম্ভব নয়। ছত্রিশ বছর বয়সে পরলোক গমন করলেও, একথা ভুললে চলবে না যে মাত্র আট বছর বয়স থেকে তাঁর লেখা শুরু হয় এবং আটাশ বছর ধরে তিনি ক্রমাগত লিখে গিয়েছিলেন। লিখতে লিখতে ছোট শিশু থেকে তিনি পূর্ণবয়স্ক যুবাপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন, সেই সঙ্গে তাঁর প্রতিভার কুঁড়িটিও ক্রমে বিকশিত হয়ে উঠেছিল, পাপড়ি মেলে ফুলটি ফুটেছিল, কিন্তু ফল পাকার সময় ছিল না।

সুকুমারের রচনাবলীকে মোটামুটি বিষয় অনুসারে তিন ভাগ করা যায়, যথা—কাব্যরচনা, নাটক এবং গল্প ও প্রবন্ধ। এর মধ্যে সম্ভবতঃ কাব্যাংশই সব চাইতে পরিণতি লাভ করেছিল। শুরু থেকেই তার মধ্যে এমন একটা বলিষ্ঠতা দেখা গিয়েছিল যে কোনোটিকেই কাঁচা লেখা আখ্যা দেওয়া যেত না।

এখন পর্যন্ত তাঁর চারটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে, আবোল-তাবোল, খাই-খাই, অতীতের ছবি ও বর্ণমালা তত্ত্ব। এগুলি কি ছোটদের বই, নাকি বড়দের বই, তাই নিয়ে প্রশ্ন।

এর উত্তর দিতে গেলে আবার সেই গোড়ার কথায় ফিরে যেতে হয়, ছোটদের বই বড়দের বই বলে কোনো দুটি আলাদা বিভাগ হয় না ; ছোটরা যে বইয়ের রস ও অর্থ গ্রহণ করতে পারে সে সব বই-ই ছোটদের বই আর বই মাত্রই বড়দের বই। তবে সন্দেশে প্রকাশিত রচনাগুলিকে সুকুমার নিশ্চয় ছোটদের উপযুক্ত বলেই বিবেচনা করেছিলেন এবং সেই সব কবিতাই আবোল-তাবোল ও খাই-খাই এ স্থান পেয়েছে।

সুকুমারের রচিত সাতটি নাটকের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে, যথা অবাক-

জলপান, ঝালা-পালা, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, হিংসুটি, ভাবুক-সভা, চলচিত্ত-চঞ্চরি ও শব্দকল্পদ্রুম। এর মধ্যে প্রথম চারটিকে ছোটদের উপযুক্ত বলা চলে।

সুকুমারের গল্প ও প্রবন্ধের তালিকার শুরুতেই হ-য-ব-র-ল এর নাম করতে হয়। এটিকে ছোটদের জন্য বড় গল্প বলা যায়। তাছাড়া আছে পাগলা দাশু ও বহুরূপী, দুটিই ছোটদের উপযুক্ত গল্পের সংগ্রহ। বর্ণমালা-তত্ত্বে প্রকাশিত প্রবন্ধমালা নানান বিষয়ে ও নানান সময়ে লিখিত। বিলেতে পঠিত ইংরেজী প্রবন্ধও আছে। এসব প্রবন্ধের তাৎপর্য ছোটরা বুঝবে না।

বাকি রইল প্রফেসর হেঁসোরামের ডায়রি, ডায়রি আকারে লেখা রসরচনা; এটি কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত না হলেও, ছোট বড় সকলেই সমান ভাবে উপভোগ করবে।

এসব ছাড়া সারাজীবন ধরে লেখা, অজস্র ছবি, কবিতা, প্রবন্ধাদি নানান স্থানে ছড়িয়ে পড়ে আছে। অনুসন্ধান করে সেগুলি সংগ্রহ করার কাজ কোনো অনুরাগী ও আগ্রহী গবেষকের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। বিলেত থেকে বাবা, মা, ভাই, বোন ও অন্য আত্মীয়দের লেখা চিঠিগুলি যেন সোনার খনি।

সুকুমারের চিন্তাধারাই গানের সুরে বইত। যেখানে যেতেন এমন একটি হাসির ও গানের স্রোত বইয়ে যেতেন যা দেখে অচেনা লোকে অবাক হয়ে যেতেন। আবার যখন সেই হাসির মানুষটি গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে উপাসনার আসনে বসতেন, তাঁদের বিস্ময়ের সীমা থাকত না। আসল কথাই হল সুকুমার যা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন, গাম্ভীর্যের ভিত্তি না থাকলে আলো-হাওয়ায় ভরা হাসির প্রাসাদ নিজের ভারসাম্য রক্ষা করবে কি করে?

আবোল-তাবোলের শুরুতে গ্রন্থকার একটি কৈফিয়ৎ দিয়েছেন।

"যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল রসের বই, সুতরাং সে-রস যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।"

সুখের বিষয় পাঠক যতই বিদ্বান বিচক্ষণ হোন না কেন, মনটা তাঁর খেয়াল রসের খোলা হাওয়াতে ছাড়া পাবার জন্য আঁকুপাঁকু করে, কাজেই খুব কম লোকই এ বইয়ের রসগ্রহণ করতে অসমর্থ। ছোটদের কথা তো বলবার নয়; তাদের মনে সম্ভব-অসম্ভবের মাঝখানে সূক্ষ্ম

দেওয়াল তখনো ওঠে নি, কোনটা বাস্তব আর কোনটা খেয়াল তার কোনো বাছ-বিচার নেই, সমস্ত বিশ্ব তাদের কানে কানে কথা বলে, আবোল-তাবোল যে তাদের মনের মতো বই হবে সে আর বিচিত্র কি!

একদল লোক আছেন যাঁদের ধারণা ছোটদের বই মাত্রই শিক্ষাপ্রদ হবে, একটা উদ্দেশ্য থাকবে, পড়বামাত্র ছোটরা নতুন কিছু শিখে নেবে, কিম্বা কি করে ভালো ছেলে হতে হয় বুঝে নেবে। তাঁরা বলেন, এই শিখে নেওয়া ও বুঝে নেওয়াটা যদি আনন্দের মধ্যে দিয়ে হয় তবে তো কথাই নেই। অর্থাৎ শিক্ষাটাই হল বড় কথা, রসের দরকার হয় শুধু পাঁচনটাকে গেলাবার জন্য। রসসৃষ্টি বা শিল্পসৃষ্টি কিন্তু এভাবে হয় না; সূর্যের আলো যেমন আপনার নিয়ম অনুসারেই চারিদিকে বিকীর্ণ হয়ে পড়ে, কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির কথাই ওঠে না, তবু আলো লেগে গাছের পাতা শ্যামল হয়ে ওঠে, ফুলের পাপড়িতে রঙ ধরে; রসের সৃষ্টিও তেমনি সমস্ত জীবনকে উষ্ণ কোমল প্রাণময় বর্ণময় করে তোলে, নিজেদের কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়, বিকশিত হয়ে ওঠাই তার ধর্ম বলে। সত্যকার কোনো শিল্পরচনার শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য থাকে না, কিন্তু রূপকথার সোনার কাঠির মতো, যাতেই তার ছোঁয়া লাগে সেই সোনার হয়ে যায়।

এই রকম বই আবোল-তাবোল। শিক্ষা দেওয়া এর উদ্দেশ্য নয়; মনের তাগিদে রচয়িতা এ বই লিখেছিলেন, কেউ যদি পড়ে শিক্ষালাভ করে ভালো কথা; যদি নাও করে শুধু একটু আনন্দ, একটু আমোদ পায়, তাই যথেষ্ট। আর যে অভাজনরা তা-ও পায় না, গোড়াতেই তো লেখা আছে, 'এ পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে'।

এ ধরনের রচনা—যার সঙ্গে হয়তো বাস্তব জগতের দৈনন্দিন চেহারার খানিকটা আদলও আসে, তফাৎও থাকে,—বাস্তব জগতের হতাশা ব্যর্থতা গুলোকে এরা অস্বীকার করে না, কিন্তু তার বাইরে একটা বৃহত্তর জগতে ডাক দিয়ে যায়, যেখানকার ঠিকানা জানা থাকলে দুঃখজ্বালাগুলোকে কিছুটা সইতে পারা যায়।

আয় যেখানে খ্যাপার গানে
নাইকো মানে নাইকো সুর,
আয় রে যেথায় উধাও হাওয়ায়
মন ভেসে যায় কোন সুদূর।

আয় খ্যাপা মন ঘুচিয়ে বাঁধন
জাগিয়ে নাচন তাধিন ধিন,
আয় বেয়াড়া সৃষ্টি ছাড়া
নিয়মহারা হিসাবহীন।
আজগুবি চাল বেঠিক বেতাল
মাতবি মাতাল রঙ্গেতে—
আয় রে তবে ভুলের ভবে
অসম্ভবের ছন্দেতে।।

দশ

'হিউমার'-এর ব্যাখ্যা অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিত সাধারণতঃ অতিশয় নীরস ভাবেই দিয়েছেন ; কেউ বলেছেন স্বাভাবিক নিয়মের অপ্রকাশিত ব্যতিক্রমেই হিউমারের সৃষ্টি ; কেউ বা বলেছেন হাস্যরসের প্রধান উপাদান হল অপ্রাসঙ্গিকতা, অর্থাৎ যেখানে যেটা থাকার কথা নয়, ঠিক সেইখানে তার অকারণ উপস্থিতি হল লোক হাসাবার মূল কারণ। হাসির কথা বিশ্লেষণ করলে সম্ভবত এর সবই কিছু কিছু পরিমাণে পাওয়া যাবে, কিন্তু তাই বলে শেষ কথাটি বলা হবে না। হাসির মধ্যে যে একটা বিলিয়ে দেবার বয়ে যাবার ভাব আছে, যার মধ্যে থেকে পৃথিবীর হতাশা ব্যর্থতাকে মেনে নেবার শক্তি পাওয়া যায়, তার কথা বড় কেউ বলেন না। তার উপরে হিউমারের মধ্যে একটা আত্মজ্ঞানের কথাও আছে, নিজের গর্ব খর্ব করে, তবে না প্রাণ খুলে হা-হা হো-হো করে হাসা যায়। এই কারণে শ্লেষাত্মক কবিতা বা satire-কে রসাত্মক বা humorous বলা যায় না।

সুকুমার লিখছেন,

'ভাবছি মনে হাসছি কেন ? থাকব হাসি ত্যাগ করে,
ভাবতে গিয়ে ফিক্‌ফিক্‌িয়ে ফেলছি হেসে ফ্যাক করে।
পাচ্ছে হাসি চাইতে গিয়ে, পাচ্ছে হাসি চোখ বুঁজে,
পাচ্ছে হাসি চিমটি কেটে, নাকের ভিতর নোখ গুঁজে।
হাসছি দেখে চাঁদের কলা জোলার মাকু জেলের দাঁড়
নৌকা ফানুস পিঁপড়ে মানুষ রেলের গাড়ি তেলের ভাঁড়।

পড়তে গিয়ে ফেলছি হেসে ক খ গ আর শ্লেট দেখে,
উঠছে হাসি ভসভসিয়ে সোডার মত পেট থেকে।'

আসল কথা আছে ঐ শেষের লাইনে ; বস্তুজগৎ খুঁজে দেখলেও হাসির কারণ সবটা পাওয়া যাবে না ; কেমন করে দেখতে হবে তাও জানা চাই নিজের মন থেকে। জানতে পারলে আর ভাবনা নেই, বাইরের পাঁচজনকেও জানিয়ে দিলেই হল। এমন কি যারা হাসির শত্রু, হাসাকে যারা অকেজো লঘুতা বলে মনে করেন তাঁদেরো সদাই মনে ভয় ঐ বুঝি হেসে ফেললাম। হাসির মালমশলা বুকে নিয়ে তাঁরা এখন করে কি।

'যায় না বনের কাছে, কিম্বা গাছে গাছে,
দখিন হাওয়ার সুড়সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে।
সোয়াস্তি নেই মনে, মেঘের কোণে কোণে
হাসির বাষ্প উঠছে ফেঁপে
কান পেতে তাই শোনে।
ঝোপের ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে
জোনাক জ্বলে আলোর তালে
হাসির ঠারে ঠারে।'

বলতে গেলে আবোল-তাবোল বইখানি হাসির পাঁচালি ছাড়া আর কিছু নয়। একমাত্র এই বইটির কবিতাগুলি সুকুমারের নিজের হাতে বাছাই করা। এর মধ্যে রোজকার অনুজ্জ্বল জীবনের এমন একটা হাসির বাখানি দেওয়া রয়েছে যা যেমনি আশাতীত, তেমনি অপরূপ। প্রতিদিনের বিরক্তিকর জিনিসগুলিও যে এত মজার তাই বা কে জানত।

রাতদুপুরে বেড়ালের চ্যাঁচানিতে যাদের ঘুম ভাঙে, তাদের মধ্যে ক-জনা তার মূল কারণটির খবর রাখে ? হয়তো উনুনমুখো পাটকিলেকে ডেকে বলছে,

"চুপচাপ চারিদিকে ঝোপঝাড়গুলো,
আয় ভাই গান গাই, আয় ভাই হুলো।
গীত গাই কানে কানে চীৎকার করে,
কোন গানে মন ভেজে শোন্ বলি তোরে।
পূবদিকে মাঝরাতে ছোপ দিয়ে রাঙা
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা।"

শুধু বেড়ালরা কেন, মাঝরাতের হু হু-করা আধখানা চাঁদ আমরাও অনেকে দেখেছি। তাই দেখে বেড়ালদের মনে কি হল ?

"চট করে মনে পড়ে মটকার কাছে
মালপোয়া আধখানা কাল থেকে আছে।
দুড় দুড় ছুটে যাই, দূর থেকে দেখি
প্রাণপণে ঠোঁট চাটে কানকাটা নেকি!
গালফোলা মুখে তার মালপোয়া ঠাসা,
ধুক করে নিবে গেল বুকভরা আশা।
মন বলে আর কেন সংসারে থাকি,
বিলকুল সব দেখি ভেলকির ফাঁকি।
সব যেন বিচ্ছিরি সব যেন খালি,
গিন্নীর মুখ যেন চিমনির কালি!"

এই হতাশার পরে বেড়ালদের পক্ষে আর যা করা সম্ভব, তখন তারা তাই করে—

"মন ভাঙা দুখ্ মোর কণ্ঠেতে পুরে,
গান গাই আয় ভাই প্রাণফাটা সুরে।"

অসম্ভবের রাজ্যে কি ভাবে চলতে হয় এ কবিতা তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রস-রহস্যের বা ফ্যাণ্টাসির গল্পের কারবারই হল লোকে যাকে অসম্ভব বলে তাই নিয়ে; যা কখনো হয়েছে বলে শোনা যায় নি তাই নিয়ে। কিন্তু এর পিছনে একটা আশার ইঙ্গিতও থাকে; যা আজ পর্যন্ত হয় নি, তা যে কোনো দিনও হবে না, তাই বা কে বলতে পারে। যা হয় না, শেষ পর্যন্ত তাই যদি এক শুভদিনে ঘটে বসে, তাহলে সে এলোমেলো যথেচ্ছভাবে ঘটবে না, তারো একটা নিজস্ব নিয়ম থাকবে, তাকেই কবি 'অসম্ভবের ছন্দ' বলেছেন। কুকুর বেড়ালরা হয়তো কথা বলতেও পারে, (যা তারা আজ অবধি করেছে বলে শোনা যায় নি,) কিন্তু কুকুরের কথা নিশ্চয় হবে কুকুরে ধরনে আর বেড়ালদের কথায় নিশ্চয় একটা বেড়ালেপনা থাকবে, যেমন এই কবিতায় আছে। পাশ্চাত্যেও এই বিষয় নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরাও এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছেন যে ফ্যাণ্টাসির ঘটনা impossible হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু convincing হওয়া চাই। যেমন এক্ষেত্রে সকলের মনে হওয়া চাই যে বেড়ালরা যদি সত্যি তাদের

মনের কথা খুলে বলে, তা হলে নিশ্চয়ই এই ভাবেই বলবে। এই convince করার অর্থাৎ পাঠককে আশ্বস্ত করার গুণটি না থাকলে কোনো বুদ্ধিমান পাঠকের পক্ষে রস-রহস্য উপভোগ করা সম্ভব হত না। মরিস মেটারলিঙ্কে-র ব্লু বার্ডেও এই নিয়মের চমৎকারিত্ব দেখা যায়।

লোকে কেন হাসে, সেটি অবশ্য বলা কঠিন। বাইরের ঠিক সুরটির আঘাত লাগলে যেমন বাক্সের মধ্যে বেহালার বাঁধা তারে গুঞ্জন ওঠে, এমন কি অবস্থা বিশেষে ফট করে ছিঁড়ে যেতে দেখা যায়—তেমনি বহির্জগতের কোনো দৃশ্য বা শব্দ বা নৈঃশব্দ্য মনের ঠিক অবস্থাটিতে ধরা পড়লে মানুষের অন্তর্জগতের সাড়া জাগায়। তার ফলে সকলে একসঙ্গে হেসে ওঠে। মাঝে মাঝে মনের তারটি কারো হয়তো অন্য সুরে বাঁধা থাকে, কাজেই সবাই হাসলেও সে হাসে না; কিম্বা আর সবাই গম্ভীর হয়ে থাকলেও, তার হাসি পায়। এটা কিছু হাসির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নয়, রসজগতের একটি প্রত্যক্ষ নিয়মমাত্র।

এভাবে দেখতে গেলে হাসির মধ্যে এমন একটা অন্তরঙ্গতার উপাদান আছে, যার সঙ্গে শ্লেষ বা ব্যঙ্গের একত্র বাস সম্ভব নয়। তাই হাস্যরস আর ব্যঙ্গরস আলাদা জিনিস; হাসি মানুষকে কাছে টেনে নেয়, ব্যঙ্গের মধ্যে একটু নির্মমতা একটু বিদ্বেষ মেশানো থাকে, তা সে যত মজার কথাই হোক না কেন। হাসির মধ্যে দিয়ে যে হাসছে, যাকে নিয়ে হাসছে ও যে হাসাচ্ছে তারা পাশাপাশি এমন ঘেঁষে বসে যে আলাদা করে চেনা যায় না। যিনি ব্যঙ্গ করেন তিনি নিজেকে উঁচুতে আসন দিয়ে, হাসিকে অস্ত্র বানিয়ে পাত্রকে বিদ্রূপ করেন। অন্তরঙ্গতার জায়গায় অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায়।

নির্মল হাসির নমুনা আছে 'নারদ নারদ' কবিতাটিতে, তার বিষয়-বস্তু হল বাতাসের গলায় দড়ি দিয়ে ঝগড়া করা; কিম্বা যাঁরা নিজেদের ভারি পণ্ডিত মনে করেন তাঁদের সম্বন্ধে 'বুঝিয়ে বলা' কবিতাটিতে।

এগারো

সুকুমারের প্রখর কল্পনা-শক্তি; রস জমাবার জন্য অদ্ভুত পরিস্থিতি

পরিকল্পনায় তিনি অদ্বিতীয়। পটভূমিকা-রচনায় ছবিগুলির তুলনা হয় না; সুকুমারের আঁকা ছবিগুলিকে রচনা থেকে আলাদা করা যায় না; লেখা ও আঁকা দুটিতে মিলে তবে রস জমেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছবি বাদ দিলে পদ্যেরও মানে থাকে না; যেমন 'চোর ধরা'-র নায়ক বলছেন রোজ তাঁর টিপিন কে বা কাহারা খেয়ে যায় বলে আজ তিনি ক্ষেপে গিয়ে, ঢাল তলোয়ার হাতে খাড়া পাহারায় আছে। যে-ই আসুক না কেন তার আর রক্ষে নেই! এদিকে ছবিতে দেখা যাচ্ছে ঢাল তলোয়ার হাতে টাকমাথা দাড়িমুখো খাড়া পাহারায় আছে বটে কিন্তু তার পেছন দিকে রাজ্যের বেড়াল কাক ইত্যাদি থালার খাবারের সদ্ব্যবহার করছে!

আজগুবির নিয়ম হল পৃথিবীর কার্যকরী নিয়মের ঠিক উল্টো। সব চেয়ে যুক্তিসঙ্গতভাবে, সব চেয়ে সহজ উপায় অবলম্বন করে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করাই হল পৃথিবীর মানুষদের কাজ। আজগুবির নিয়ম অন্যপ্রকার। প্রথম কথা হল সেখানে উদ্দেশ্যের বালাই নেই, অন্তত লাভের বা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নেই। যদি কোনো উদ্দেশ্য থাকে, তাও উদ্ভট রকমের, যেমন ছায়াবাজীর ধামাহাতে ঐ দাড়িমুখো বুড়োটা বলছে—

"ছায়া ধরার ব্যবসা করি তাও জান না বুঝি!
রোদের ছায়া চাঁদের ছায়া হরেক রকম পুঁজি।

চিলগুলো যায় দুপুর বেলায় আকাশ পথে ঘুরে,
ফাঁদ ফেলে তার ছায়ার উপর, খাঁচায় রাখি পুরে।

কেউ যবে তার রয় না কাছে, দেখতে নাহি পায়,
গাছের ছায়া ছটফটিয়ে ইদিক উদিক চায়।
সেই সময় গুড়গুড়িয়ে পিছন হতে এসে
ধামায় চেপে ধপাস্ করে ধরবে তারে ঠেসে।
পাৎলা ছায়া, ফোকলা ছায়া, ছায়া গভীর কালো—
গাছের চেয়ে গাছের ছায়া সব রকমেই ভালো।"

এখন এই সব ভালো ভালো ছায়া নিয়ে করা হবেটা কি? এত কষ্ট করে এদের সংগ্রহ করে শেষটা কি সব নষ্ট হবে? তা মোটেই

নয় ; বুড়ো এসব দিয়ে ওষুধ বানাবে—

"গাছগাছালি শেকড় বাকল মিথ্যে সবাই গেলে,
বাপরে বলে পালায় ব্যামো ছায়ার ওষুধ খেলে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে আজগুবির যে একেবারেই কোন উদ্দেশ্য নেই তাও নয়। মহুয়াগাছের মিষ্টি ছায়া ব্লটিংপেপার দিয়ে শুষে যদি ওষুধ বানিয়ে, শিশিতে পুরে, চোদ্দ আনায় বিক্রি করা যেত কি ভালোটাই না হোত।

আজগুবির জগতের বাসিন্দারাও একটু অদ্ভুত—ট্যাঁশ গোরু, যদিও সে গরু নয়, আসলে সে পাখি ; খুঁৎখুঁতে জানোয়ার যাকে সব কিছু দিয়ে, মায় হাতির শুঁড়, ক্যাঙগারুর ঠ্যাং, গোসাপের ল্যাজ, পাখিদের ডানা, সব দিয়েও তবু খুশি করা গেল না ; হুঁকোমুখো হ্যাংলা, দুটি মোটে ল্যাজ থাকাতেই যার কাল হয়েছে ; এদের কাছে কি সাধারণ নিয়মকানুন খাটে কখনো ? তাছাড়া সেসব দিয়ে হবেই বা কি ? কবি বলছেন,

"বেজার হয়ে যে যার মতো করছ সময় নষ্ট,
হাঁটছ কত, খাটছ কত, পাচ্ছ কত কষ্ট।
আসল কথা বুঝছ না যে, করছ না যে চিন্তা,
শুনছ না যে গানের মাঝে তবলা বাজে ধিন্‌তা ?
পাল্লা ধরে গায়ের জোরে গিটকিরি দাও ঝেড়ে,
'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম। দেড়ে দেড়ে দেড়ে'!"

একজন ইংরেজ কবি লিখেছিলেন যে দেবতারা গাছের পাতার মর্মর-ধ্বনিতে, নদীর জলের কল-কল্লোলে, নিজেদের মধ্যে আলাপ করেন, কবি তারি কিছু কিছু শুনতে পান।

"And the poet who overhears
Some random words they say
Is the fated man of men,
Whom the ages must obey."

সুকুমারও এই দলেরই fated man of men, যার কথা একবার শুনলে, লোকে সহজে ভুলতে পারে না। কারণ তার মধ্যে পার্থিব দুঃখ-হতাশার ফাঁকে ফাঁকে চিরন্তন হাসির সুরের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

ছোট্ট ছোট্ট ছড়া আছে সুকুমারের যেন এককেটি রত্ন। এমনিতেই তাঁর মুখে আপনা থেকেই যখন তখন ছড়া ফুটত ; জাহাজে চড়ে চড়িভাতি

করতে যাওয়া হচ্ছে, ডেকে দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন, একে একে যেমন বন্ধুবান্ধবরা এসে জুটছেন, অমনি ছড়া—

"মাঘোৎসবের স্টীমার পার্টি মস্ত মজার ব্যাপার,
জ্বোরো রুগী চলল ক্ষেপে মাথায় বেঁধে র‍্যাপার।
খাবার দাবার নিয়ে সবাই উঠল না'য়ে চেপে,
মংলু এল শিং বাগিয়ে, জংলু গেল ক্ষেপে।"

খসড়া খাতায় মণ্ডে ক্লাবের সম্পাদকের হয়ে মিটিং-এর নোটিশ লিখছেন। এখানে একটু বলে রাখা দরকার যে মণ্ডে ক্লাবের সম্পাদক মশাই কিছুদিনের জন্য কলকাতার বাইরে যেতেই সভ্যের দল যা মন চায় করতে লাগলেন। তারপর যখন সেক্রেটারি ফিরে এসে মিটিং ডাকলেন, সুকুমার তাঁর হয়ে লিখলেন,

"আমি অর্থাৎ সেক্রেটারি
মাস তিনেক কলকাতা ছাড়ি
যেই গিয়েছি অন্য দেশে,
অমনি কি সব গেছে ফেঁসে।
বদলে গেছে ক্লাবের হাওয়া,
কাজের মধ্যে কেবল খাওয়া!
চিন্তা নেইকো গভীর বিষয়,
আমার প্রাণে এসব কি সয়?
এখন থেকে সমঝে রাখো, এ সমস্ত চলবে নাকো
আমি আবার এইছি ঘুরে, তান ধরেছি সাবেক সুরে
মঙ্গলবার আমার বাসায়, আর থেকো না ভোজের আশায়,
শুনবে এসো সুপ্রবন্ধ
গিরিজার বিবেকানন্দ।"

অন্য লোকের মুখে যেমন কথা ফোটে, সুকুমারের মুখে ছড়া ফুটত তেমনি অবলীলাক্রমে। ছোট কবিতার দু-চারটি নমুনা দিই—

"আকাশের গায়ে কিবা রামধনু খেলে,
দেখে চেয়ে যত লোক সব কাজ ফেলে।
তাই দেখে খুঁৎধরা বুড়ো কয় চ'টে,
দেখছ কি, এ রং পাকা নয় মোটে।"

আরো আছে,

"কহ ভাই কহরে অ্যাঁকাচোরা শহরে,
বদ্যিরা কেন কেউ আলুভাতে খায় না ?
লেখা আছে কাগজে, আলু খেলে মগজে
ঘিল যায় ভেস্তে, বুদ্ধি গজায় না।"

কিম্বা,

"শুনেছ কি বলে গেছে সীতানাথ বন্দ্যো ?
আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ ?
টক টক থাকে নাকো যদি হয় বৃষ্টি,
তখন দেখেছি চেটে একেবারে মিষ্টি !"

এসব শুনলে কার মন না ভালো হয়ে যায় ?

পুনরায় সুকুমারের পরিস্থিতি পরিকল্পনার কথায় ফিরে আসা যাক। এই প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করা যায় যে সাধারণত হিউমারের মধ্যে যে অপ্রত্যাশিতের অংশ থাকে, সে-ই হয় পরিস্থিতি রচনার প্রধান অবলম্বন। বে-মানান ও বে-ফাঁস এর মূল উপাদান ; অসামঞ্জস্য ও অপ্রাসঙ্গিকতা এক্ষেত্রে কাম্যবস্তু।

এই অপ্রত্যাশিত গুণটি আবার দু-রকম হতে পারে ; পাঠক বা দর্শকের অপ্রত্যাশিত, কিম্বা রচনার নায়কের অপ্রত্যাশিত। সার্কাসের পালোয়ান কোমর বেঁধে, জাহাজের কাছির মতো মোটা একটা দড়ি ধরে হেঁইও হেঁইও করে রঙ্গমঞ্চে টেনে আনল কাকে—না, একটা কুকুর বাচ্চাকে। দর্শকরা এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে হেসে গড়াগড়ি। আবার এমনও হতে পারে যে অবস্থাটা দর্শকদের কাছে মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু নায়কের কাছে অপ্রত্যাশিত। যেমন ছোটবেলায় একবার খেলার প্রতিযোগিতায় দেখেছিলাম চোখ বাঁধা অবস্থায় obstacle race হচ্ছে। যারা যোগ দিচ্ছে, চোখ বাঁধার আগে তাদের সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে, দৌড়ের পথের obstacle বা বাধাগুলোকে মুখস্থ করে নিতে বলা হল। হয়তো প্রথমে কয়েকটা বড় বড় কাচের বোতল, দশ পা পরেই এক উল্টোনো চেয়ার, তারপর বালিশের স্তূপ, তারপর একটা ক্যানেস্তারা—এইরকম। সবাই দেখে স্থির করে নিল কোনটা কি ভাবে ডিঙোতে হবে। তারপর যেই না চোখ বাঁধা হয়ে গেল, অমনি পাশে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা নিঃশব্দে বাধাবিঘ্নগুলোকে সরিয়ে নিয়ে, পথ খোলসা করে দিল। কিন্তু প্রতিযোগীদের কাছে সেটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, কাজেই তারা খোলা পথ পেয়েও শূন্যে

মহালম্ফঝম্ফ করতে লাগল। দর্শকদের হাসতে হাসতে চোখে জল। রস-সাহিত্যেও অপ্রত্যাশিতের এই দুই প্রয়োগ দেখা যায়।

আবোল-তাবোলের 'চোর ধরা'-র জবরদস্ত নায়ক যেমন অপ্রত্যাশিত পরিণাম থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না; কিম্বা 'কি মুস্কিল' কবিতার নায়কের হাতের কেতাবে দুনিয়ার যাবতীয় তথ্য লেখা থাকা সত্ত্বেও, অপ্রত্যাশিত ষাঁড়ের আগমনের ক্ষেত্রে কোনো বিধান নেই—

"সাবান কালি দাঁতের মাজন বানাবার সব কায়দাকেতা,
পূজা-পার্বণ তিথির হিসাব শ্রাদ্ধবিধি লিখছে হেতা।
সব লিখেছে কেবল দেখা পাচ্ছিনেকো লেখা কোথায়
পাগলা ষাঁড়ে করলে তাড়া কেমন করে ঠেকাব তায়।"

তখন ষাঁড়ের দূরত্ব কিন্তু তিন হাত পশ্চাতে। ছবি থেকে সেটা প্রকট হচ্ছে।

এ ধরনের প্রয়োগে কবি আগে থাকতেই পাঠককে মজার ব্যাপারটা জানিয়ে দেন, বিশেষত নায়ককে জানাবার আগে। আবার উল্‌টোটিও দেখা যায়, যেখানে কবিতার পরিণাম পাঠকের কাছে অপ্রত্যাশিত বলেই রস জমেছে। 'নেড়া বেলতলায় যায় কবার' কবিতাটির কথাই ধরা যাক। রাজাকে কিছুতেই বাগ মানানো যাচ্ছে না, গরম জামা এঁটে, ঠা-ঠা রোদে, তেতে ওঠা ইঁটের গাদায় বসে স্লেট আঁকড়ে ঘেমে নেয়ে উঠছেন, তবু প্রশ্নের কোনো উত্তর পাচ্ছেন না। "লেখা আছে পুঁতির পাতে, নেড়া যায় বেলতলাতে, নাহি কোনো সন্ধ তাতে, কিন্তু প্রশ্ন কবার যায়?" রাজার বুদ্ধির বহর দেখে পাঠক একরকম মনে করে আছেন। এমন সময় রোগা এক ভিস্তিওলা ঢিপ্‌ করে বাড়িয়ে গলা রাজার পায়ে প্রণাম করে,

"হেসে বলে—আজ্ঞে সে কি? এতে আর গোল হবে কি?
নেড়াকে তো নিত্য দেখি আপন চোখে পরিষ্কার।
আমাদের বেলতলা সে, নেড়া সেথায় খেলতে আসে,
হরে দরে হয় তো মাসে নিদেনপক্ষে পঁচিশ বার!"

এই অপ্রত্যাশিত সমাধান পাঠক মুচকি হেসে পকেটস্থ না করেই বা করেন কি?

বারো

আরেকটা কবিতায় ভালো জিনিসের ফর্দ আছে।

"দাদাগো দেখছি ভেবে অনেক দূর
এ দুনিয়ায় সকল ভালো।
আসল ভালো নকল ভালো
সস্তা ভালো দামীও ভালো
তুমিও ভালো আমিও ভালো

ঠেলার গাড়ি ঠেলতে ভালো
খাস্তা লুচি বেলতে ভালো
গিটকিরি গান শুনতে ভালো
শিমুল তুলো ধুনতে ভালো,
ঠাণ্ডা জলে নাইতে ভালো
কিন্তু সবার চাইতে ভালো
—পাঁউরুটি আর ঝোলা গুড়।"

শেষ লাইনটা পড়ে পাঠক তো অবাক।

নিছক যা আজগুবী, সে চিরকালই আমাদের অনভ্যস্ত ও অপ্রত্যাশিত, কি লেখাতে, কি ছবিতে। বোম্বাগড়ের রাজা যে ছবির ফ্রেমে আমসত্ত্ব ভাজা বাঁধিয়ে রাখে, তার মানেটা কি? সিংহাসনে শিশি বোতলই বা ঝোলায় কেন, তাও আস্ত শিশি নয়? রাজার পিসি নেহাৎ ক্রিকেটই যদি খেলেন তো কুমড়ো দিয়ে কেন? তারপর কুমড়ো পটাসের কথাই ধরা যাক। সে নাচল কি কাঁদল, কি হাসল কি ছুটল কি ডাকল, তাতে আমাদের কি? তবে কি এ কথাই সত্যি যে রসের রাজ্যে আমাদের সাধারণ বুদ্ধি অচল?

সাধারণ বুদ্ধি অচল বলে ছেড়ে দিলেই হল না। আসলে এসব কবিতা আমাদের প্রতিদিনকার চেনা জগতের মুখের উপর একটা রোমাঞ্চময় অচেনার মুখোশ এঁটে দেয়; যা সচরাচর কিম্বা কোনোকালেই হয় না, তার সম্ভাবনায় মনটাকে খুশি করে তোলে।

এতই খুশি করে দেয় যে আবোল-তাবোলের অনেক কথা, অনেক চরিত্র আজ প্রবাদবাক্যের মতো মুখে মুখে ফেরে। বইয়ের নতুন সংস্করণ বেরোলেই ফুরিয়ে যায়। তা আর যাবে না, আর কোথায় লেখা আছে ভূতের মা ভূতের ছানাকে কি বলে আদর করে!

"বলছে আবার—আয়রে আমার নোংরামুখো সুঁটকোরে,
দ্যাখ্‌না ফিরে প্যাখ্‌না ধরে হুতোমহাসি মুখ করে।
ওরে আমার বাঁদর নাচন আদর গেলা কোঁৎকা রে,
অন্ধবনের গন্ধগোকুল ওরে আমার হোঁৎকারে!
ওরে আমার গোবরা গণেশ ময়দাঠাসা নাদুসরে,
ছিচ্‌কাঁদুনে ফোকলা মাণিক ফের যদি তুই কাঁদিস্ রে।
এই না বলে যেই মেরেছে কাদার চাপটি ফট করে,
কোথায় বা কি ভূতের ফাঁকি, মিলিয়ে গেল চট্ করে!"

পাঠকের মন খুশি হয়ে ওঠে, এমন চমৎকার যোগাযোগ, এমন খাসা ভুতুড়ে সামঞ্জস্য আর কোথায় আছে?

আবোল-তাবোলের জন্য সুকুমার তাঁর হাসির কবিতাই বেছে দিয়েছিলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর গাম্ভীর্যের দিকটাও যে কবিতায় প্রকাশ পেত তাতে আর আশ্চর্য কি? 'খাই-খাই' বইখানিতে হাল্কা সুরে লেখা অনেকগুলি গম্ভীর ভাবের কবিতা স্থান পেয়েছে। এসব কবিতার মধ্যেও কিন্তু মাস্টার মশাই সেজে শিক্ষা দেবার কোনো প্রত্যক্ষ চেষ্টা নেই, শিক্ষা যদি থাকে সেটা পরোক্ষ ভাবেই আছে। তার বদলে বরং কেবলি মনে হয় রঙ্গমঞ্চের পিছনে যে একটা হাল্কা পর্দা ঝুলছে, দমকা বাতাস লেগে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে যদি সেটা উড়ে যায়, অমনি প্রকাশ পাবে তার পিছনে ভারি মজার এক রাজ্য। এমনিতেই পাতলা পর্দার ভিতর দিয়ে ওদিককার আলো দেখা যাচ্ছে, কানে আসছে একটা অস্ফুট হাসির গুঞ্জন। অভাবনীয়ের যেন এটা পূর্বাভাস, ইংরেজীতে যাকে একটা suggestive quality বলে।

'বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই'-এর মতো কবিতা বাংলা সাহিত্যে আর আছে কিনা সন্দেহ। শখের বোটে বাবুমশাই চলেছেন, মাঝিটা একেবারে আকাট মুখ্যু, চাঁদ কেন বাড়ে কমে, জোয়ার কেন আসে কিছুই জানে না। বাবু বলেন—'জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি আনাই মাটি!' নদী কি করে নেমে আসে, সাগরের জলে নুন কেন, তাও ব্যাটা

কিছু জানে না। বাবু বলেন—'জীবনটা তোর নেহাত খেলো, আট আনাই ফাঁকি।' আকাশ কেন নীল, চাঁদে সর্যে গ্রহণ লাগে কেন, এসব বিষয়ে লোকটার কোনো ধারণাই নেই। বাবু বলেন—'দেখছি এখন জীবনটা তোর বারো আনাই বৃথা।'

এমন সময় ঝড় উঠল, নৌকো দুলল—

"মাঝি শুধায়—সাঁতার জানো ?—মাথা নাড়েন বাবু।
মূর্খ মাঝি বলে—মশাই, এখন কেন কাবু ?
বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব কর পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোল আনাই মিছে।"

বর্ণমালাতত্ত্বের শুরুতে ঐ যে কথাগুলি সুকুমার লিখেছিলেন :—

"পড় বিজ্ঞান হবে দিকজ্ঞান ঘুচিবে পথের ধাঁধা,
দেখিবে গুণিয়া এ দীন দুনিয়া নিয়ম নিগড়ে বাঁধা।"

ঐ কথা ঘুরেফিরে তাঁর মনে গুঞ্জন করত। নিয়মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা থাকলে নিয়ম-হারা হিসাবহীনের কারবার করা সম্ভব নয় এ কথা আগেও বলা হয়েছে। খাই-খাইয়েও সেই একই চিন্তা, 'বর্ষ আসে বর্ষ যায়' কবিতাটিতে পৃথিবীর বিষয়ে কবি বলছেন,

"না জানি কোন নেশার ঝোঁকে যুগযুগান্ত ধরে
ছয়টি ঋতুর দ্বারে দ্বারে পাগল হয়ে ঘোরে।
না জানি কোন ঘূর্ণিপাকে দিনের পর দিন,
এমন করে ঘোরায় তারে নিদ্রাবিরাম হীন।
কাঁটায় কাঁটায় নিয়ম রাখে লক্ষ যুগের প্রথা,
না জানি তার চালচলনের হিসাব রাখে কোথা।"

'এ কেমন কারবার'-এ আছে,

"কবে যে দিয়েছে চাবি জগতের যন্ত্রে,
সেই দমে আজও চলে না জানি কি মন্ত্রে।
পাকে পাকে দিনরাত ফিরে আসে বার বার,
ফিরে আসে মাস-ঋতু—এ কেমন কারবার।"

সেই অদৃশ্য কারবারির হাতে পরম নিশ্চিন্তে দুনিয়াকে ও নিজেকে ছেড়ে দিয়ে কবি বলছেন,

"মেঘমুলুকে ঝাপসা রাতে,
রামধনুকের আবছায়াতে,

তালবেতাল খেয়াল সুরে,
তান ধরেছে কণ্ঠ পুরে।
হেথায় নিষেধ নাইরে দাদা,
নাইরে বাঁধন নাইরে বাধা।
হেথায় রঙিন আকাশতলে
স্বপন দোলা হাওয়ায় দোলে,
সুরের নেশার ঝরণা ছোটে,
আকাশ কুসুম আপনি ফোটে ;
রঙিয়ে আকাশ রঙিয়ে মন,
চমকে জাগে ক্ষণে ক্ষণ।"

মনের খুঁটি যার শক্ত করে গাড়া আছে, আজগুবীর দেশের পাগলা ঘোড়ায় চাপতে তার ভয়টা কিসের ?

ছত্রিশ বছরের জীবনের শেষ দুটি বছর রোগশয্যায় কেটেছিল সুকুমারের ; মনে মনে বুঝেছিলেন তাঁর দিন ফুরিয়েছে, যাবার জন্য নিজেকে তাই প্রস্তুত করেছিলেন। এই সময়ের রচনা "অতীতের ছবি"-তে তাঁর হৃদয়ের যে গোপন বিশ্বাস চিরকাল তাঁর কলমে বল জুগিয়েছিল, তার দেখা পাওয়া যায়। কবিতা আরম্ভ হচ্ছে,

"অজর অমর অরূপ রূপ,
নহি আমি এই জড়ের স্তূপ।
দেহ নহে মোর চির নিবাস
দেহের বিনাশে নাহি বিনাশ।"

অকাল মৃত্যু আরেক দিক দিয়ে তাঁর মনের বিকাশ স্তব্ধ করে দিয়েছিল, যার জন্য বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ; অসম্পূর্ণ রচনা "বর্ণমালাতত্ত্ব" তারি নিদর্শন। বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের প্রয়াস আর দেখা গেছে বলে শুনিনি। সাধারণ পাঠকের ধারণা যে কোনো ভাষার বর্ণমালার বর্ণগুলির নিজস্ব কোনো অর্থ নেই ; কিন্তু অন্য বর্ণের সঙ্গে মিলিত হলে যে সব শব্দের সৃষ্টি হয়, তার অর্থ থাকার সম্ভাবনা আছে। তাও যেমন তেমন ভাবে একসঙ্গে করে কটা বর্ণ গেঁথে দিলেও চলবে না, এখন লোকে যাই বলুক না কেন, গোড়ায় ব্যাকরণের ছাড়পত্র না পেলে, শব্দের কোনো অর্থলাভ হত কিনা সন্দেহ। 'বর্ণমালাতত্ত্ব' পড়লে এ ধারণাকে অ-পক্ক ও অসম্পূর্ণ মনে হয়। বর্ণের যে অর্থ না থাকলেও

একটা ইঙ্গিত থাকে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা সে কথা মানেন। সেই ইঙ্গিতগুলি এখানে কবির হাতে ধরা দিয়েছে।

স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণকে আলাদা তাৎপর্য দিয়েছেন কবি, কিন্তু আলাদা হলেও, পরস্পরকে নইলে তাদের চলে না।

"স্বর ব্যঞ্জন যেন দেহ মন, জড়েতে চেতন বাণী,
এক বিনা আর থাকিতে পারে না, প্রাণহারা যেন প্রাণী।"

স্বর ছাড়া ব্যঞ্জনকে যেমন উচ্চারণের সব স ‍াবনা সত্ত্বেও বোবা হয়ে থাকতে হয়, তেমনি ব্যঞ্জন ছাড়া স্বরও যেন অবলম্বন না পেয়ে অবয়বহীন হয়ে শূন্যে কেঁদে বেড়ায়। কবি লিখছেন,

"জাগে হাহুতাশ স্বরের বাতাস জড়ের বাঁধন ছিঁড়ি,
ফিরে দিশেহারা, কোথা ধ্রুবতারা, কোথা স্বর্গের সিঁড়ি!
অ-আ-ই-ঈ-উ-ঊ হাহা হিহি হুহু, হাল্কা শীতের হাওয়া,
অলখচরণ প্রেতের বলন নিঃশ্বাসে আসা যাওয়া,
খেলে কি না খেলে ছায়ার আঙ্গুলে, বাতাসে বাজায় বীণা,
অলস বিভোর, আফিঙের ঘোর, বস্তুতন্ত্রহীনা।"

একা স্বরবর্ণ বাতাসে ভেসে যায়, তাই ব্যঞ্জনকে দরকার হয়, কায়া দিয়ে তাকে ধরে রাখবে বলে।

"তবে আয় নেমে আয় জড়ের সভায় জীবনমরণ দোলে,
আয় নেমে আয় ধরণী ধূলায় কীর্তন কলরোলে,
আয় নেমে আয় কণ্ঠ বর্ণে কাকুতি করিছে সবে
আয় নেমে আয় কর্কশ ডাকে প্রভাতে কাকের রবে।"

এমনি করে মাথার মধ্যে বন্ধ ছিল যে জিজ্ঞাসা, সে উচ্চারণে মুক্তি পেল।

"আদিম তমসে প্রথম বর্ণ, কণক কিরণমালা,
প্রথম ক্ষুধিত বিশ্ব জঠরে প্রথম প্রশ্ন জ্বালা।
কহে—'কই, কেগো, কোথায়, কবেগো, কেন বা কাহারে ডাকি?'
কহে, 'কহ কহ কেন অহরহ কালের কবলে থাকি?'
কহে কানে কানে করুণ কূজনে, কলকল কত ভাষে,
কহে কোলাহলে কলহ কুহরে কাষ্ঠ কঠোর হাসে।"

ক-এর পালা শেষ করে কবি বলছেন,

"খালি কর্তালে কভু কীর্তন খোলে? খোলে দাও চাঁটি-পেটা!

নামাও আসরে কয়ের দোসরে, খেঁদেলো খেঁদেলো খেটা।
এখনো খোলেনি মুখের খোলস, এখনো খোলেনি আঁখি,
ক্ষণিক খেয়ালে পেখম ধরিয়া কি খেলা খেলিলি পাখি।
খোল করতালে, খোলসা খেয়ালে, খোল খোল খোল বলে,
শখের খাঁচার খিড়কি খুলিয়া খঞ্জ খেয়াল চলে।"

খ-এর পরে গ আসে—

"গগনে গগনে গোধূলি লগনে মগন গভীর গানে,
করে গমগম আগম নিগম গুরুগম্ভীর ধ্যানে।
গিরি গহ্বরে অগাধ সাগরে গঞ্জে নগরে গ্রামে,
গাঁজার গাজনে গোষ্ঠে গহনে গোকুলে গোকুলধামে।"

দুঃখের বিষয় চ-এর পালা শেষ করে কবিতাও শেষ হয়ে গেছে।

ভেরো

সুকুমারের কবিতাগুলি পড়ে কেবলি মনে হয় রস জমাতে হলে, তা সে যে-রসই হোক না কেন, শুধু পরিস্থিতি পরিকল্পনা, চিত্ররচনা বা ভাবব্যঞ্জনা যথেষ্ট নয়, তার যোগ্য ভাষা যোগাতে হবে। সুকুমারের রচনার ভাষাঃ পরিস্থিতির রসটিকে প্রকাশ করে, কিন্তু তার সংগে প্রতিযোগিতা করে না। সত্যিকার রস জমে সেখানে যেখানে ভাষা ভাবের বাহনমাত্র হয়ে থাকে, তাকে লংঘন করে যেতে চায় না। শোনা যায় ওস্তাদ অশ্বারোহীকে দেখলে ঘোড়া আর মানুষ দুটিকে আলাদা প্রাণী বলে মনে হয় না। এখানেও তাই, ভাব যতই অপ্রত্যাশিত, অদ্ভুত বা খেয়ালী হোক না কেন, ভাষা তাকে প্রকাশ করবে এমনি অবলীলাক্রমে যে, যে শুনবে তারি মনে হবে, তাই তো, এই ভাষার জন্যই তো এই ভাবটি অপেক্ষা করে ছিল। এক্ষেত্রে ভাষা কখনো নিজের অদ্ভুত-ত্ব দিয়ে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে, ভাবের ধারা থেকে তাকে ভ্রষ্ট করবে না।

ভাব যেখানে রস জমাতে বিফল হয়, শুধু সেইখানেই ভাষা নিজের চাতুরি দিয়ে ঘাটতি পূর্ণ করবার চেষ্টা করে। একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক বলেছিলেন—"মন যখন দেউলে হয়, লেখক তখন কথার খেলাতে

নামেন।" অবশ্য সাহিত্য জগতের কোনো সীমানা না থাকাতে, কথার খেলারো যথেষ্ট অবকাশ আছে। শুধু এইটুকু বলা চলে যে রস যেখানে অন্য তহবিলে জমা হচ্ছে, কথাকে সেখানে সংযম মেনে চলতে হয়। কিন্তু কথার খেলারো অনায়াসে চমৎকারিত্ব আছে; এবং স্থলবিশেষে কবিতায় সে অলঙ্কার হয়ে শোভা পায়। সুকুমারের বিখ্যাত কবিতা খাই-খাই এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শব্দ-কল্প-দ্রুম ও দাঁড়ের কবিতারো তুলনা হয় না। শব্দ-কল্প-দ্রুম শুরু হচ্ছে—

"ঠাস ঠাস দ্রুম দ্রাম, শুনে লাগে খটকা;
ফুল ফোটে? তাই বল, আমি ভাবি পটকা।
শাঁই শাঁই পন পন, ভয়ে কান বন্ধ,
ওই বুঝি ছুটে যায় সে ফুলের গন্ধ।

ঠুং ঠাং ঢং ঢং কত ব্যথা বাজেরে
ফটফট বক ফাটে তাই মাঝে মাঝেরে।
হৈ-হৈ মার মার বাপ্ বাপ্ চীৎকার,
মালকোঁচা মারে বুঝি? সরে পড় এইবার।"

দাঁড়ের কবিতাও মন্দ নয়।

"এক ছিল দাঁড়ি মাঝি, দাড়ি তার মস্ত,
দাড়ি দিয়ে দাঁড়ি মাঝি দাঁড়ে খালি ঘষত।
সেই দাঁড়ে এক দিন দাঁড়কাক দাঁড়াল,
কাঁকড়ার দাঁড়া দিয়ে দাঁড়ি তারে তাড়াল।
কাক বলে রেগে মেগে বাড়াবাড়ি ঐ তো।
না দাঁড়াই দাঁড়ে তবু দাঁড়কাক হই তো।
ভারি তোর দাঁড়িগিরি; শোন্ বলি তবে রে,
দাঁড় বিনা তুই ব্যাটা দাঁড়ি হোস্ কবে রে?

দূর দূর ছাই দাঁড়ি, দাঁড়ি নিয়ে পাড়ি দে।
দাঁড়ি বলে—বাস্ বাস্ ঐখানে দাঁড়ি দে।"

'খাই-খাই'-এর স্থান আরো উঁচুতে, শুধু কথার খেলার জন্য নয়, এর প্রসাদগুণের তুলনা হয় না।

"খাই-খাই কর কেন, এসো বস আহারে,

খাওয়াব আজব খাওয়া ভোজ কয় যাহারে।
যত কিছু খাওয়া লেখে বাঙালীর ভাষাতে,
জড়ো করে আনি সব, থাক সেই আশাতে।
ডাল ভাত তরকারি ফলমূল শস্য
আমিষ ও নিরামিষ, চর্ব ও চোষ্য।"

তা ছাড়া আরো খাওয়া আছে,

'টোল খায় ঘটিবাটি, দোল খায় খোকারা,
ঘাবড়িয়ে ঘোল খায় পদে পদে বোকারা।
আকাশেতে কাৎ হয়ে গোঁত খায় ঘুড়িটা,
পালোয়ান খায় দেখ ডিগবাজি কুড়িটা—" ইত্যাদি।

বর্ণমালাতত্ত্বের অনুপ্রাসের প্রাচুর্যের কথা না বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করা যায় না। একটু শুনলেই কান তার চমৎকারিত্ব আপনি ধরে নেবে, কোনো ব্যাখ্যানার প্রয়োজন নেই।

"আধো আধো ভাষা আলেয়ার আসা, আপনি আপন হারা,
আদিম আলোতে আবছায়া পথ, আকাশ গঙ্গা ধারা,
ইচ্ছা-বিকল ইন্দ্রিয়-দল, জড়িত ইন্দ্রজালে,
ইসারা আভাসে ঈঙ্গিতে ভাষে, রহ-রহ ইহকালে।
কেন ইতিউতি, উতলা আকৃতি, উসখুস উঁকিঝুঁকি,
উড়ে উচাটন, উড়ুউড়ু মন, উদাসে ঊর্ধ্বমুখী।"

আরো আছে,

"কবি কল্পনে কাব্যে-কলায় কাহারে করিছ সেবা?
কুবের কেতনে কুঞ্জ কাননে কাঙাল কুটিরে কেবা?
কায়দা কানুনে কার্যে কারণে—কীর্তিকলাপ মূলে,
কেতাবে কোরাণে কাগজ কলমে কাঁদায়ে, কেরানী কুলে?
কথা কাঁড়ি কাঁড়ি, কত কানাকড়ি, কাজে কচু কাঁচকলা,
কভু কাছাকোছা, কোর্তা কলার, কভু কৌপিন ঝোলা?"

সত্যি কথা বলতে কি, কথার খেলার নিজস্ব যে রস, তাতে সুকুমারের খেয়ালী মন মাঝে মাঝে ডুব দিত।

তারপর তাঁর ছন্দোবৈচিত্র্যের কথা বলতে হয়। উপরের উদ্ধৃতিগুলিতে প্রতি পদের অষ্টাদশ অক্ষর চিত্তকে আকৃষ্ট না করে ছাড়ে না। অষ্টাদশ অক্ষরে, তাল না কেটে, কাব্যরচনা খুব সহজও নয়, খুব বেশি কবি চেষ্টাও

করেন না। সুকুমারের রচনায় ক্বচিৎ ছন্দোপতন হয়, বরং একথা বলা চলে যে মিলের অশুদ্ধি যদি বা চোখে পড়ে, ছন্দের দোষ খুঁজতে হয়।

কুড়ি অক্ষরের লাইনেও ছন্দ নিখুঁত—

"চলে খচখচ রাগে গজগজ জুতা মচমচ তানে,
ভুরু কটমট, ছড়ি ফটফট, লাথি চটপট হানে।
দেখে বাঘ রাগ লোকে ভাগ ভাগ করে আগবাগ থেকে,
ভয়ে লাফঝাঁপ বলে বাপ বাপ সব হাবভাব দেখে।"

সহজ ছন্দগুলির কি মোলায়েম স্রোত,

"ঠাকুরদাদার চশমা কোথা ?
ওরে গণ্‌শা, হাবুল, ভোঁতা,
দেখ্‌ না হেথা, দেখ্‌ না হোথা,
খোঁজ্‌ না নিচে গিয়ে।
কই কই কই ? কোথায় গেল ?
টেবিল টানো, ডেস্কো ঠেল,
ঘর দোর সব উল্টে ফেল,
খোঁচাও লাঠি দিয়ে ॥"

ছন্দের যিনি রাজা তিনি ছন্দকে কখনো একঘেয়ে হয়ে যেতে দেন না।

"কেন সব কুকুরগুলো খামোকা চেঁচায় রাতে ?
কেন বল দাঁতের পোকা থাকে না ফোকলা দাঁতে ?
পৃথিবীর চ্যাপটা মাথা, কেন সে কাদের দোষে ?
—এসো ভাই চিন্তা করি দুজনে ছায়ায় বসে !"

এসবের সঙ্গে তুলনা করলে সুকুমারেরই লেখা গানের পদগুলি কানে আরো মধুর হয়ে ধরা দেয়।

"প্রেমের মন্দিরে তাঁর আরতি বাজে,
মিলন মধুর রাগে জীবন মাঝে,
নীরব গানে গানে পুলক প্রাণে প্রাণে,
চলেছে তাঁরি পানে অরূপ সাজে,
পুণ্য মধুর ভাতি, পূর্ণ মধুর রাতি
মধুর স্বপনে সাজি, মধুর রাজে।"

লাভ-ক্ষতির হিসাব রাখেন নি এই কবি। জীবনের ছত্রিশটা বছর রঙ দিয়ে সুর দিয়ে ভরে রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর ঐ যে খসড়ার

খাতার কথা আগেও বলা হয়েছে, তাতে এই লাইনগুলি লেখা আছে ঃ—

"বলে গেছেন চণ্ডীপতি কিম্বা অন্য কেউ,
আকাশ জুড়ে মেঘের বাসা সাগর ভরা ঢেউ।
জীবনটাও তেমনি ঠাসা কেবল বিনা কাজে,
যে দিক দিয়ে খরচ করি সেই খরচই বাজে।
আমি অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ চলতে ফিরতে শুতে,
জীবনটাকে হাঁকাই নে কো মনের রসে জুতে।"

ইংরেজ লেখকের মতে, কবিতা হল a criticism of life, অর্থাৎ বেঁচে থাকার উপর একটি মন্তব্য, কিম্বা জীবনের সমালোচনা। উপরের ঐ কটি কথায় সুকুমারও তাঁর মন্তব্য দিয়েছেন।

চোদ্দ

১৯১৩ সাল থেকেই সন্দেশের পাতার মধ্য দিয়ে বাংলা দেশের ছেলেমেয়েরা সুকুমারকে চিনত। মাসের গোড়ায় যেই না সন্দেশখানি হাতে পেল, অমনি সবার আগে শেষের দিকটা দেখা হত। না জানি এবার আবোল-তাবোলের কি লেখা কি ছবি বেরুল। তাঁর ছোট গল্পগুলিও কম উল্লাসের সৃষ্টি করে নি। এর আগে যে বাংলার ছোট ছেলেরা হাসির খোরাক একেবারে পায় নি এমন নয়। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের অপূর্ব কবিতার অনাবিল হাস্যস্রোতের সঙ্গে তাদের যথেষ্ট পরিচয় ছিল। কিন্তু এমন খেয়ালী ভাষায় এমন খেয়ালী লেখা বাংলা দেশে কে কবে লিখেছিল? তবে একেবারেই লেখে নি তাও নয়। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত কঙ্কাবতী ইত্যাদির কথা ভুলে গেলে চলবে না।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও এসে পড়ে; কঙ্কাবতীর গল্পের মোটামুটি ঘটনা ছোটদের উপযুক্ত করে বলা গেলেও, গল্পের মূল রসটি আদৌ শিশুদের জন্য নয়। অনেক বিচক্ষণ সাহিত্য রসিকের মতেই অনাবিল হাস্যরসে ভরা, উঁচুদরের খেয়ালী লেখা আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা সুকুমারের হাতেই প্রথম পেয়েছিল।

পূর্বেই বলা হয়েছে অবনীন্দ্রনাথের অপূর্ব খেয়ালী লেখার খেই ধরা সব সময় ছোটদের কর্ম নয়; সুকুমারের কাছে তারা পেল সহজ ভাষায় লেখা সহজবোধ্য স্বচ্ছ আজগুবি, যার মাথামুণ্ডু কিন্তু দিব্যি চেনা যায়। কোথাও এতটুকু অস্পষ্টতা বা কর্কশতা নেই; উদ্ভটত্ব থাকলেও সেটা বিভীষিকাময় নয়। এখানে সব কিছু অদ্ভুত কিন্তু উৎকট নয়, বেয়াড়া কিন্তু বিকট নয়, সৃষ্টিছাড়া কিন্তু ছন্দোময়।

সুকুমারের কাব্যরচনা বাদ দিলে যা বাকি থাকে, তার পরিমাণ খুব বেশি না হলেও তাঁর অল্প পরিসরের জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। ছোট গল্পের দুটি বই, পাগলাদাশু ও বহুরূপী; একটিমাত্র বড় গল্প হ-য-ব-র-ল; একখানি নাটক সংকলন আর বর্ণমালাতত্ত্বের মধ্যে গ্রথিত বিবিধ প্রবন্ধ। যদিও এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যরত্নের মধ্যে তরুণ কবিদের লেখা অনেক সৃষ্টিই আছে। শেলি কীটসের রচনাসম্ভার এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এমন কি শেক্সপীয়রও তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকের প্রায় সবগুলিই চল্লিশের কোটায় পদার্পণ করার আগেই লিখেছিলেন, তবু গদ্য রচনার বেলায় অন্যরূপ মনে হয়। কিছুদিন শিক্ষানবিশী এবং অভ্যাস না করলে এক্ষেত্রে সাধারণতঃ হাত পাকে না। সুকুমারের গদ্যরচনাও নিঃসন্দেহ সময় পেলে আরো পাকা চেহারা নিত; তবু সেগুলিতে যে স্থিরদৃষ্টি ও গভীর চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়, বয়সের কথা চিন্তা করলে সেটা কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর।

সমরসেট মমের মতে কাব্যের আবেদন চিরন্তন, কিন্তু গদ্যের আবেদন মাত্র দুই পুরুষব্যাপী। তার কারণ হল যে গদ্য সাধারণতঃ বাস্তবজীবনকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। যার প্রধান উপকরণই বাস্তবজীবন, তার মর্মকথাটি চিরন্তন হলেও, যে পটভূমিকা ও ঘটনাবলীকে আশ্রয় করা হয় দুই পুরুষ কেটে গেলে সে-সবকে সেকেলে বলে মনে করা হয়। ততদিনে বাস্তবজীবনে নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে, অভিনব আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভাষার দিক থেকে বিচার করতে গেলেও, সচল সজীব না হলে গদ্যের ভাষা মনে সাড়া জাগাতে পারে না। যে ধরনের কথাবার্তা আজকাল কেউ বলে না গল্পে-প্রবন্ধেও তার ব্যবহার চলতে পারে না। গদ্যের ভাষাকেও সাধারণতঃ বর্তমানধর্মী হতে হয়। রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ উপন্যাস গোরাকে এখন আর তেমন চাঞ্চল্যকর বলেও মনে হয় না, সাধারণ

পাঠকেরা তেমন আগ্রহ করে পড়েও না। তার কারণ গোরার কাহিনীর মূলে যে সমস্যা, সেটিও বিগত যুগের। তাছাড়া কথোপকথনের ভাব ও ভাষাকে প্রায়ই একটু আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। গোরা রচনার সময় সামাজিক জীবনে মেয়েরা বড় একটা স্থান নিত না, কাজেই বয়স্ক অবিবাহিত প্রগল্‌ভ মেয়েদের বিষয়ে কবিগুরুর কল্পনা করতে কষ্ট হয়েছিল। ফলে ললিতা একটি এঁচোড়ে পাকা জ্যাঠা মেয়েতে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু শেষের কবিতার সময় সে রকম মেয়ের যুগ এসে পৌঁছেছিল। 'গোরা'য় তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়েদের মুখে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে যে রকম পাকা পাকা কথা কবি পুরেছেন, বর্তমান পরিবেশে সেসব কেউ বরদাস্ত করত না। ভেবে দেখলে এখন হাসি পায়। আগেকার অনেক বইয়েরই এই পরিণাম। কিন্তু হ-য-ব-র-ল বা শেষের কবিতার আদর সহজে কমে না। তার কারণ ছোটদের জন্য লেখা বই আর রসরচনা অনেকটা কাব্যধর্মী। কাব্যের সর্বজনীনতা ও চিরন্তন আবেদন তাদের মধ্যে দেখা যায়। ছোটদের গল্পের বিষয়বস্তুতেই একটা চিরকেলে ভাব আছে, যেমন সব দেশের উপকথাতে রূপকথাতে আছে। এসব কাহিনী স্থানকালপাত্রে ভেদ না রেখে, হৃদয়ের মূলে আঘাত করে।

ছোটদের গল্পের ভাষার মধ্যেও এমন একটা সাবলীল ভাব থাকে যে অনেক দিন ধরে সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। এমন কি 'কঙ্কাবতী'-র ভাষার সেকেলে ভাবটিও বড়ই উপভোগ্য।

তবে কঙ্কাবতী রূপকথা জাতীয় গল্প, বাস্তব জীবন ঘেঁষা গল্পের কথা আলাদা। তার ভাষাকে জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয়।

সুকুমারের 'পাগলা দাশু'-র কথাই ধরা যাক। বইয়ে আছে ২০টি গল্প, সবই স্কুলের ছেলেদের বিষয়। যদিও দু-একটি গল্পের অকুস্থল বাড়িতে, তবু পাত্ররা সকলেই হয় স্কুলে যায়, নয়তো শীঘ্রই যাবে। গুণেগুণে গুটি দুই গল্পে ছাড়া কোথাও কোনো স্ত্রীচরিত্রের অবতারণা নেই, যদিও দু-এক ক্ষেত্রে অন্তরালে মা কিম্বা দিদি অশান্তি ঘটাবার জন্য প্রস্তুত আছেন। গল্পের বিষয়বস্তুতে কালের ছাপ পড়েনি। কারণ স্কুলের ছোট ছেলেদের সমস্যা প্রায় সবই আবহমান কাল থেকে চলে আসছে; হয়তো সামান্য একটু ভোল বদলেছে। সেই বাড়ির সতর্ক প্রহরা, মাস্টারমশাইদের নির্মম কর্তব্যনিষ্ঠা, সেই পরীক্ষার দুশ্চিন্তা, প্রতিযোগিতার অনিশ্চয়তা, সেই যখন-তখন হাসিঠাট্টা ও তার অশুভ পরিণাম।

স্কুলের ছেলের মজাগুলোও চিরন্তন, তারো অবশ্য কিঞ্চিৎ এদিক-উদিক হয়েছে। তবু এখনো তারা খেলাধুলো, ম্যাজিক, নাটক ইত্যাদি দেখে সমান আনন্দ পায়। এখনো অদ্ভুত ছেলেরা হঠাৎ কোথা থেকে এসে ক্লাসে ভর্তি হয়; অবশ্য দাশুর মতো ছেলে খুব বেশি দেখা যায় না, তখনো যেত না। মোট কথা পাগলা দাশুর মালমশলা সহজে বদলাবার মতো নয়। সুকুমারের ভাষারো একটা নিজস্ব প্রাণশক্তি আছে, তার পক্ষেও সেকেলে হয়ে যাওয়া সহজ নয়। পুনর্মুদ্রণের সময়ে যদি এই সব গল্পের ক্রিয়াপদগুলিকে সামান্য একটু পরিবর্তন করে দেওয়া যায়, তাহলে কে বলবে তারা কালই লেখা হয়নি? বড় জোর মনে হতে পারে কিছুকাল আগেকার ঘটনা নিয়ে গল্প। টমাস হিউস্-এর 'টম ব্রাউন্স্ স্কুল ডেজ্' আজকাল কজন পড়ে? ওরকম ফেনিয়ে ফেনিয়ে ছোটদের জন্য আজকাল বই লেখা হয় না। সুকুমারের পাগলা দাশুর গল্প সংক্ষিপ্ত ও সচল। কুড়িটি গল্পের মধ্যে এগারোটির ক্রিয়াপদগুলি শুদ্ধ ভাষায় লেখা, যদিও কথাবার্তা সবই চলতি ভাষায়।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে গল্পগুলি চুয়াল্লিশ থেকে প্রায় চুয়ান্ন বছর আগের রচনা। তখন পরীক্ষার খাতায় শুদ্ধভাবে 'করিয়াছিল' 'খাইয়াছিল' না লিখলে নম্বর কাটা যেত। পণ্ডিতরা বলতেন রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ কথিত ভাষা চালাতে চেষ্টা করে বাংলা সাহিত্যের সর্বনাশ করছেন। তখনকার সন্দেশের তরুণ পাঠক পাঠিকাদের একদিন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে হত, সুতরাং কথিত ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে তাদের চলবে কেন? এই একটি বিষয় ছাড়া গল্পগুলির সুরটি এত বেশি আধুনিক যে পড়ে আশ্চর্য হতে হয়।

নমুনাস্বরূপ একটি গল্পের ক্রিয়াপদগুলিকে সামান্য বদলিয়ে সংক্ষেপে শোনাচ্ছি। এ লেখার রচনার তারিখ কে অনুমান করতে পারবে? তবে হ্যাঁ, ছেলেদের নামগুলো এখন আর চলবে না।

"কালাচাঁদ নিধিরামকে মেরেছে, তাই নিধিরাম হেডমাস্টার মশায়ের কাছে নালিশ করেছে। হেডমাস্টার এসে বললেন—'কি হে কালাচাঁদ, তুমি নিধিরামকে মেরেছ?' কালাচাঁদ বলল, 'আজ্ঞে না, মারব কেন? কান মলে দিয়েছিলাম, গালে খামচে দিয়েছিলাম আর একটুখানি চুল ধরে ঝাঁকিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলাম।' হেডমাস্টার বললেন, 'কেন ওরকম করেছিলে?' কালাচাঁদ খানিকটা আমতা-আমতা করে মাথা চুলকে

বলল, 'আজ্ঞে, ও খালি-খালি আমাকে চটাচ্ছিল।

পরে ছেলেরা কালাচাঁদকে চেপে ধরেছিল, চটাচ্ছিল আবার কি? শেষ পর্যন্ত নিধিরামই ব্যাপারটা খুলে বলল, "কালাচাঁদ একটা ছবি এঁকেছে; ছবির নাম খাণ্ডবদাহন। আমি বললাম—'এটা কি এঁকেছ? মন্দিরের সামনে শেয়াল ছুটছে।' কালাচাঁদ বলল—'না, না, মন্দির কোথায়? ওটা হল রথ, আর এগুলো তো শেয়াল নয়, রথের ঘোড়া।'

'সূর্যটাকে কালো করে এঁকেছ কেন? আর ঐ চামচিকেটা লাঠি নিয়ে ডিগবাজি খাচ্ছে কেন?'

'আহা তা কেন, ওটা তো সূর্য নয় সুদর্শন চক্র।···আর এই বুঝি চামচিকে হল? এটা তো গরুড় পাখি একটা সাপকে তাড়া করেছে।'

'তা হবে—আচ্ছা এক কাজ কর না, ওটাকে খাণ্ডবদাহন না করে, সীতার অগ্নিপরীক্ষা কর না কেন? গাছটাকে শাড়ি পরিয়ে সীতা করে দাও। রথটার মাথায় জটাজুটো দিয়ে অগ্নিদেব বানাও। কৃষ্ণ অর্জুন হবেন রামলক্ষ্মণ।······সুদর্শন চক্রে নাক-হাত-পা জুড়ে দিলেই বিভীষণ হয়ে যাবে।···চামচিকের পিছনে একটা লম্বা ল্যাজ দিয়ে,···ডানা দুটো মুছে দাও, ওটা হনুমান হবে।' কালাচাঁদ বলল, 'হনুমানও হতে পারে, নিধিরামও হতে পারে।' 'তাহলে ভাই এক কাজ কর। ওটাকে শিশুপাল-বধ করে দাও।······কৃষ্ণকে বদলাতে হবে না। অর্জুনের মুখে পাকা গোঁফদাড়ি দিয়ে খুব সহজেই ভীষ্ম করে দেওয়া যাবে। রথটা হবে সিংহাসন, তার উপর যুধিষ্ঠিরকে বসিয়ে দাও। ঐ যে গরুড় আর সাপ, ঐটে একটু বদলিয়ে দিলেই গদা হাতে ভীম হয়ে যাবে। শিশুপাল তো আছেই, গাছটায় একটু নাক মুখ ফুটিয়ে দিলেই হবে।'

কালাচাঁদ চটে বলল,······'থাক, থাক, অত বিদ্যে জাহির করে কাজ নেই।'

আমি বললাম, 'তা অত রাগ কর কেন ভাই? আমার কথামতো না করে, অন্য একটা কিছু কর না। মন কর ওটাকে সমুদ্রমন্থন করে দিলেও তো হয়। ধোঁয়া-ওলা গাছটা মন্দার পর্বত, রথটা ধন্বন্তরী কিম্বা লক্ষ্মী···সুদর্শন চক্রটা চাঁদ হতে পারবে, অর্জুনের পিছনে কতকগুলো দেবতা এঁকে দাও···আর চামচিকের দিকে কতকগুলো অসুর।···"

এই পর্যন্ত শুনে কালাচাঁদ যে নিধিরামকে পেটাবে, তাতে আর আশ্চর্য কি?

গল্পের কি সাল তারিখ হয় ?

ভালো ছোট গল্পের সব গুণই আছে এসব গল্পে। বাড়তি কথা নেই, অতিরিক্ত ঘটনা নেই, অনাবশ্যক ভূমিকা নেই, পাঠক প্রথম পদক্ষেপেই একেবারে গল্পের মধ্যে প্রবেশ করে। উপরন্তু লেখক নিজে এসে কোথাও নাক গলান না, বুড়োটে উপদেশ দেন না ; একেকটি গল্প যেন চাঁচাছোলা নিটোল একেকটি শিল্পকর্ম।

"বহুরূপী" আরেকটি ছোট গল্পের বই, কিন্তু এর গল্পগুলি একেবারে অন্য ধরনের, যেন রূপকথার মতো ; এখানেও সেই নিখুঁত মাত্রাজ্ঞান, বাড়তি একটি কথাও নেই। তেরোটি গল্প আর মাঝে মাঝে পাতার নিচের দিকে একেকটি খুদে কবিতা, কিন্তু সে কি কবিতা ! দুটো একটা বলি, যেমন—

'নন্দঘোষের শামলা গরু, ভাগল কোথায় লক্ষ্মীছাড়া,
নন্দ ছোটে বন বাদাড়ে, সন্ধানে যায় বদ্যি পাড়া।
শেষ কালেতে অর্ধরাতে হন্দ হয়ে ফিরলে পরে,
বাসায় দেখে ঘুমোয় গরু ল্যাজ গুটিয়ে, গোয়াল ঘরে।'

আর লেখকের নিজের হাতে আঁকা ছবি যেন সোনায় সোহাগা।

আরো আছে—

'জংলা বনে পাগলা বুড়ো আমায় এসে বলে,
আড়াই বিঘা সমুদ্রেতে কাঁঠাল কত ফলে ?
আমিও বলি আন্দাজেতে—বলছি শোন কত,
তোমাদের ঐ ঝিঙের খেতে চিংড়ি গজায় যত।'

এ বইয়ে নানারকম গল্প, নতুন গল্প, পুরনো গল্প, বানানো গল্প, শোনা গল্প, অন্য-দেশ থেকে ধার করা গল্প। ছোটদের গল্পের বিষয়বস্তুর চেয়েও যে গল্প বলাটা আসল জিনিস। এই বই তার আরেকটি প্রমাণ। যে গল্পের সাফল্য শুধু ঘটনার পরিণতির উপর নির্ভর করে, সে গল্প একবার পড়া হয়ে গেলেই শেষ হয়ে যায়। এমন কি অনেক সময় গল্পের শেষাংশটুকু আগে পড়ে ফেললে, বাকিটাতে আর কোনো রস পাওয়া যায় না। এসব হল দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্প। আজকালকার জনপ্রিয় রহস্য-রোমাঞ্চের কাহিনীর বেশির ভাগই এই ধরনের। জানা গল্প যদি বারে বারে পড়লেও, তাতে নব নব রসের আস্বাদ পাওয়া যায়, সেই হল সেরা গল্প। এই বইয়ের অনেক গল্পই তাই। ছোটরা এই গল্পই চায়, যা কিছুতেই পুরনো হয়

না, যার একটি কথাও বদলালে আপত্তির কারণ দেখা দেয়।

বহুরূপীর একটি ছোট গল্প সংক্ষেপে বলি,—

"রাজবাড়ি যাবার যে পথ, সেই পথের ধারে প্রকাণ্ড দেয়াল, সেই দেয়ালের একপাশে ব্যাঙদের পুকুর। একদিন সর্দার ব্যাঙ বড় বেশি উঁচুতে লাফ দিয়ে, দেয়াল ডিঙিয়ে রাজপথে পড়ে দেখে মাথায় মুকুট, গায়ে রঙিন পোশাক, চতুর্দোলায় চেপে, দেশের রাজা যাচ্ছেন আর লোকরা সব রাজা-রাজা-রাজা-রাজা বলে নমস্কার করছে। রাজামশাই খুশি হয়ে এর দিকে ওর দিকে তাকাচ্ছেন আর কেবলি হাসছেন। তাই দেখে সর্দারের বড় শখ হল ব্যাঙদেরো একজন রাজা থাকুক। রাজার জন্য দরখাস্ত করা হল। ব্যাঙ পুকুরের ব্যাঙ দেবতা, যিনি বাদলা দিনে বর্ষা মেঘের ঝাঁঝরি দিয়ে পুকুর ভরে জল ঢালেন······তিনি বললেন, 'এই নে রাজা!' বলে, মরা গাছের একখানা ডাল ভেঙে তাদের সামনে ফেলে দিলেন। ভাঙা ডাল পুকুরপাড়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার মাথার উপর মস্ত মস্ত ব্যাঙের ছাতা জোছনায় চকচক করতে লাগল। তাই দেখে ব্যাঙদের ফুর্তি আর ধরে না।

······কিন্তু শেষটা একদিন সর্দার ব্যাঙের গিন্নি বললে, 'এ রাজা নড়েও না চড়েও না, এদিকেও দেখে না ওদিকেও দেখে না, ছাই রাজা!' ······আবার দরখাস্ত হল, রাজা চাই, ভালো রাজা, নতুন রাজা। ব্যাঙ দেবতা এবার একটি বককে নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নে তোদের নতুন রাজা!'

ব্যাঙরা অবাক হয়ে বলতে লাগল—কি প্রকাণ্ড রাজা, চকচকে ধবধবে সাদা, ভালো রাজা, সুন্দর রাজা। রাজা, রাজা, রাজা, রাজা। দুঃখের বিষয় ভালো রাজাটি খিদে পেলেই একটি করে ব্যাঙ তুলে টুপ করে মুখে ফেলেন। সর্দার গিন্নি তাঁর সামনে গিয়ে বললেন, 'ও রাজা, তোর ভাগ্যি ভালো, তুই আমাদের রাজা হলি। তোর চোখ ভালো, মুখ ভালো, ঝক-ঝকে রঙ ভালো, তোর এক পা-ও ভালো দু পা-ও ভালো, কেবল ঐটি তোর ভাল নয়, তুই আমাদের খাস্ কেন? ·····ছ্যা ছ্যা ছ্যা ছ্যা রাম রাম রাম রাম অমন আর কক্ষনো করিস না।'

বক রাজা টপ করে সর্দার গিন্নিকে গিলে ফেললেন। তখন সবাই মিলে ব্যাঙ দেবতাকে বলতে লাগল···চাই না চাই না চাই না চাই না, রাজা চাই না, রাজা চাই না।

ব্যাঙ দেবতা বললেন—'আবার কি হল ?'

ব্যাঙরা কেঁদে পড়ল—'কি দুষ্টু রাজা, নিয়ে যাও ! নিয়ে যাও।' ব্যাঙ দেবতা হুস্ করে তাড়া দিতেই বকরাজা পাখা মেলে উড়ে গেল।"

পুরনো চেনা গল্প নতুন করে লেখা।

বাংলা ভাষায় ছোটদের জন্য লেখা আর সব বই থেকে আলাদা হল হ-য-ব-র-ল। একমাত্র লুইস্ ক্যারলের অ্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের সঙ্গে এর তুলনা হয়। নিন্দুকরা মাঝে মাঝে বলেন এ বইটা নাকি তার হুবহু নকল। কথাটা ঠিক নয়; তবে গল্পের অনুপ্রেরণা যে সেখান থেকেই এসেছে সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই; সেই গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়া, সেই অদ্ভুত বেড়াল, সেই মাথামুণ্ডু কথাবার্তা, সেই বড়দের ডাকে জেগে ওঠা।

সাদৃশ্য কিন্তু ঐ পর্যন্তই; 'হ-য-ব-র-ল'-র রসটি নিতান্ত নিজস্ব, সম্পূর্ণ দেশী ব্যাপার। এর আগেই বলা হয়েছে গল্পের চেয়ে গল্প বলাটা বড় কথা, এর বেলাতেও তাই। মোটামুটি গল্পটা শোনা যাক, তবে এমন আজগুবী গল্প সংক্ষেপে বলাই মুশকিল। একটা লম্বা শোভাযাত্রার প্রত্যেকটা লোক যদি আলাদা রকমের দেখতে হয়, আলাদা রকমের কিন্তু সমান অদ্ভুত কাণ্ড করে, তাহলে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া যেমন শক্ত ব্যাপার হয়, এ-ও তাই। কাকে বাদ দিয়ে কার কথা বলা যায়, সবাই সমান মজার। তবু গল্পটা শোনাই যাক।

গাছতলায় শুয়ে ঘাম মুছতে গিয়ে রুমাল খুঁজছি, রুমাল বললে ম্যাও। দেখি সেটা একটা লাল বেড়াল হয়ে গেছে; সে বললে, তাকে নাকি চন্দ্রবিন্দুও বলা চলে। তার কারণ সহজেই বোঝা যাচ্ছে, চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ আর রুমালের মা, হল চশমা। এর আর বোঝাবুঝির কি আছে। এখন কথা হল গরমের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে তিব্বত গেলেই হয়; খুব দূরও নয়, কলকাতা ডায়মণ্ডহারবার রানাঘাট তিব্বত, ব্যস! গেছো দাদার কাছে শুধু পথটা জেনে নিতে হয়। তাঁকে আবার ধরা মুশকিল, কোথায় যে কখন থাকেন তার ঠিক নেই। হিসাব কষে কাজ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত বেড়াল বললে, "চোখ বোজ; আমি যা বলব মনে মনে তার হিসেব কর।" যেই না চোখ বোজা অমনি বেড়ালও হাওয়া!

সঙ্গে সঙ্গে শ্লেট ও পেন্সিল সহ কাক্কেশ্বর কুচকুচে দাঁড়কাকের

আবির্ভাব ও হিসাব কষণ।

"সাত দুগুণে কত হয়?" বলা হল চোদ্দ। কাক্কেশ্বর বললে, "হয়নি, হয়নি, ফেল।" আমার ভয়ানক রাগ হল, "নিশ্চয় হয়েছে।" শেষ অবধি কাক মেনে নিল, "সাত দুগুণে—চোদ্দর নামে চার, হাতে রইল পেনসিল।"

এর পর গাছের ফোকর থেকে সুড়ুৎ করে হুঁকো হাতে দাড়িওয়ালা বুড়ো উদোর অবতরণ ও কাক্কেশ্বরের সঙ্গে হিসাব নিয়ে খ্যাঁচাখেঁচি। তার মধ্যে আমিও জড়িয়ে পড়লাম। ফিতে দিয়ে আমাকে মেপে বলে কিনা, ছাতিও ২৬ ইঞ্চি, খাড়াইও ২৬, গলাও ২৬, তবে কি আমি শুওর? দেখা গেল ফিতের সব দাগ মোছা, শুধু ২৬ টাই পড়া যাচ্ছে। তারপর বয়সের কথা হতে ওরা বললে, 'বাড়তি না কমতি?' সে আবার কি? না, ওদের বয়স নাকি চল্লিশ অবধি বাড়লেই মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, যখন কমতে কমতে দশে নামে, তখন ফের বাড়ায়। শুনে আমি অবাক। তারা বললে, 'তা না হলে বয়সটা বেড়ে বেড়ে আশী-নব্বুই হোক আর আমরা বুড়ো হয়ে মরি আর কি!'

তারপর বুধো এল, উদোর পিঠে বুধো চাপল। তারপর একটা জন্তু এল, মানুষ না বাঁদর না প্যাঁচা না ভূত কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না, সে খালি অদ্ভুত সব ব্যাপার কল্পনা করে আর বেজায় হাসে। জন্তুটার নাম হিজিবিজবিজ। তারপর বি-এ পাস ছাগল ব্যাকরণ সিং এসে তার দুঃখের কথা বলে খানিক কেঁদে নিল, এমন সময় ন্যাড়া এসে জোরজার করে তার কবিতা শোনাবেই। তার মধ্যে আবার একটা হল বাদুড় ও সজারুর বিয়ে। সজারুর গিন্নির কথাও আছে, নাকি চ্যাঁচামেচিতে তার ঘুম ভেঙে যেতেও পারে। তাই শুনে বাদুড় নাক সিঁটকে বলল—

"ঘুমোয় কি কেউ এমন ভুষো আঁধারে?
গিন্নি তোমার হোঁৎকা এবং হাঁদাড়ে।"

এই কবিতার কথা জানাজানি হতেই সজারু একটা মানহানি মোকদ্দমা ঠুসে দিল। হুতোম প্যাঁচা হল জজ, আগাগোড়া চোখ বুজে বসে রইল। কুমীর মামলা বাতলাল—মানহানি অর্থাৎ মান, তার মানেই কচু ইত্যাদি। সবাই জানতে চায় কোন্ কবিতা নিয়ে মামলা। ন্যাড়ার কবিতার তোড়া থেকে কুমীর ভুল-ভাল কবিতা পড়তে লাগল, শেষে ন্যাড়াই কবিতাটা বের করে দিল। তারপর সাক্ষী দরকার। চার আনা পয়সা দিয়ে

হিজিবিজ্‌বিজকে সাক্ষী মানা হল। সে বললে, "একজনের মাথার ব্যারাম ছিল, সে সব জিনিসের নামকরণ করত। তার জুতোর নাম ছিল অবিমৃষ্যকারিতা, তার ছাতার নাম প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তার গাড়ুর নাম পরমকল্যাণবরেষু, কিন্তু যেই না তার বাড়ির নাম রেখেছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অমনি ভূমিকম্প হয়ে বাড়িটাড়ি পড়ে গিয়েছে! হো হো হো হো।"

শেয়াল হল উকীল, সে বললে, 'হুজুর, এরা সব পাগল আর আহাম্মুক, এদের সাক্ষীর কোনো মূল্য নেই।' কুমীর রেগে বলল, 'কে বলল মূল্য নেই? দস্তুরমতো চার আনা পয়সা খরচ করে সাক্ষী দেওয়ানো হচ্ছে।'

এই সবের মধ্যে বিচার সভায় একটা গোলমাল দেখা দিল। জজ বললেন, 'সবাই চুপ কর; আমি মোকদ্দমার রায় দেব।' তা তো দেবেন, কিন্তু আসামী কই? ঐ যাঃ! আসামী তো নেই! ভুলিয়ে-ভালিয়ে অনেক কষ্টে ন্যাড়াকে আসামী খাড়া করা হল। সে ভেবেছে সাক্ষী যখন পয়সা পেল, সে-ও নিশ্চয় পাবে। জজ রায় দিলেন—ন্যাড়ার তিন মাস জেল আর সাত দিনের ফাঁসি!

এরকম অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাবার আগেই সব ধোঁয়া-ধোঁয়া হয়ে গেল, মেজোমামা আমাকে কান ধরে উঠিয়ে দিলেন—"ব্যাকরণ শিখবার নাম করে পড়ে ঘুমানো হচ্ছে ও—ও!"

এই তো হল গল্প; গল্পাংশ বলতে বিশেষ কিছু নেই; ঘটনার পারম্পর্য ও পরিণতি খোঁজা বৃথা, আজগুবীর দেশে সব কিছু আজগুবী নিয়মে চলে। তবে ঘটনা বা কথাবার্তা মোটেই এলোমেলো নয়, তার মধ্যে দিব্যি একটা পারিপাট্য আছে, এক-একজনা কথা শেষ করে আরেকজনের হাতে গুছিয়ে গল্পটি তুলে দিচ্ছে। অতিরিক্ত আড়ম্বর অনিশ্চয়তাও কোথাও নেই। শেষ লাইন অবধি পাঠক উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে, তারপর না জানি কে এল! রুদ্ধশ্বাস হয়ে থাকতে হয়, কারণ বাস্তবজগতে যদি বা যুক্তি খাটিয়ে, গল্পের শেষটি আঁচ করা যায়, এক্ষেত্রে যুক্তিটুক্তি অচল, কাজেই গল্পের সমাপ্তি অপ্রত্যাশিত। রসের রাজ্যে যেমন হওয়াই উচিত।

ষোল

রস-রচনার কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই; চার্লস্ ডিকেন্স পিকউইক পেপার্স যখন লিখেছিলেন, তাঁর বয়স ছিল তেইশ-চব্বিশ; কিন্তু আমাদের রসরাজ রাজশেখর বসু আধবুড়ো হবার আগে, কেউ তাঁর রসের সাগরের সন্ধান পেয়েছিল কি? ভোরবেলা খেজুর গাছের ঠাণ্ডা টলটলে রসও মিষ্টি, আবার উনুন ধরিয়ে দীর্ঘ সময় জ্বালে বসিয়ে যে লালচে সুগন্ধি নলেন গুড় তৈরি হয়, সেও মিষ্টি। তবে সে অন্য রকম মিষ্টি, অন্য কাজে লাগে।

রসই ছিল সুকুমারের মূলধন। তিনি বলতেন হাস্যরস ও গম্ভীর রস একই সঙ্গে অবস্থান করে। তা করলেও, গম্ভীর বিষয়ে গদ্য রচনার প্রকাশধর্ম সাধারণতঃ একটু আলাদা হয়। হাসি আলোর মতো জ্বলে উঠে চারদিকে আলো করে দেয়, সেই আলোতে সত্যের রূপটিও স্পষ্ট করে দেখা যায়। গম্ভীর গদ্য রচনার বিষয়বস্তুকে লেখক সাধারণতঃ মনের মধ্যে পাক দিতে থাকেন। এইখানেই অভিজ্ঞতার কথা ওঠে; বাস্তব জগতেই হোক বা সাহিত্য জগতেই হোক, যত দিন যায়, তত বেশি দেখবার শুনবার বুঝবার বাছাই করবার সুযোগ পাওয়া যায়।

ইংরেজিতে mull বলে একটা শব্দ আছে। পানীয়ের সঙ্গে নানান্ মশলাদি মিশিয়ে জারিয়ে-জুরিয়ে নেড়েচেড়ে তার আস্বাদ বাড়ালে তাকে mulled wine বলে।

এই শব্দটি চিন্তার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। একটা কাঁচা আন্‌কোরা ভাবকে মনের মধ্যে নেড়েচেড়ে নানান চিন্তার রসে সিক্ত করে নেওয়া অর্থে এখানে শব্দটির ব্যবহার হয়। তরুণ বয়সে চিন্তাকে mull করার খুব বেশি সময় থাকে না; সেটি সম্ভব হয় কালের সঙ্গে। বিধাতা সে কাল দেননি সুকুমারকে। তাঁর প্রবন্ধগুলি কাঁচা বয়সে লেখা, কোথাও কোথাও অনভিজ্ঞতার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। তবু একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে তীরের মতো সোজা ভাবে আলোচ্য বিষয়ের অন্তরে প্রবেশ করার ক্ষমতা দেখে যেমন আশ্চর্য লাগে, তেমনি বিস্ময় বোধ হয় অবাস্তব বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করার মেধা দেখে।

বিজ্ঞানের ছাত্র, গবেষণা করছেন আলোকচিত্র আর ছবি ছাপা নিয়ে ; এদিকে লিখছেন 'ভাষার অত্যাচার' সম্পর্কে প্রবন্ধ, পাকা ভাষাবিদের মতো। অবশ্য ভাষার রহস্য নিয়ে সর্বদাই তিনি বিস্ময় বোধ করতেন। অনেক হালকা কবিতাতেও এই চিন্তা প্রকাশ পায়। বর্তমান প্রবন্ধে লিখেছেন,

'কতকগুলি কৃত্রিম অযৌক্তিক ধ্বনির সংযোগে কেমন করিয়া যে আমার মনের নাড়ীনক্ষত্র সমস্ত দশজনের কাছে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহার সন্ধানেষণ করিতে গেলে মনে হইতে পারে যে এত বড় আজগুবী কাণ্ড বুঝি আর নাই। গাধা শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র দশজন লোকে কোনো চতুষ্পদবিশিষ্ট সহিষ্ণু জীবের কথা ভাবিতে লাগিল।……অথচ (এর) কোনো ন্যায়সঙ্গত সাক্ষাৎ কারণ দেখা যায় না ;…নামের সঙ্গে নামীর সাদৃশ্য বা সম্পর্ক কোথায়, তাহা আজ পর্যন্ত কেহ নির্দেশ করিতে পারে নাই।'

অর্থাৎ এই যে একেকটা নাম বলতে একেকটি বিষয়বস্তু বা প্রাণী বা ভাব আমরা বুঝি, এটা একটা যুক্তিহীন অভ্যাস ছাড়া আর কিছু বলে এখনো কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। এই রকম ব্যবহারিক অর্থ স্থলবিশেষে একটু-আধটু বদলাতে বাধ্য। একই শব্দে একজন যা বোঝে, আরেকজন তা নাও বুঝতে পারে এবং এককালে যা বোঝায় অন্যকালে নাও বোঝাতে পারে। প্রবন্ধের শেষের দিকে সুকুমার লিখছেন, 'ভাষা যে নিজের অর্থগৌরবেই সত্য, এ কথা ভুলিয়া, সে যখন কেবলমাত্র শব্দগৌরবে বড় হইতে চায়, তাহার অত্যাচার অনিবার্য। চিন্তা কোনো দিনই শব্দের দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে ও সম্যকরূপে ব্যক্ত হইতে পারে না। সেই জন্যই একেকটা সত্যকে পঞ্চাশ বার পঞ্চাশ রকম ভাষায় পঞ্চাশ দিক হইতে দেখা আবশ্যক হয়। কিন্তু তবু দেখা যায় যে সত্যের মূলে প্রবেশ করিতে হইলে আর ভাষা পাওয়া যায় না, অথবা এমন ভাষা পাওয়া যায় না যা সত্যানভিজ্ঞের কাছে তত্ত্বকে ব্যক্ত করিতে পারে।

ব্রাউনিং-এর সেই বিখ্যাত লাইনগুলির কথা মনে পড়ে,

> "Thoughts hardly to be packed
> Into a marrow act,
> Fancies that broke through language and escaped."

বিবিধ প্রবন্ধের বিষয়গুলি চিন্তা করলেই সুকুমারের চিন্তাধারা অনেকখানি জানা যায়। 'চিরন্তন প্রশ্ন', 'দৈবেন দেয়ম্', 'শিল্পে অত্যুক্তি', 'ফটোগ্রাফ,' 'ভারতীয় চিত্রশিল্প'।

'The Burden of the Common Man,' 'The Spirit of Rabindranath Tagore.'

চিরন্তন প্রশ্ন হল, আমি কে? আমার জীবনের কি উদ্দেশ্য? তার উত্তরে সুকুমার বলেছেন, 'আমি এই দেহ নই, এই দেহের মধ্যে আবদ্ধ শক্তিবিশেষ নই, আমি এই প্রবহমান পরিবর্তন-পরম্পরা নই। রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন,

মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে
যাহারে কাঁপায় স্তুতি নিন্দার জ্বরে—

কেবল সেই আমিও আমি নই। এই সকল যাহার ছায়া, আমি সেই সত্যবস্তু। আমার জীবন-স্রোতের অনিত্যতার মধ্যে নিত্যরূপে আমিই বর্তমান; আমার অন্তর্নিহিত পূর্ণতার আদর্শের মধ্যে আমি; আমার জীবনের মূলগত সুখদুঃখাতীত আনন্দের মধ্যে আমি।

সেই আমিই প্রকৃত আমি। তাহাকে জানাই জীবনের প্রশ্ন, তাহাকে প্রকাশিত হইতে দেওয়াই জীবনের সাধনা, তাহার প্রকাশেই জীবনের সার্থকতা।'

দৈবেন দেয়ম-এ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে অদৃষ্টবাদের কথা বলেছেন, "অদৃষ্ট কথাটির একটা ইতিহাস আছে। কার্যকারণের কতকটা শৃঙ্খল বেশ দেখা যায়, বোঝা যায়, তাহা দৃষ্ট। আর যাহা স্পষ্ট দেখা যায় না, যাহার হিসাব পাওয়া যায় না, তাহা অদৃষ্ট। সহজ তত্ত্বের এই সহজ সংস্কৃত পরিভাষা।"

বৈজ্ঞানিক দৈববাদীদের কথা লিখছেন, "এই মুহূর্তে জড়জগতের যেখানে যাহা ঘটিতেছে তাহা পূর্বমুহূর্তে অকাট্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। পূর্বমুহূর্তের কারণসমষ্টি, যাহা এই মুহূর্তের কারণসমষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহাও তৎপূর্ব সময় হইতে অলঙ্ঘ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল।......"

বিজ্ঞান কোথায় পঙ্গু, জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের মিলন না ঘটাতে পারলে, ব্যর্থতা কি করে এসে পড়ে সে বিষয়ও এই লেখক সচেতন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে এ প্রবন্ধ প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে লেখা এবং এই

দীর্ঘ ব্যবধানে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দূরত্ব কমেছে। এ কথাও স্বীকার না করে উপায় নেই।

"সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যে যে একটা নিরবচ্ছিন্নতা দেখা যায়, যাহা সমস্ত জগৎকে দেশে এবং কালে খণ্ডিত করিয়াও, সংযোগসূত্ররূপে সমস্ত খণ্ডকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে এবং প্রতি মুহূর্তে এই প্রবাহের নিত্যতাকে রক্ষা করিতেছে, বিজ্ঞান এখনো জিজ্ঞাসু হইয়া, তাহার দ্বারে আঘাত করিয়া দেখে নাই। অথচ ইহারি মধ্যে বিজ্ঞানের সকল সাধনা সকল অন্বেষণের সমন্বয়তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং পরোক্ষভাবে জ্ঞানলক্ষণসম্পন্ন একটা অকাট্য প্রেরণাশক্তিকে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াও, বিজ্ঞান এই জ্ঞান বস্তুটাকে কোথাও ধরিতে চেষ্টা করে নাই। কারণ বিজ্ঞান তো চৈতন্যকে খুঁজিতে আসে নাই, সে শক্তির নিয়মকেই খুঁজিয়াছে এবং সেই জন্যই পদে পদেই জীবন্ত জ্ঞানের সাক্ষ্য পাইয়াও সে তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছে।"

এইরূপ স্থির গম্ভীর প্রত্যয়ের উপর সুকুমারের চিন্তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। অসম্ভব এবং উদ্ভট নিয়ে তিনি ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না তো করবে কে? সার্কাসের সঙদের দেখা যায় তালিমারা রঙ-চং পোশাক পরে ঢং করে কি আশ্চর্য ভারসাম্যের কারসাজি দেখাচ্ছে। ওস্তাদ যদি তাঁবুর চূড়ো থেকে লাফিয়ে দোলনা ধরে দোল খেয়ে নিচে নামেন তো জাব্বাজোব্বা পরা ন্যাকা সঙ মাধ্যাকর্ষণের বিপক্ষে প্রবল সাক্ষ্য দিয়ে, নিচে থেকে লাফ মেরে দোলনা ধরে, চক্ষের নিমেষে তাঁবুর ছাদের মগডালে চড়ে বসে হি-হি করে হাসে।

বিবিধ প্রবন্ধের মধ্যে ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে যা বলা হয়েছে সেই কথাই অবনীন্দ্রনাথও অনেক পরে তাঁর বাগেশ্বরী প্রবন্ধমালায় বলেছিলেন।

"প্রকৃতির কোনো একটা চাক্ষুষ পরিচয়মাত্রকে শিল্পে ব্যক্ত করাই যদি শিল্পী মনে করেন যথেষ্ট হইল, তবে অনেক স্থলেই তাঁর বলাটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। শিল্পী এটি বেশ অনুভব করেন যে তাঁহার চোখ তাঁহাকে যেটুকু দেখায়, কেবল সেটুকুই তদ্বৎ করিয়া আঁকিলেই তাঁহার মনের কথাটাকে ঠিক বলা হইল না।"

সুকুমার আরো বেশি বলেছেন, "শিল্পী যে ভাবকে ব্যক্ত করিতে চাহেন, তাহার সহায়তার জন্য তিনি অতিরঞ্জনের আশ্রয় লইতে পারেন এবং নেচার হইতে সংগৃহীত উপাদানগুলি আবশ্যকমতো গ্রহণ বা বর্জন

করিতে পারেন, ইহা কেহ অস্বীকার করেন না। যে রসের অবতারণা করা শিল্পীর উদ্দেশ্য, তাহা যদি চিত্রে পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবেই শিল্পী সাফল্য লাভ করিলেন বলিতে হইবে।"

নিজে ফটোগ্রাফ-বিশারদ্, ফটোগ্রাফি সম্পর্কে লিখেছেন,—"ফটোগ্রাফ জিনিসটাকে সত্যনিষ্ঠার চূড়ান্ত নিদর্শন জ্ঞানে অনেকে তাহাকে খুব একটা সম্ভ্রমের চোখে দেখেন। কিন্তু অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে সত্যের বিকৃতিসাধনেও ফটোগ্রাফ বড় কম পটু নয়। তাছাড়া তার ছোট-বড় জ্ঞানশূন্য নির্বিকার দৃষ্টিতে মুড়িমুড়কি এক দর হইয়া যে অসঙ্গতি ঘটায়, সেটিও বড় সামান্য নহে।"

এখানে একজন দক্ষ ফটোগ্রাফারের বক্তব্য শোনা যাচ্ছে। শিল্পীর অনেকখানি শিল্পগুণ তার চোখে, এই চোখের গুণটি না থাকলে ফটোগ্রাফার কখনো শিল্পীর সম্মান পায় না। কাকে রাখা হবে, কাকে বর্জন করা হবে, কোন্ কোণা থেকে কাকে দেখা হবে, কতখানি দেখা হবে, কিভাবে সেই দেখা জিনিসটির উপর কতখানি আলো ফেলা হবে—শিল্পজ্ঞান না থাকলে, চোখ দুরস্ত না হলে, তাই বা কি করে বোঝা যাবে।

শিল্প সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই শিল্পীর আঁকা কুমড়ো-পটাশ বা ট্যাঁশগরুর ছবি বিচার করতে গেলে বড় মজা হয়। প্রাকৃতিক জগতের দৃষ্ট বস্তুর শরীর থেকে কিছু নিয়ে, কিছু বর্জন করে, কিছু অতিরঞ্জন করে, শিল্পী তাঁর মনের চোখ দিয়ে দেখা ছবি খাড়া করেছেন সন্দেহ নেই। এই বড় আশ্চর্য কথা যে পাকা শিল্পী হয়েও, সুকুমার ছবিকে কখনো লেখার চেয়ে বড় হতে দেন নি। এগুলি ছবি নিয়ে লেখা নয়, লেখায় বর্ণিত বস্তুকে প্রকট করার জন্যই ছবি। কেবলমাত্র একটি ক্ষেত্রে ছবিকে বাগ মানানো যায় নি; লেখায় যা বলা হয় নি, ছবি সেটি বলে বসে আছে। সেটি হল, আবোল-তাবোলের 'চোর ধরা'-তে, একথা পর্বেও বলা হয়েছে।

সন্দেশ

যে বিশেষ ক্ষেত্রে সুকুমারের সব চাইতে বেশি সম্ভাবনা ছিল, সেখানেই

তাঁর হাত পাকার কাজ সবচেয়ে কম এগিয়েছিল। যেখানে তিনি অদ্বিতীয়, সেখানেই তাঁর সৃষ্টি সব চাইতে কাঁচা থেকে গেছে। এ কি করে সম্ভব হল, সেটা বুঝতে হলে বাংলা নাটক সম্বন্ধে একটু ভাবতে হয়। এই বড় দুঃখের কথা যে বাংলা সাহিত্য, অন্য সব দিক দিয়ে এত সমৃদ্ধ হলেও, নাটকের ক্ষেত্রে সে তুলনায় অতিশয় দুর্বল। এখনো স্কুল-কলেজের উৎসব উপলক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের উপর নির্ভর করতে হয়। অথচ দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয়েছিল চৌষট্টি বছর আগে আর রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর প্রায় চল্লিশ বছর কেটে গেছে।

এমনও নয় যে এখনকার লেখকদের নাটকীয় প্রতিভা নেই। যাঁরা এত উৎকৃষ্ট ছোট গল্প রচনা করেন যা পৃথিবীর যে কোনো দেশের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে, তাঁরা যুগান্তকারী নাটক রচনা করেন না কেন বোঝা যায় না। ইদানীং কয়েকজন গুণী নাট্যকারের কথা শোনা গেছে, কিন্তু হয় কোনো সাময়িক আন্দোলনের, নয় তো চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গে, যার মধ্যে স্থায়ী আবেদনের সম্ভাবনা নেই। তবে দু-একজন যে ভাল নাটকও লিখেছেন এবং সেসব মঞ্চস্থ হয়ে দর্শকদের প্রীত করেছে, এ কথাও মানতে হবে।

এক্ষেত্রে অনেক প্রতিভা নিয়েও সুকুমার মাত্র সাতটি নাটিকা রেখে গেছেন। পড়ে মনে হয় সাতটি সাত রকমের এক্সপেরিমেণ্ট। এসব নাটক জনসাধারণের জন্য লেখা হয়নি, একটিও আসর জমাবার জন্য রচিত প্রকৃত নাটকীয় পরীক্ষা নয়। ছোটবেলায় বাড়িতে ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধবরা জন্মদিন ও অন্যান্য পারিবারিক উৎসব উপলক্ষ্যে নাট্যাভিনয় করত, অনেক সময়ই নাটকটি তাদের বড়দা লিখে দিতেন। প্রধান ভূমিকায় অনেক সময় তিনি অভিনয়ও করতেন। এসব নাটিকা লেখার সময় সর্বদা নিজেদের সীমিত উপকরণ ও অপটু অভিনেতার কথা লেখকের মনে থাকত। এভাবে তো সত্যিকার নাটক রচনা হয় না। অভিনেতার জন্য তো আর নাটক নয়, নাটকের জন্য অভিনেতা প্রস্তুত করা চাই। তা ছাড়া বাংলার একটা বড় অভাব দূর করার উদ্দেশ্য, অন্ততঃ সচেতনভাবে সুকুমারের আদৌ ছিল না, তিনি শুধু সকলকে নিয়ে একটু উঁচুদরের মজা করতে চাইতেন। এসব অভিনয়ে দর্শকের সংখ্যা খুব কমই থাকত, জনসাধারণ জানতেও পারত না। তাছাড়া পূর্ণাঙ্গ নাটক

একটিও নয়, ছোট ছোট একাঙ্ক নাটিকা মাত্র, হয়তো চার-পাঁচটি দৃশ্যেই সমাপ্ত।

সাতটি নাটিকার মধ্যে হিংসুটে ও অবাক জলপান সন্দেশে প্রকাশিত ছোটদের নাটিকা। হিংসুটের চরিত্রগুলি ছেলেমানুষ হলেও, অবাক জলপানের পাত্ররা সাবালক। সুকুমার জানতেন ছোটদের নাটক মানে নয় যে পাত্রপাত্রীদেরো নাবালক হতে হবে। হিংসুটেতে একটিও ছেলের ভূমিকা নেই, অবাক জলপানে মেয়ে নেই। প্রথমটা হয়তো মেয়েদের ও দ্বিতীয়টা ছেলেদের প্রতিষ্ঠানের জন্য রচিত। হয়তো মেয়েদের ছেলে সাজা ও ছেলেদের মেয়ে সাজা তিনি পছন্দ করতেন না। 'ঝালাপালা' আর 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' বছর কুড়ি বয়সে লেখা। 'ভাবুক সভা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে, প্রবাসীতে। সুকুমার তখন সবে বিলেত থেকে ফিরেছেন, রচনাকাল সম্ভবতঃ আরো আগে। 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম'-ও সম্ভবতঃ ঐ একই সময়ের লেখা; 'চলচিত্তচঞ্চরি'-ও আগে রচিত ও অনেক পরে, ১৯২৭ সালে, বিচিত্রায় প্রকাশিত। সুকুমার তখন ইহলোকে নেই।

জন্মদিন ইত্যাদি ছাড়াও বাড়িতে নানান উৎসব হত। প্রথমে ননসেন্স ক্লাব ছিল, তারপর বিলেত থেকে ফিরে মণ্ডে ক্লাব হল। হাসির নাটক ছাড়া চলে কি করে? হাসির ব্যাপারও হবে, আবার হাতের গোড়ায় বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন যাঁরা আছেন, তাঁদের দ্বারা যাতে সহজে অভিনীত হতে পারে, এমনও হওয়া চাই। তাছাড়া একটা কথা সর্বদা মনে রাখা দরকার, নাটকমাত্রেরি মঞ্চস্থ হবার সম্ভাবনা থাকা চাই, নইলে নাটক হয় না। শুধু লেখা নাটক বলে কিছু নেই। অন্ততঃ আর যাই হোক, সেটি নাটক নয়।

আসলে ভালো অভিনেতা, ভালো গাইয়ের খুব অভাব ছিল না। আর উৎসাহী দর্শকরা তো ঘরে ঢুকবার সুযোগ পেলেই কৃতার্থ হত, অনুমতিরো অপেক্ষা করত না। সিন-সিনারির বালাই ছিল না। যাত্রার পালার দেশ আমাদের, ওসব দিয়ে কি হবে? দরকারমতো টুল, চৌকি, ছবি, পর্দা, শাড়ি, ফুলের টব, গন্ধমাদন পর্বতের জন্য ডালপালা গোঁজা ধোপার পুঁটলি। এসব তো লোকের বাড়িতে-ই পাওয়া যায়। ন্যাকড়া দিয়ে ল্যাজ পাকাতেই বা কতটুকু সময় লাগে, আর সামান্য খরচে দোকান থেকে জটা, দাড়ি, আর বাঁদুরে মুখের জন্য ক্রেয়ন পেনসিল আনা। ব্যস, আর কি চাই? সেক্সপীয়রেরো অনেক নাটক এর চাইতেও কম উপকরণে সরাইখানার

উঠোনে অভিনীত হত।

তফাৎ এই যে সে-সব ছিল পেশাদারী নাটক, মাইনে করা অভিনেতা, কিঞ্চিৎ অর্থ ও সম্ভব হলে যৎকিঞ্চিৎ রাজানুগ্রহ-লাভ ছিল তাদের অভিপ্রায়। সে যাই হোক, প্রধান উদ্দেশ্য সকলেরি এক কথা, দর্শকদের মনোরঞ্জন করা। সুকুমারের ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যটা আরো ব্যাপক ছিল। কারণ শুধু দর্শকদের নয়, সঙ্গে সঙ্গে নাটকটির অভিনেতাদেরো উপভোগ্য হওয়ার দরকার ছিল। অবশ্য দর্শকরা যেমন প্রাণ খুলে হেসে গড়াতে পারত, অভিনেতাদের তেমনি মুখ গম্ভীর করে অদ্ভুত সংলাপ পরিবেশন করতে হত, অদ্ভুত গান গাইতে হত। তাদের হাসবার সুযোগ দেওয়া হত না; আগাগোড়া একটা মক্ গ্র্যাভিটি অর্থাৎ নকল গাম্ভীর্য রক্ষা করে যেতে হত। তার জন্য অশেষ সংযমের দরকার হত। সুকুমারও কড়া প্রযোজক ছিলেন।

নাটককে লোকে বলে জীবনের অংশ, অর্থাৎ অল্প পরিসরের মধ্যে জীবনের সুখদুঃখ, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও মানবচরিত্র দর্শকদের সামনে উপস্থিত করা রঙ্গমঞ্চেই সম্ভব হয়। তবে সব নাটকেই তো আর সব দিক দেখানো যায় না, বেছে নিতে হয়। সেকালে শ্লেষাত্মক নাটকে জীবনের প্রায় অপর সব দিককে উপেক্ষা করে, নাট্যকারের উদ্দেশ্য সাধনার্থে কেবলমাত্র দর্শনীয় বিষয়টুকুর অতিশয়োক্তি করে, দর্শকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হত। সামাজিক কুসংস্কারাদি দূর করবার জন্য এই ধরনের একতরফা নাটক মঞ্চস্থ করা হত। তাছাড়া ঐতিহাসিক নাটক ছিল। বিদেশী নাটকের অনুবাদ ছিল। স্বদেশ-প্রেমের নাটকও ছিল, তবে সেসব প্রায়ই সরকার বন্ধ করে দিতেন। ফ্যাণ্টাসিও কিছু ছিল আর ছিল প্রহসন ও হাসির নাটক। কিন্তু উদ্দেশ্যহীন অনাবিল হাসির ব্যবস্থা ছিল কিনা সন্দেহ। তবে এটুকু স্বীকার করতেই হবে যে সুকুমারের কোন কোন দৃশ্যে মাঝে মাঝে কবিগুরুর 'গোড়ায়গলদ' বা 'বিনিপয়সার ভোজ'-এর সংলাপ একটু একটু মনে পড়ে বটে, কিন্তু উদ্ভটতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ বেশিদূর অগ্রসর হবার কখনো চেষ্টাও করেননি। এক ছবি আঁকার ক্ষেত্রে ছাড়া।

'হিংসুটে' নাটক স্কুলের মেয়েদের জন্য লেখা। সাতটি পাত্রী দেখানো হয়েছে; পাঁচটি ছোট মেয়ে, বলা বাহুল্য তাদের মধ্যে বেশির ভাগই দারুণ হিংসুটি; স্বপ্নবুড়ি আর হিংসা। একটিমাত্র দৃশ্য এবং সহজেই

অনুমান করা যায় মিনিট পনেরো অভিনয়কালের মধ্যেই যার যার হিংসার ব্যামো একেবারে আরাম হল। নাটকটি প্রচলিত ফ্যাণ্টাসির নিয়ম-ঘেঁষা এবং একটি অতুলনীয় গান ছাড়া সুকুমারের স্বকীয়তা বড় একটা চোখে পড়ে না। গানটি অবশ্য অদ্বিতীয়।

একটু শোনাই ঃ—

"আমরা ভালো লক্ষ্মী সবাই, তোমরা ভারি বিশ্রী,
তোমরা খাবে নিমের পাঁচন, আমরা খাব মিস্‌রি।
আমরা পাব খেলনা পুতুল, আমরা পাব চম্‌চম্‌,
তোমরা তো তা পাচ্ছ না কেউ, পেলেও পাবে কম কম।"
ইত্যাদি।

এই সঙ্গে অবাক জলপানের বিষয়ও বলতে হয়। এর রস অন্য রকম, অনেক বেশি সচেতন ও পরিপক্ব। এখানে 'খাই-খাই' শ্রেণীর কথার খেলা দেখা যায়। স্থানে স্থানে এই রস চূড়ান্তে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাষা এত সহজ সরস যে ছোটদেরো সে সংলাপ অনুসরণ করতে কোনো অসুবিধা হয় না।

গল্পাংশ যৎসামান্য ; একজন তৃষ্ণার্ত পথিকের জল পাবার বৃথা চেষ্টা ও শেষ পর্যন্ত চাতুরি অবলম্বনে কৃতকার্য হওয়া। এই ক্ষুদ্র পরিসরেও সুকুমারের একান্ত স্বকীয় চমৎকারিত্ব প্রকট। একটু নমুনা দেখা যাক ঃ

পথিক—মশাই একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন ?

আগন্তুক—জলপাই ? জলপাই এখন কোথায় পাবেন ? এ তো জলপাইয়ের সময় নয়। কাঁচা আম চান তো দিতে পারি—

পথিক—না, না, আমি তা বলি নি—

আগন্তুক—না, কাঁচা আম আপনি বলেননি, কিন্তু জলপাই চাচ্ছিলেন কিনা, তা তো এখন পাওয়া যাবে না, তাই বলছিলুম—

পথিক—না হে, আমি জলপাই চাচ্ছিনে—

আগন্তুক—চাচ্ছেন না তো কোথায় পাব কোথায় পাব কচ্ছেন কেন ? খামকা এরকম করবার মানে কি ?

পথিক—আপনি ভুল বুঝেছেন, আমি জল চাচ্ছিলাম।

আগন্তুক—জল চাচ্ছেন তো জল বললেই হয়—জলপাই বলবার কি দরকার ছিল ? জল আর জলপাই কি এক হল ? আলু আর আলুবখরা কি সমান ? মাছও যা, মাছরাঙাও

তাই? বরকে কি আপনি বরকন্দাজ বলেন? চাল
কিনতে গেলে কি চালতার খোঁজ করেন?

তারপর এক কবির সঙ্গে দেখা।

পথিক—মশাই আমি অনেক দূর থেকে আসছি, এখানে একটু জল
মিলবে কোথাও?

কবি—কি বলছেন? জল মিলবে না? খুব মিলবে।...জল চল তল বল কল ফল—মিলের অভাব কি? কাজল—সজল—উজ্জ্বল—জ্বলজ্বল—চঞ্চল চলচল, আঁখিজল ছলছল, নদীজল কলকল, হাসি শুনি খলখল, অ্যাঁকানল ব্যাঁকানল, আগল ছাগল পাগল, কত চান?

এ কথা যদি কেউ মনে করেন যে হাল্কা হাসির সুরে লেখা সুকুমারের নাটকগুলির কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্ভাবনা নেই, তা হলে তিনি ভুল করবেন। কোনো কোনো সমালোচকের দুটি অভিযোগ ছিল। প্রথম, এসব নাটক পড়ে ছেলেরা জ্যাঠামি শিখবে। দ্বিতীয়, ঠাকুরদেবতা বা রামায়ণ মহাভারতের চরিত্র নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করা উচিত নয়।

মজার কথাবার্তা ও চটাং-চটাং বুলি শুনলেই যদি ছোটরা জ্যাঠামি শেখে, তাহলে অকালপক্বতার হাত থেকে কেউ তাদের উদ্ধার করতে পারবে না। কারণ, সমস্ত সাহিত্যজগৎ, মায় রামায়ণ মহাভারত পর্যন্ত ওদের তাই শেখাবে। সুকুমারের হাসিঠাট্টা সর্বদা সুস্থ প্রকৃতির ও নির্মল, তাতে কোনো ছোট ছেলের অনিষ্ট হবে না। দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তরে এইটুকু বলা চলে যে শিল্প বা রসসৃষ্টির জগতে ছোট বড় পাত্রাপাত্র ভেদ নেই এবং যতক্ষণ না কোনো অশালীনতা দেখা যাচ্ছে আপত্তিরো কোনো কারণ নেই। রসিকজন রসকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে দানও করেন, গ্রহণও করেন, এখানে 'পৌরাণিক চরিত্র নিয়ে কেন ঠাট্টা হচ্ছে' বললে চলে না। আর সত্যি কথা বলতে কি, পৌরাণিক কাহিনীগুলির মধ্যেই ঠাকুরদেবতা নিয়ে যথেষ্ট রস জমানো হয়েছে। স্বয়ং ভগবানকে নিয়ে জগতে অনেক রসিকতা হয়ে গিয়েছে, তাতে তাঁর মহিমা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি।

তাছাড়া সুকুমার রায়ের নাটকের জ্যাঠামিগুলিও এমনি বিশুদ্ধ হাস্যরসে ভরা এবং কোনো চরিত্রকেই হীন প্রতিপন্ন করার যখন কোনো চেষ্টাই নেই, শুধু মজাটুকু দেখানোই উদ্দেশ্য, তখন নিতান্ত বে-রসিক ছাড়া কারো কাছে এগুলিকে আপত্তিকর বলে মনে হবে বলে মনে হয় না। 'লক্ষ্মণের

শক্তিশেল' যখনি অভিনীত হয়েছে, ছেলেবুড়ো হেসে কুটিকুটি হয়েছে ; এমন অনাবিল হাসির উৎসে যারা পঙ্কিলতা দেখে, পঙ্কিলতা তাদের চোখে।

আভাষো

ভাবুক সভা আগাগোড়া কাব্যে লেখা। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথ ভাবুক সভা পড়ে সুকুমারকে হেসে বলেছিল, 'এ তুমি নিশ্চয় আমাকে মনে করে লিখেছ।' এই নাটকের রস ছোটদের বোধগম্য হবে বলে মনে হয় না। একে ঠিক নাটক-ও বলা যায় কিনা সন্দেহ, কারণ ঘটনার পারম্পর্য পরিণামে পৌঁছে দিচ্ছে না।

ঘটনাই নেই, তার আবার পারম্পর্য ; বরং পাত্রদিগকে দুদিন উপোস করিয়ে রাখলেই পরিণাম পরিহার করা যায়। ব্যাপারটা একটু খুলেই বলা যাক। বলা বাহুল্য দৃশ্য বা দৃশ্যপটের বালাই নেই।

১ম দৃশ্যে ভাবুকদাদা হয় নিদ্রিত, নয় সমাধিস্থ, নয় মূর্ছা, নয় ফিট্। চ্যালাদের প্রবেশ।

১ম চ্যালা—ইকি ভাই লম্বকেশ, দেখছ নাকি-ব্যাপারটা ?
ভাবুকদাদা মূর্ছাগত, মাথায় গুঁজে র‍্যাপারটা !

২য় চ্যালা—ভাবটা যখন গাঢ় হয় বলে গেছেন ভক্ত,
হৃদয়টাকে এঁটে ধরে আঠার মতো শক্ত !

১ম চ্যালা—যখন ভাবের বেগে জোয়ার লেগে বন্যা আসে তেড়ে,
আত্মারূপী সূক্ষ্ম শরীর পলায় দেহ ছেড়ে !
(কিন্তু) হেথায় যেমন গতিক দেখছি, শঙ্কা হচ্ছে খুবই
আত্মাপুরুষ গেছেন হয়তো ভাবের স্রোতে ডুবি !
যেমনধারা পড়ছে দেখ গুরু গুরু নিশ্বাস,
বেশিক্ষণ বাঁচবে এমন কোরো নাকো বিশ্বাস,
কোনখানে হায় ছিঁড়ে গেছে সূক্ষ্ম কোনো স্নায়ু—
ক্ষণজন্মা পুরুষ কিনা, তাইতে অল্প আয়ু।

(সবাই মিলে তারস্বরে বিলাপ-সঙ্গীত)

"ভাবের ভারে হদ্দ কাবু ভাবুক বসে তায়,
ভাব তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ভাবের খাবি খায় রে
ভাবুক ভাবের খাবি খায়—"
(চেঁচামেচির চোটে ভাবুকদাদার নিদ্রাভঙ্গ)

ভাবুকদাদা—জুতিয়ে সব করব সিধে, বলে রাখছি পষ্ট !
চ্যাঁচামেচি করে ব্যাটা ঘুমটা করলি নষ্ট !
(চ্যালারা অবাক)
ঘুম কি হে ? সি কি কথা ? অবাক করলে খুব !
ঘুমোও নি তো, ভাবের স্রোতে মেরেছিলে ডুব !

ভাবুকদাদা নিজের ভুল বুঝতে পেরে অপ্রস্তুতের একশেষ।

'সে ঘুম নয়, সে ঘুম নয়, ভাবের ঝোঁকে টং,
ভাবের কাজল চোখে দিয়ে, দেখছি ভবের রং !
মহিষ যেমন পড়েরে ভাই শুকনো নদীর পাঁকে,
ভাবের পাঁকে নাকটি দিয়ে ভাবুক পড়ে থাকে।'

পূর্বেই বলা হয়েছে ঘটনাই নেই, তার আবার বৈচিত্র্য আসবে কোথা থেকে ? ভাবের নামতা দিয়ে কার্যে ইতি।

"ভাব এক্কে ভাব, ভাব দুগুনে ধোঁয়া,
তিন ভাবে ডিসপেপসিয়া, ঢেকুর উঠবে চোঁয়া।
চার ভাবে চতুর্ভুজ, ভাবের গাছে চড়,
পাঁচ ভাবে পঞ্চত্ব পাও, গাছের থেকে পড় !"

নির্মল নির্ভেজাল রসের উৎসব। পরোক্ষভাবে যদি কারো উপর কটাক্ষ থাকে তা, সে শুধু ভণ্ড ভাবুকদের উপর। তাতে আশা করা যায় কেউ কিছু মনে করবে না, কারণ মনে করার আগে নিজেকে ভণ্ড ভাবুক বলে স্বীকার করতে হবে।

আগেই বলা হয়েছে সাতটি নাটক সাত রকমের। 'ঝালাপালা' কাঁচা হাতের রচনা, গল্পাংশে কিঞ্চিৎ অপরিপক্বতা, যেমন কবিগুরুর 'গোড়ায়-গলদ'-এও দেখা যায়। প্লটে খুব একটা অভিনবত্ব না থাকলেও, সংলাপের তুলনা হয় না। স্বচ্ছন্দে বলা চলে কথাবার্তা যতই আজগুবী হোক, পরিস্থিতিটি বাস্তবধর্মী ; সেকালে এরকম ব্যবস্থা হরদম ঘটত।

ঝিঙেটোলার জমিদারবাবু বড় বেশি ভালোমানুষ। রোজ সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে স্বার্থান্বেষী মোসাহেবের ভিড়, তাদের তাড়ানো তাঁর কর্ম

নয়। তাঁর চাকর রামকানাই হয়তো পারত, কিন্তু মুনিবের হুকুমে অসভ্যতা করা বন্ধ, কাজেই তারও হাত-পা বাঁধা! তবু সে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। স্থায়ী মোসাহেবরা ছাড়াও, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ওস্তাদ কেবলচাঁদ জুটেছেন। উপরন্তু পণ্ডিত মশাই স-ছাত্র টোলটিকে জমিদারবাড়িতে উঠিয়ে এনে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করার তালে আছেন। অগত্যা জমিদারবাবুকে কেদারকেষ্টমামার শরণাপন্ন হতে হল, তিনি রামকানাইকে কনস্টেবল্ সাজিয়ে স্রেফ ভয় দেখিয়ে নিষ্কর্মার দলটিকে ভাগালেন। তবে সত্যি কথা বলতে কি মোসাহেবেরা অত সহজে ভাগে না, তাই প্লট খুব জোরালো হয়নি। আগেই বলা হয়েছে গল্পাংশ কিছুই নয়, রস জমেছে আলাপণে।

লক্ষ্মণের শক্তিশেলের মতো নাটক বাংলাভাষায় আজো লেখা হয়নি। নাটক না বলে যাত্রাও বলা চলে; খোলামাঠে অভিনয় হতে পারে। রামায়ণের সেই চেনা গল্প থেকে নিছক হাসির মশলাটুকুকে বের করে নিয়ে, সাজিয়ে-গুজিয়ে উপস্থিত করা। কাউকে অশ্রদ্ধা করা হয়নি, সবাইকে নিয়ে শুধু একটু মজা করা হয়েছে। রসের রাজ্যে ছোট-বড় মাত্রাজ্ঞান নেই, সত্যমিথ্যা নেই; সেখানে শুধু রসটুকুই সত্য আর বাকি সব তার আধারমাত্র।

ছোট নাটিকা, মাত্র চারটি দৃশ্যেই সমাপ্ত। প্রথম দৃশ্যে বোঝা যাচ্ছে যে যদিও স্বয়ং রামচন্দ্র স্বপ্ন দেখেছেন যে রাবণ একটা তালগাছে চড়তে গিয়ে পপাত চ মমার চ, তবু ব্যাটা আসলে মরেনি। লাঠি কাঁধে হতভাগার সশরীরে আগমন আসন্ন জেনে, লক্ষ্মণ সুগ্রীব ইত্যাদি অগ্রসর হলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্যে বীর সেনানী রাবণের জন্য অপেক্ষমাণ। হেনকালে নেপথ্যে জাম্বুবানের কণ্ঠস্বর—"ওরে তোরা পালিয়ে আয়, রাবণ আসছে!" সঙ্গীত—

"যদি রাবণের ঘুঁষি লাগে গায়,
তবে তুই মরে যাবি, তবে তুই ম-রে-যা-বি!
ওরে পালিয়ে যা রে পালিয়ে যা!
তা না হলে মরে যাবি।" ইত্যাদি।

অতঃপর রাবণ সত্যিসত্যি এল ও বিধিমতে সুগ্রীবের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ হল। রাবণের লগুড় খেয়ে সুগ্রীবের সে কি বিলাপ!

"ওরে বাবা ই কি লাঠি, গেল বুঝি মাথা ফাটি,
নিরেট গদা ই কি সর্বনেশে।
কাজ নেই রে খোঁচাখুঁচি, ছেড়ে দে ভাই কেঁদে বাঁচি,
সাধের প্রাণটি হারাব কি শেষে।"

অতঃপর পলায়ন ও লক্ষ্মণের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ এবং অনতিবিলম্বে শক্তিশেল প্রয়োগ ও লক্ষ্মণের মূর্ছা এবং তার পকেট সার্চ করণান্তে রাবণের প্রস্থান। লক্ষ্মণের দশা দেখে রামচন্দ্রের শিবিরে গভীর শোক। জাম্বুবান ওষুধের বিধান দিলেন, বিশল্যকরণী ও মৃতসঞ্জীবনী এই দুই গাছের শিকড় আনতে হবে। হনুমান যাক। কিন্তু হনুমান কি সহজে যেতে চান! 'আমি ডাক্তারখানা চিনি না।' জাম্বুবানও ছাড়েন না, ডাক্তারখানা কিসের, কৈলাস পাহাড়ের কাছে গন্ধমাদন পর্বত আছে, সেইখানে যেতে হবে। হনু বললেন—'ও বাবা, সেই কৈলেস পাহাড়? এত রাত্তিরে আমি অত দূর যেতে পারব না।' শেষ অবধি অনেক কষ্টে তাঁকে রাজী করানো গেল।

চতুর্থ দৃশ্যে দুই যমদূত এসেছে বাড়ি চিনে লক্ষ্মণকে নিয়ে যাবে; তা বিভীষণ যখন পাহারায় আছেন, তিনি দেবেন কেন? শেষ অবধি স্বয়ং যমরাজের আগমন। আরেকটু হলেই রামায়ণের গল্পটা অন্য রকম হয়ে যাচ্ছিল। ভাগ্যিস ঠিক সেই সময়, গাছ চিনতে না পেরে, গোটা গন্ধমাদন পর্বত মাথায় নিয়ে হনুমানের প্রবেশ এবং রাখবি তো রাখ্, একেবারে যমরাজার উপর! সেই সুযোগে জাম্বুবান লক্ষ্মণকে ঔষধ প্রয়োগ করলেন এবং লক্ষ্মণ উঠে দাঁড়ালেন। তখন যমরাজার উপর থেকে পর্বত তোলা হল, লক্ষ্মণকে জ্যান্ত দেখে তিনি অবাক! 'সে কি, আপনি তবে বেঁচে আছেন? চিত্রগুপ্ত আমাকে ভুল বুঝিয়ে দিয়েছিল। আমি এখুনি গিয়ে ব্যাটার চাকরি ঘুচোচ্ছি!'

এমন নাটক বাংলায় কটা আছে?

'চলচিত্তচঞ্চরি' আর 'শব্দকল্পদ্রুম' সম্পূর্ণ নতুন ধরনের রচনা; এদের মর্মকথা, বিশেষ করে শেষোক্তটির অতিশয় সূক্ষ্ম, সাধারণের ধারণযোগ্য ঠিক নয়। হয়তো সেই কারণেই যে দেশে এত নাটকের অভাব, সেখানেও এগুলির কথা খুব বেশি লোকে জানেও না, মঞ্চস্থ করার খুব বেশি চেষ্টাও হয় না। এর কোনোটিতেই স্ত্রী চরিত্র নেই। হয়তো সময় থাকলে সুকুমার এই ধারা অবলম্বন করে আরো অনেকদূর অগ্রসর হতেন;

এখন এটুকুমাত্র বলা চলে এ ধরনের নাটক আগেও কেউ লেখেনি, পরেও না।

ভণ্ডামি, দলাদলি, সাম্প্রদায়িক রেষারেষি নিয়ে, সমস্ত তিক্ততা বাদ দিয়ে নিছক মজা করা খুব সহজ নয়। সাধারণতঃ একটুখানি শ্লেষ, একটুখানি কটুভাব, হাজার সতর্কতা সত্ত্বেও, এসে পড়ে। 'চলচিত্তচঞ্চরি'-তে তেমন হয়নি। তরুণ লেখকের অব্যর্থ-সন্ধানী বাক্যগুলি সঙেগ সঙেগ কি করে এত সরস হল, তাই ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। গল্পটি এবার শোনা যাক।

সাম্যসিদ্ধান্ত সভার পাণ্ডাগণের ও শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রমচারীগণের মধ্যে দারুণ রেষারেষি, মন-কষাকষি, চোখরাঙানি, তেমন হলে হাতাহাতিতেও বাধা নেই।

দুই পক্ষের মাঝখানে আগন্তুক ভবদুলালবাবু। তিনি একজন জিজ্ঞাসু ভদ্রলোক, 'চলচিত্তচঞ্চরি' নাম দিয়ে একখানি বই লিখবেন। তার জন্য উপাদান সংগ্রহ করছেন। যেখানে যে ভালো কথা শোনেন তখুনি নোটবইয়ে টুকে রাখেন। পরে বইতে ঢুকিয়ে দেবেন। বইটা তখনো লেখা না হলেও, তার মলাটের পরিকল্পনা তৈরি, পাঠ্যাংশটুকু যোগাড় হলেই ছাপা হবে।

উভয় শিবিরে ভবদুলালের অসঙ্কোচে যাতায়াত। উভয় পক্ষই তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করতে ব্যস্ত; সকলের সহযোগিতা পেয়ে দিনে দিনে নোটবই ভর্তি হতে লাগল। এখন মুশকিল হয়েছে যে ভবদুলালের আগ্রহ যতই থাকুক, স্মৃতিশক্তি ও বোধশক্তি দুটোই কম। কি লিখতে খাতায় কি লেখেন তার ঠিক নেই। একদিন দৈবাৎ সব ফাঁস হয়ে গেল। এমনিতেই এ-শিবিরের কথা ও-শিবিরে বলে দেওয়াতে উভয় পক্ষই যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়ে ছিল, এবার নোটবই পড়ে সবার চক্ষু চড়কগাছ! তাঁরা তাঁর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে নিমেষের মধ্যে নোটবই ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেললেন।

কিন্তু দুনিয়ার ভবদুলালরা কি এত সহজে পিছপাও হয়? কাগজের কুচি যতটা পারলেন কুড়িয়ে নিয়ে বুক ফুলিয়ে ভবদুলাল বললেন, "খাতা ছিঁড়ে দিয়েছেন তো কি হয়েছে? আবার লিখব।···লাল রঙের মলাট, চামড়া দিয়ে বাঁধানো, তার উপর বড় বড় করে সোনার জলে লেখা চলচিত্তচঞ্চরি published by ভবদুলাল! একুশ টাকা দাম করব।"

ভাবুক সভায় অর্থ-অনর্থের বিরোধের উল্লেখ আছে ঃ—

"অর্থ ! অর্থ তো অনর্থের গোড়া ;
ভাবকের ভাত মারা সুখ-মোক্ষ-চোরা !
যত সব তালকানা অঘামারা আনাড়ে
অর্থ অর্থ করি খুঁজে মরে ভাগাড়ে ।
অর্থের শেষ কোথা, কোথা তার জন্ম,
অভিধান ঘাঁটা সে কি ভাবুকের কম্ম ?

মাখন-তোলা দুগ্ধ আর লবণহীন খাদ্য,
আর ভাবশূন্য গবেষণা, এ কি ৺তের বাপের শ্রাদ্ধ ?"

এই চিন্তার বীজটি 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম'-এ অঙ্কুরিত হয়ে দ্রুমের উদ্ভট আকৃতি গড়েছে। প্লটটি অতিশয় অভিনব। এক গুরুজি আর তাঁর গুটিকতক শিষ্য। তাদের সঙ্গে বিশ্বম্ভর বলে একটা বাইরের লোক এসে জুটেছে। গুরুজির শিক্ষার গোপন মন্ত্রটি তার জানবার বড় ইচ্ছা, এদিকে শিষ্যরা কিছুই প্রকাশ করতে চায় না। বড় জটিল সাধনা ; গুরুজি নিজে তার ব্যাখ্যা করলেন। শব্দ নিয়ে সাধনা।

গুরুজি বললেন, "শব্দই আলোক, শব্দই বিশ্ব, শব্দই সৃষ্টি, শব্দই সব।" তিনি শব্দসংহিতা লিখছেন। শব্দকে অর্থ থেকে ছাড়াতে হবে। তিনি বলছেন, "একেকটি শব্দ একেকটি চক্র, কেননা শব্দ তার নিজের অর্থের মধ্যে আবদ্ধ থেকে ঘুরে বেড়ায়। তাই বলা হয়েছে অর্থই শব্দের বন্ধন। এই অর্থের বন্ধনটিকে ভেঙে চক্রের মুখ খুলে দাও, তবেই সে মুক্তগতি spiral motion হয়ে, কুণ্ডলীক্রমে উর্ধ্বমুখে উঠতে থাকে। অর্থের চাপ তখন থাকে কি থাকে না। যে সংকেত জানে সে ঐ কুণ্ডলীর সাহায্যে করতে না পারে এমন কাজ নেই। অমাবস্যার অন্ধকার রাত্তিরে সেই সংকেতমন্ত্র দিয়ে তোমাদের দেখাব শব্দের কি শক্তি। রাতারাতি স্বর্গ বরাবর পৌঁছে দেব।"

বাস্তবিক হলও তাই, অমাবস্যার রাত্তিরে সশিষ্য গুরুজি অর্থমুক্ত শব্দের স্পাইরেল ধরে একেবারে সবর্গের কাছাকাছি পৌঁচেছেন, দেবতাদের মধ্যে হুলস্থুল পড়ে গেছে, এমন সময় চক্রের গতি কমে গেল। কি ব্যাপার ? না হতভাগা বিশ্বম্ভর এসে সবার শেষে জুটেছে !

'ও বিশ্বম্ভর, তুমি কি কোনরূপ ভার বহন করে আনছ ?' বিশ্বম্ভর

বললে, 'আমি ভাবছিলুম—'। 'ভাবছিলে? সর্বনাশ! সর্বনাশ! ভেবো না ভেবো না! শব্দের ঘাড়ে চিন্তাকে চাপাচ্ছ? ছিঃ! এমন করে শব্দশক্তি ম্লান কর না।'

হেনকালে বিশ্বকর্মার আবির্ভাব। ব্যস্, স্বর্গযাত্রার ঐখানেই ক্ষান্তি! শব্দ থেকে ছাড়া পেয়ে অর্থগুলো শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, বিশ্বকর্মা তাদের মুখ ঘুরিয়ে দিলেন।

"ভেবেছ কি উদ্ধতের হবে না শাসন?
জাগেনি সুপ্ত হুতাশন?
বিদ্রোহের বাজেনি সানাই?
শব্দ আছে প্রতিশব্দ নাই?
শব্দমুখে প্রতিলোম শক্তি এসো ঘিরে,
কুণ্ডলীর মুখে যাও ফিরে।

শব্দ যবে হবি কুণ্ড অফুরন্ত ধূম।
এই মারি শব্দকল্পদ্রুম!

ব্যস্, spiral-এর গতি শেষ, সশিষ্য গুরুজির স্বর্গ হইতে পতন!

পরিশিষ্ট

চিঠিপত্র

এই সব চিঠি সুকুমার বিলেত যাবার পথে আর বিলেতে থাকতে থাকতে, মাকে, বাবাকে, কাকাকে আর দুই ছোট বোন খুশিকে অর্থাৎ শ্রীযুক্তা পুণ্যলতা চক্রবর্তীকে আর টুনিকে অর্থাৎ শ্রীযুক্তা শান্তিলতা চৌধুরীকে লেখা। পুণ্যলতাকে 'ছেলেবেলার দিনগুলি'-র রচয়িতা বলে সকলে চেনে। শান্তিলতা নিতান্ত অকালে পরলোক গমন করেন।

চিঠিগুলিতে অনেক বিখ্যাত লোকের কথা আছে। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগ-ই তখনো বিখ্যাত হননি। সবচেয়ে বড় কথা ষাট বছর আগে ভারতীয়রা ইংল্যাণ্ডে প্রবাসজীবন কি ভাবে কাটাত, তার একটি অনাবিল উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায়। চিঠিতে বর্ণিত ঘটনার পটভূমিকা স্বরূপ তখনকার বিলেতের সামাজিক চিত্রও ফুটে ওঠে।

যে-সব জিনিস এখন, এমন কি আমাদের দেশেও, দেখে দেখে সকলের চোখে পুরনো হয়ে গিয়েছে, প্রায় সত্তর বছর আগে বিলেতেও তার নতুনত্ব ছিল ভাবলে আশ্চর্য লাগে। যেমন, ইলেকট্রিক লিফ্ট, রোলার প্রেস, ইত্যাদি।

ঠিকানা, তারিখ ও বৎসরাঙ্ক অনেক চিঠিতে দেওয়া না থাকায় ঘটনার পারম্পর্য সব জায়গায় রক্ষা পায়নি। অনেক চিঠি হারিয়ে গেছে, অনেক চিঠি ব্যক্তিগত কারণে উদ্ধৃত করা যায়নি। তা সত্ত্বেও, ধারাবাহিক-ভাবে পড়লে এই সব চিঠি থেকেই বাঙালীদের ইতিহাসের একটি পাতা যেন হাতে পাওয়া যায়।

সময়টা ১৯১১ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত বিস্তৃত, অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক আগেকার কথা। কিন্তু ইউরোপের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কোনো উল্লেখ নেই, ইংল্যাণ্ডের বিষয় যা পাওয়া যায় তা পড়ে মনে হয় তখনো সেখানে সকলে পরম নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করছিল।

(১)

এস্-এস্ অ্যারেবিয়া
১১।১০।১১

বাবা,

এখন প্রায় এডেনের কাছাকাছি এসেছি। এ পর্যন্ত sea-sickness

হয়নি···। এ কয়দিনে পোষাক পরা, টাই বাঁধা, এসব-ও অনেকটা অভ্যাস হয়ে এসেছে—এখন আর বেশি দেরি হয় না।

স্টুয়ার্ড ক্যাবিনের মধ্যেই খাবার এনে দেয়, কারণ স্টিমারে খাওয়া এত জবড়জং যে আমার ডাইনিং সেলুনে যেতেই ইচ্ছা করে না। মেনু থেকে বেছে দু একটা সহজ ডিস্ আনতে বলি।···রান্না বেশ চমৎকার।

এ কয়দিন একটুও গরম বোধ করিনি, বরং মোটের উপর একটু ঠাণ্ডাই বোধ হয়। তবে রেড-সীতে গেলে কি হবে জানি না!···

স্টিমারে উঠবার সময় কোনো রকম মুস্কিল হয়নি। কুক্-এর লোকেই মুটে ডেকে, গাড়ি ঠিক করে, সব বন্দোবস্ত করে দিল। আমি খালি আমার জিনিসগুলো তাদের দেখিয়ে দিলাম। স্টিমারে এসে দেখি সব ঠিকঠাক। ট্রেনে একটু খারাপ লেগেছিল।··· ···

আমার ক্যাবিনে আর একজন আছে। সে পার্শী, নাম সাবাওয়ালা, বেশ লোক। সেই যে ট্রেনে একজন সাহেব ছিল আমাদের কম্পার্টমেণ্টে, তার-ই নাম সেই কি তোপাগ্লো না কি, সে-ও বেশ মানুষ। সে কন্স্ট্যান্টি-নোপ্‌ল্ যাচ্ছে। রাস্তায় অনেক গল্প-টল্প করল। বোধ হয় বুলগেরিয়ান, কারণ বুলগেরিয়ার অনেক গল্প করল।

তোমরা সব কেমন আছ? আমি বেশ আছি।

স্নেহের তাতা

(২)

এস্-এস্ অ্যারেবিয়া
১৫।১০।১১

মা,

······আজ রেড-সী পার হয়ে সুয়েজ ক্যানালে ঢকছি। কাল সকালে বোধ হয় পোর্ট সৈদ পৌঁছব।···সমস্ত দিন ডেকের উপর বসে থাকি, কেবল খাবার সময় নিচে নামি। রাত ৯/১০টা পর্যন্ত ডেকে থাকি। খুব চমৎকার বাতাস।

সঙ্গী অনেক জুটেছে, প্রায় সবাই পার্শী।···খাওয়া দিনে চার বার। সকালে সাতটার সময় চা, সঙ্গে বিস্কুট, রুটি টোস্ট, ফলটল দেয়। ৯টার পর ব্রেকফাস্ট, সুপ থেকে সব। আমার এত···ভালো লাগে না।···১টার

সময় লাঞ্চ, মেলা পদ, আমি সামান্য একটু কাটলেট, কখনো বা কেক আইসক্রীম এইসব খাই। রাতে ৭টায় ডিনার। খিদে বেশ আছে, কাজেই খুব খাই।

পথে একটুও গরম বোধ হয়নি…এখন তো বেশ শীত শীত বোধ হচ্ছে। আজ গরম পোষাকটা বের করব।…পোর্ট সৈদ থেকে বিলিতি ডাক অন্য স্টিমারে তুলে দেওয়া হয়।

ক্যাবিনের মধ্যেই ইলেকট্রিক ফ্যান। রাত্রে খুব ঘুমোই।…এক মেমসাহেব আমার কুশনটা চুরি করেছে। ডেক-চেয়ারে রেখে নিচে এসেছিলাম, এর মধ্যে মেমসাহেব সেটাকে বালিশ করে নিয়েছে।

স্নেহের তাতা

(৩)

২১, ক্রমওয়েল রোড, সাউথ কেনসিংটন
লন্ডন
বৃহস্পতিবার, ২৬শে অক্টোবর, ১৯১১

[illegible]·····তরশুদিন সন্ধ্যায় এখানে এসে উঠেছি। বেশ জায়গা, খাওয়া-দা[illegible] বন্দোবস্ত সব ভালো। এখানে এখন অনেক বাঙালী ছাত্র আছে, তা[illegible] মুসলমান পাঞ্জাবী এরাও আছে। ডঃ পি কে রায়দের আপিস-ও এইখানেই। শীতকালটা এখানে থাকতে দেবে। তার পর অন্য বন্দোবস্ত করে নিতে হবে।…পথে Lyons-এ প্রভাত এক দিন আটকে রেখেছিল। ফ্রান্সে মনে করেছিলাম খুব মুস্কিল হবে, কিন্তু খুব সহজেই সব হয়ে গেল। ·····স্টেশনের হোটেলে গিয়ে 'তে', চা; লো পোতাব্‌ল্‌, খাবার জল; লিমনাদ, লেমোনেড; প্যাঁ, রুটি; সোকোলা দু লে, দুধ দিয়ে কোকোর মতো; এই সব চেয়ে খেলাম।

······পথে খুব আমোদে এসেছি। Lyons পর্যন্ত গাড়িতে দুজন ফ্রেঞ্চম্যান ছিল। তারা ইংরিজির কেবল দুটো একটা কথা জানে। তাই দিয়েই হাত মুখ নেড়ে আমার সঙ্গে গল্প করতে লাগল।·· ···নামবার সময় খুব হ্যাণ্ডশেক করে গুদবাই বলে গেল।

ক্যালে থেকে ডোভার পর্যন্ত সমুদ্রে খুব ঢেউ ছিল। ঝড়ের মতো বাতাস।······জাহাজ এত দোলে যে দাঁড়ানো যায় না। সাড়ে তিনটেয়

ডোভারে এসে, সাড়ে পাঁচটায় লণ্ডনে পৌঁছলাম। কিনি স্টেশনে এসেছিল।

কাল Penrose-এর আপিসে Gamble সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। খুব ভালো লোক। যে স্কুলে ভরতি হতে হবে, সেখানকার প্রিন্সিপ্যালের কাছে চিঠি দিয়ে দিলেন। আবার পাছে রাস্তা ভুল করি, সেই জন্য সব এঁকে দেখিয়ে দিলেন। সেই চিঠি নিয়ে গিয়ে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করে ভরতি হয়ে পড়লাম।

স্কুল এখান থেকে ৫/৭ মাইল দূরে। বাড়ি থেকে বেরিয়েই পাশের রাস্তা দিয়ে মিনিটখানেক হাঁটলেই সাউথ কেনসিংটন স্টেশন। সিঁড়ি দিয়ে খানিকটা নেমে যেতে হয়, কারণ গাড়ির প্ল্যাটফর্ম নিচে, ট্রেন রাস্তার নিচ দিয়ে যায়। যেতে আসতে রোজ ছয় পেনি লাগে। মান্থ্লি টিকেট বোধ হয় সস্তা হবে। দু মিনিট অন্তর ট্রেন আসে।···

···একটা গাইড-ম্যাপ কিনেছি··· ··। রাস্তার কোনো সন্দেহ হলে পুলিসকে জিজ্ঞাসা করলেই হল। এখানকার পুলিশ অতি চমৎকার। এমন ভদ্র আর এমন পরিষ্কার করে রাস্তা-টাস্তা বলে দেয়।······আমার ঘরটা খুব বড়, তিনজন থাকবার মতো।······চেয়ার, টেবিল, দেরাজ, আয়না, খাবার জল, হাত ধোবার জল, সব কিছুর বেশ বন্দোবস্ত। ঘর থেকে বেরোলেই স্নানের ঘর, ঠাণ্ডা জল গরম জল।

······আমি বেশ আছি।······

স্নেহের তাতা

(৪)

২১, ক্রমওয়েল রোড
২৯/১২/১১

মা,

······খ্রীস্টমাসের ছুটিতে এখানে খুব ধুমধাম হল। এ সময়ে পোস্ট-অফিসের কাজ এত বাড়ে যে দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। চিঠিপত্র গাড়িতে চাপিয়ে নিতে হয়। খ্রীস্টমাসের দিন আর আগের দিন···এক এক ডাকে আমাদের এখানেই ২০০/৩০০ করে চিঠি এসেছে। মিস্ বেক্···প্রায় ৩০০ কার্ড পেয়েছেন। যে-সব পার্সেল বা চিঠিতে ঠিকানার গোল আছে, সে-সব পোস্ট-অফিসের একটা গুদোমঘরে জমা করে। দুই দিনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ঘর তাতে একেবারে ভরতি হয়ে গেছে।

পরশু আমাদের এখানে প্রকাণ্ড পার্টি হল। প্রায় ১৫০ লোক এসেছিলেন। কানা-মাছি, টাগ-অফ-ওয়ার, তাছাড়া অনেক রকম খেলা হল। বুড়ো বুড়ো সাহেব মেম পর্যন্ত হুড়োহুড়ি লাফালাফি করছিলেন।

……একটা সুবিধামতো বাড়ি খুঁজছি। লণ্ডনের একটু বাইরে হলেই বোধ হয় সুবিধা। সেখানে অল্প খরচে হয়, তাছাড়া গোলমালও কম।

(৫)

খুশী,

তোর চিঠি পেয়েছিলাম। বোধ হয় উত্তর দেওয়া হয়নি। গত দু'বার মেল ডেতে আর্ট গ্যালারি আর মিউজিয়ম দেখতে বেরিয়েছিলাম। ……এখনও এই বাড়িতেই রয়েছি, তবে অন্য বাড়ির খোঁজ-ও করছি। আজকে এক বাড়িতে গিয়েছিলাম, ডাঃ রায় খোঁজ বলে দিয়েছিলেন। সে জায়গাটা মন্দ নয়, আসছে সপ্তাহে ঘর খালি হবে। তবে চার্জটা একটু বেশি বোধ হল। সপ্তাহে ৩০ শিলিং, লাঞ্চ ছাড়া।

খ্রীস্টমাসের ছুটিতে খুব ফুর্তি করা গেল। এক দিন আমরা এক দল মিঃ চেশায়ারকে নিয়ে Hampton Court Palace, Henry VIII-এর বাড়ি দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে বেজায় খিদে পেল, অথচ …খ্রীস্টমাস বলে হোটেল-টোটেল সব বন্ধ। আমরা খুঁজে খুঁজে একটা inn বার করলাম। সে-জায়গাটা একেবারে পাড়াগেঁয়ে। সেখানে Roast Beef আর কপি সিদ্ধ, আলু সিদ্ধ দিয়ে খানিকটা রুটি আর চা খাওয়া গেল।

তার পর সমস্ত দিন ঘুরে, সন্ধ্যার কাছাকাছি, Kew Gardens হয়ে, বাড়ি আসা গেল। অনেক দূর, যেতে আসতেই প্রায় তিন ঘণ্টা লাগল। খানিকটা underground, বাকিটুকু electric tram-এ। এখানকার ট্রামগুলো দো-তলা।

…আমাদের স্কুলের কাজ বড় সুবিধার চলছে না। Mr, Griggs বলে একজন খুব ভালো lithographic instructor আছেন, তাঁর কাছে private lesson নেবার বন্দোবস্ত করেছি। এর দরুন বোধ হয় সপ্তাহে পাঁচ শিলিং করে দিতে হবে। মোটের উপর দেখছি স্কুলে অতি সামান্যই শেখা যাবে। তবে যে-সব Process আগে করিনি, সেগুলো

হাতে-কলমে করে বেশ একটা working knowledge হতে পারবে। পরে বড় বড় factory-তে গিয়ে কাজ দেখলে আরও সুবিধা হতে পারে।······

দাদা

(৬)

১৯শে জানুয়ারি
১৯১২

টুনি,

······আমাদের এখানে খুব শীত পড়েছে। পরশু রাত্রে খুব বরফ পড়েছিল। সকালে উঠে দেখি সামনের মিউজিয়মের ছাতে কার্নিশের ধারে সব সাদা হয়ে রয়েছে। লন্ডনের বাইরে অনেক জায়গায় ৭/৮ ইঞ্চি পুরু হয়ে রাস্তায় বরফ জমেছিল।

এর মধ্যে একদিন একটা প্রকাণ্ড ছাপাখানা দেখতে গিয়েছিলাম। সাততলা বাড়ি, electric lift-এ চড়ে উপরে উঠলাম। এক জায়গায় একটা প্রকাণ্ড প্রেসে একটা magazine, The Race Horse, ছাপা হচ্ছে। একটা প্রকাণ্ড রোলারের উপর মাইল ২/৩ লম্বা কাগজের roll জড়ানো রয়েছে। সেই কাগজটা এক দিক দিয়ে ঢুকছে, আর এক দিক দিয়ে ছাপানো, ভাঁজ করা আস্ত magazine-টা ঝুর-ঝুর করে পড়ছে। ঘড়ি নিয়ে দেখলাম মিনিটে দুশোটা magazine বেরোচ্ছে। ভোঁ-ভোঁ করে এমন একটা ভয়ানক শব্দ হচ্ছে যে কাছে গেলে কান বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

এখানের রান্নাটা এখন আগের চেয়ে ভালো হয়েছে। Cook কার কাছ থেকে কতকগুলো দেশী রান্না শিখে নিয়েছে। তাই মাঝে মাঝে ডালের বড়া, জিলাপী, খিচুড়ি, এই সব খেতে দেয়। মন্দ লাগে না।······

দাদা

(৭)

২১ ক্রমওয়েল রোড
২রা ফেব্রুয়ারি ১৯১২

মা,

···এখানে মাঘোৎসব হয়ে গেল। শুক্রবার ওয়ালডর্ফ হোটেলে মস্ত

পার্টি হল। প্রায় ২৫০ লোক হয়েছিল। আমি চোগাচাপকান পরে গিয়েছিলাম। তাই দেখে অনেকে আমাকে পাদ্রি মনে করেছিল। মিঃ মুখার্জির (ডাঃ পি কে রায়ের জামাই-এর) কাছে কেউ কেউ খোঁজ করেছিলেন, 'ইনি কি ব্রাহ্ম প্রচারক?' দুই একজন আমাকেই সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমিই বুঝি আজকাল ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কর?' প্রত্যেককে বলে দিতে হল এটা পাদ্রির পোষাক নয়। আমাদের দেশে এরকম পোষাক সাধারণ লোকেও পরে থাকে।

তবে পোষাকটায় একটা সুবিধা হয়েছিল। আসবার সময় ক্লোক-রুমে ওভারকোট রেখে আসতে হয়। তারা একটা টিকেট দেয়। আবার ওভারকোট নেবার সময় টিকেট দেখাতে হয়। আমার টিকেট হারিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার পোষাক দেখে লোকটা বোধ হয় মনে করল, 'এ যখন মিশনারি তখন নিশ্চয় ঠকাবে না।' তাই কিছু গোলমাল করল না। আরেকজনের টিকেট ছিল না, তাকে নাকি অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছিল।

পার্টিতে চা হল। কে-জি গুপ্ত ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কিছু বললেন। তার পর গান বাজনা হল। তার পর 'বঙ্গ আমার জননী আমার' আর 'ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা' এই গান হল। তার আগের রবিবার মিসেস্ রায়দের ওখানে প্র্যাকটিস্ করা হয়েছিল। আমিও গেয়েছিলাম।

এখানে আর-ও শীত পড়েছে। সোম-মঙ্গলবার পুকুর-টুকুর সব জমতে আরম্ভ করেছিল। বুধবার সকালে খুব বরফ পড়ল। রাস্তা একেবারে সাদা হয়ে গেল। বরফ যে পড়ে, সাদা সাদা তুলোর মতো, খুব হাল্কা। আজ সকাল থেকে অল্প অল্প বরফ পড়ছে।...রাতে যখন ঘুমোই, উপরে কম্বল, নিচে কম্বল। তার উপর আমার একটা কম্বল চাপিয়ে দিই।

সেদিন ওজন হলাম। ২ মণ ১০ সেরের কিছু উপরে।......

স্নেহের তাতা

(৮)

ম্যাঞ্চেস্টার

বৃহস্পতিবার। ফেব্রুয়ারি

মা,

...দু'দিন হল এখানে এসেছি। এ জায়গাটা লণ্ডনের চেয়ে নোংরা

আর ঠাণ্ডাও বেশি। এখানে কয়েক মাস থেকে, আবার লণ্ডনে যাব। আমি এখানে যে-বাড়িতে আছি, সেখানে আরো দুটি বাঙালী থাকেন। একজন হচ্ছেন অপূর্বকৃষ্ণ দত্তর ছেলে আর হৃষীকেশ মুখার্জি বলে একটি ছেলে।······

বাড়িওয়ালী খুব ভালো মানুষ। বয়স ঢের, বোধ হয় ৭০-এর বেশি হবে। বড্ড বেশি কথা বলে। তার নিজের গল্প, মেয়ে-জামাই, ছেলে, নাতি-নাতনি, সকলের গল্প। সুযোগ পেলেই বলতে আরম্ভ করে। তাছাড়া বুড়ির মতটতগুলো চমৎকার।······গোঁড়ামি একেবারেই নেই।

মিস্টার পিয়ার্সন বলে একজন সাহেব, যাঁর কথা আগেও লিখেছি, যিনি ডাঃ পি কে রায়ের জায়গায় কিছুদিন কাজ করেছিলেন, দিল্লী যাচ্ছেন। বোধ হয় খ্রীস্টমাসের সময় কলকাতায় যাবেন। বেশ বাংলা বলতে পারেন আর মানুষ অতি চমৎকার। যদি আমাদের বাড়ি যান, পাটিসাপ্টা কিম্বা কিছু খাইয়ে দিতে পারলে বড় ভালো হয়। এখানে তাঁর মা থাকেন, বোধ হয় ভাইবোনেরাও কেউ কেউ আছে। তাঁদের ওখানে আমার নিমন্ত্রণ আছে।

স্নেহের তাতা

(৯)

ঠিকানা, তারিখ নেই

মা,

···এর মধ্যে মিসেস্ পিয়ার্সনদের বাড়ি নেমন্তন্ন ছিল ডিনার খাবার। সেখানে আরো দু-তিনজন এসেছিলেন, আলাপ হল।

কাল এখানকার (ম্যাঞ্চেস্টারের) ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের পার্টি ছিল। অনেক লোক হয়েছিল। বেশ গানটান খাওয়াদাওয়া হল। সকলেই খুব খুশি হলেন। অনেক সাহেব মেম এসেছিলেন।

আমাদের স্কুলের আগেকার প্রিন্সিপ্যাল মিঃ রেনল্ডের সঙ্গে আলাপ হল। ইনি আমাদের দেশী ছেলেদের জন্যে অনেক করেছেন। তাদের পড়াশুনা থেকে থাকবার বন্দোবস্ত পর্যন্ত নিজে করেছেন। এমন কি বিপদের সময় নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন।

বুড়ো মানুষ, ৭০-এর বেশি বয়স হয়েছে। কথা বললে, ভক্তি হয়। ···তিনি ইউনিটেরিয়ান। বললেন কেশববাবু যখন বিলেতে এসেছিলেন,

তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলেন। খুব নাকি ভালো লেগেছিল। এখন স্কুল ছেড়েছেন, তবু নতুন কোনো বিদেশী ছেলে এল কি না, তারা কি পড়ে, কেমন থাকে ইত্যাদি অত্যন্ত আগ্রহ করে খোঁজ নেন, এবং তাদের সঙ্গে আলাপ (করেন)।

এখানকার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের ইনি মেম্বার। আমি মনে করছি এঁর সম্বন্ধে কিছু লিখে, ছবিসুদ্ধ Modern Review কিম্বা প্রবাসীর জন্য পাঠাব।···

(১০)

৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯১২
ম্যাঞ্চেস্টার

খুসী,

···পরশু, মঙ্গলবার, এখানে Shrove Tuesday ছিল। সেদিন স্কুল কলেজ বন্ধ থাকে আর ছেলেদের procession ইত্যাদি বেরোয়। সেদিন ছেলেদের সাত খুন মাপ। তারা সং সেজে রাস্তায় বেরিয়ে বিনা ভাড়ায় জোর করে ট্রামে ওঠে। যার তার মোটর গাড়িতে চড়ে বসে। দল বেঁধে theatre pantomime দেখতে যায় আর সেখানে গোলমাল করে।

দুপুর বেলা ছেলেগুলো সব নানা রকম সাজ করে Owens College থেকে procession করে বেরোল। একটা মোটরকারে প্রায় ১২/১৪ টা ছেলে চড়েছে। একটা ছেলে maid সেজে গাড়ির ছাতে পিছন দিকে মুখ করে, পা ঝুলিয়ে বসেছে। আর তার পেছনে অত্যন্ত disreputable গোছের চেহারা করে এক দল ঘণ্টা ক্যানেস্তারা ইত্যাদি নিয়ে band বেরিয়েছে। Maidটি একটা ঝাঁটা হাতে করে band conduct করছে।

কয়েকজন suffragette সেজেছে, হাতুড়ি হাতে, 'Votes for Women,' ফ্ল্যাগ উড়িয়ে।······মনে করেছিলাম কিছু ফটো তুলব, কিন্তু এমনি বৃষ্টি নামল যে procession-এর সঙ্গে যাওয়া হল না। বাড়ি পালিয়ে এলাম।

আমি বাড়ি আসতেই আমাদের ৭০ বছরের বুড়ি বাড়িওয়ালী সব

জিজ্ঞাসা করতে লাগল। তাঁকে procession-এর গল্প বলতে লাগলাম। সে তো লুটোপুটি খেয়ে হাসতে লাগল।

এখানে ৬/৭ জন বাঙালী। আমাদের বাড়িতেই আমরা ৩ জন··· এদের মধ্যে হৃষীকেশ মুখার্জী বলে একটি ছেলে···তার সঙ্গে বিশেষ আলাপ, বেশ ছেলে। মনটন বেশ ভালো, তবে মাঝে মাঝে একটু ছেলে-মানুষি করে।

···সেদিন আমার বিছানায় বুরুষ, চিরুনি, basin, soap-dish ইত্যাদি রেখে দিয়েছিল, আর apple-pie bed করে দিয়েছিল। অর্থাৎ বিছানার চাদর আর কম্বল মুড়ে এমনি করে দেয় যে শুয়ে পা মেলা যায় না।

আমিও ভোর রাত্রে উঠে তার ঘরের বাইরে তালা মেরে এসেছিলাম। সকাল বেলা maid গিয়ে বুড়িকে বলছে, 'Mr. Mukherjee has been locked in by Mr. Ray.

বুড়ি তো শুনে হেসে fit হবার উপক্রম। 'Oh the boys! Oh the dear boys!' বলে একবার এপাশে একবার ওপাশে ঢলে পড়ছে! সে হাসি একটা দেখবার জিনিস।······

দাদা

(১১)

১২ থর্ণক্লিফ গ্রোভ
হুইটওয়ার্থ পার্ক, ম্যাঞ্চেস্টার
১৪।১১।১২

খুসী

···৩/৪ সপ্তাহ হল ম্যাঞ্চেস্টারে এসেছি। এখানে School of Technology-তে special student হয়ে ভরতি হয়েছি। Lecture course কিছু নিইনি।···Chromolithography-র evening class-এ litho drawing প্র্যাকটিস্ করি। মোটের উপর এখানে খুব ভালোই চলছে। সকালে উঠে স্কুলে দৌড়নোই যা একটু হাঙ্গামা। কারণ ৯॥টার সময় স্কুল।

স্কুলটা প্রকাণ্ড ব্যাপার—৬ তলা বাড়ি। Electric lift-এ করে

উপরে উঠতে হয়। প্রায় ২০/২৫ জন Indian ছেলে এখানে পড়ে। অধিকাংশই textile, না হয় engineering।

...এখানে লন্ডনের চেয়ে বেশি শীত।...এখানকার উচ্চারণেও লন্ডনের চেয়ে তফাৎ। লন্ডনের প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে 'এ' কে 'আই' এর মতো উচ্চারণ করে। যেমন Headache-কে বলবে আইডাইক! রাস্তায় newsboyরা হাঁকে 'পাইপার!' (Paper) 'ডাইলি মাইল!' (Dailymail) এখানে 'এ'গুলো সব 'অ্যা', 'অ্যা'গুলো 'আ' যেমন মানচেস্টার, হাণ্ডুল্। Monday, come হচ্ছে মোণ্ডে, কোম। প্রথমটা ভারি গোলমাল লাগে। তার পর দু-এক দিন শুনলেই অভ্যাস হয়ে যায়।

আমার সঙ্গে আর একজন ছাত্র কাজ করে। সে জাপানী, তার নাম Muraoka। দেখতে বোকা, ভালোমানুষ, কিন্তু ভারি দুষ্টু। সেদিন ডার্করুমে কাজ করছি, আমায় এসে বলছে, 'মিস্তার রায়, এখনি একটা ভারি মজা হবে।' আমি তখন-ও কিছু বুঝিনি।...একটু পরেই Mr. Fishenden (মাস্টার) এসে যেই ডার্করুমের কল খুলতে গেছেন, অমনি তাঁর নাকেমুখে জল লেগেছে। কলের rubber nozzle-টা ঠিক সামনে করে রাখা ছিল। জাপানী অমনি তাড়াতাড়ি বলছে, 'ইভনিন স্তুদেন্ত', অর্থাৎ evening student-দের কেউ ওটা করেছে। জাপানীরা 'ল' বলতে পারে না। এমন কি লিখতে গেলেও অনেক সময় corresponding লিখতে......colleshponding লেখে।

আমার জন্মদিনে এখানে ৬ জন বাঙালীকে নেমন্তন্ন করেছিলাম Supper-এ। চা, কেক, পেস্ট্রি, বিস্কুট, ফল, এই সব ছিল।

দাদা

(১২)

২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯১২
লণ্ডন

মা,

তোমার চিঠি পেয়েছি।............লিখেছ বাবার মাঝে মাঝে লিভারে বেদনা হয়। নীলরতনবাবুকে বলা হয়েছে কি? উনি কি

বললেন ? কাজকর্মের দরুন বাবার শরীর যদি আবার খারাপ হয়, তাই ভাবি।

এখানে আজকাল মিসেস্ পি. কে. রায়দের ট্যাব্লোর ধূম পড়েছে। প্রায়ই উপরে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের ঘরে অ্যাকটিং হয়। আমার উপর ভার দিয়েছেন দেবতাদের কার কি রকম রং, কি রকম অস্ত্র, পোষাক, এই সব খোঁজ করতে। মিউজিয়ম থেকে অনেক খবর সংগ্রহ করে দিয়েছি। এটা মিসেস্ রায়দের বিলাতে মেয়ে পাঠাবার জন্য যে স্কলারশিপ আছে, তার জন্যে হচ্ছে। কেবল মেয়েরা মিলে করছেন। টিকিট করা হচ্ছে।

গত রবিবার মিসেস্ রায়দের বাড়ি লুচি, ছোলার ডাল, (তোমার ডাল) চিংড়িমাছের ডালনা, মোহনভোগ, এই সব খেলাম। খুব চমৎকার হয়েছিল।......

এখানে শীত অনেকটা কমেছে। কিন্তু সকলে বলছেন এত তাড়াতাড়ি কমে যাওয়ার মানে শীত এখনও শেষ হয়নি আবার ফিরে আসবে।

স্নেহের তাতা

(১৩)

২৭এ ফেব্রুয়ারি
ম্যাঞ্চেস্টার

মা,

আজ সে-বাড়ি ছেড়ে আমরা নতুন বাড়িতে এসেছি। আমরা মানে বাড়িওয়ালী পর্যন্ত। বাড়ির বিছানা চেয়ার দেরাজ আলমারি কাল থেকে এনে ফেলছে। এখনও সব গুছিয়ে উঠতে পারেনি। আজ সকালে আগের বাড়ি থেকে খেয়ে ইস্কুলে গিয়েছিলাম আর সন্ধ্যার সময় বাইরে খেয়ে নতুন বাড়িতে এলাম। এসে দেখি জিনিসপত্র সব উলট পালট হয়ে রয়েছে। ঘরে আলো নেই। চিঠির কাগজপত্র দোয়াত কলম কিছুই খুঁজে পেলাম না। তাই মুখুয্যেদের বাড়িতে এসে চিঠি লিখে যাচ্ছি।......

তোমরা কেমন আছ ? খালি তাড়াতাড়ি কয়েক লাইন লিখবার জন্য এখানে এসেছিলাম। এখনি বাড়ি গিয়ে দেখতে হবে জিনিস পত্রের কি

হয়। তা না হলে কাল স্কুলে যাওয়া মুস্কিল হবে। তাড়াতাড়িতে কলার-টলার কোথায় গুঁজেছিলাম মনে নেই।

তোমরা কেমন আছ? আমি ভালো আছি।

স্নেহের তাতা

(১৪)

৮ই মার্চ, ১৯১২
লণ্ডন

টুনি,

তোর চিঠি পেয়েছি।......এখানে শুক্রবার আর শনিবার মিসেস্ রায়দের ট্যাব্লো হল। ঢের লোক হয়েছিল। মোটের উপর খুব ভালোই হয়েছিল। বোধ হয় প্রায় হাজার টাকা লাভ হয়েছে। এখন-ও ঠিক বলা যায় না।

আসছে সপ্তাহে মিসেস্ রায়দের ওখানে 'আমরা' একটা ট্যাব্লো করব। সেটা ঐ ট্যাব্লোর-ই imitation-এ parody করা হবে। আমি লিখেছি, আর কয়েকজন মিলে অ্যাক্ট করব।

পরশুরাত্রে kinema color দেখতে গিয়েছিলাম। দরবারের সমস্ত দেখলাম—চমৎকার। কলকাতায় যা kinema color দেখেছিলাম, এর সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।

বুটুমাসির বিয়ে হয়ে গেছে?

এখানে পার্লামেণ্টে ভোট পাবার জন্য অনেক বছর ধরে মেয়েরা চেষ্টা করছে; তাদের suffragette বলে। একদল suffragette গত সপ্তাহ থেকে ভারি উৎপাত আরম্ভ করেছে। গত সপ্তাহে প্রায় ১৫০ মেয়ে হাতুড়ি হাতে হঠাৎ Regent Street-এর কাছের কতগুলো দোকানের উপর rush করে বড় বড় দামী জানলা ভেঙে ফেলল। পুলিশ প্রায় একশো জনকে ধরে ফেলল। তাদের প্রায় সকলের-ই জেল হয়েছে।

তবু জানলা ভাঙার হুজুগ থামে না। রোজ-ই শুনছি বড় বড় দোকানে বা সরকারী আপিসে জানলা ভাঙা হয়েছে। আমাদের বাড়ি থেকে ৫ মিনিটের রাস্তা Harrods-এর দোকান, (এখানকার Whiteaway Laidlaw।) কাল ভোরে এক দল মেয়ে, (সব ভদ্রলোকের মেয়ে, তার মধ্যে একজন Strand Magagine-এর W. W. Jacobs-এর স্ত্রী)

তার জানলা ভেঙেগ চুরমার করে দিয়েছে। এদের ভয়ে সপ্তাহখানেক ধরে মিউজিয়ম, আর্ট গ্যালারি সব বন্ধ।

এখন চারিদিকেই হুজুগ। সপ্তাহখানেক থেকে coal strike আরম্ভ হয়েছে। এত বড় strike ইংল্যাণ্ডে আর হয়নি। এর মধ্যেই কারখানা, রেলওয়ে সব বন্ধ হয়ে আসবার মত হয়ে উঠেছে।

তোরা কেমন আছিস? আমি ভালো আছি।

দাদা

(১৫)

১লা মে
ম্যাঞ্চেস্টার

খুসী,

...আমি Easter এর ছুটিতে লণ্ডনে গেছিলাম।...আমার এখানের কাজ শেষ হয়েছে। আর ২/৪ দিনের মধ্যেই লণ্ডনে ফিরব।...

এখানে এখন গ্রীষ্ম সবে আরম্ভ হয়েছে। তার মানে এখন বিনা over coat-এ রাস্তায় বেরুনো চলে। দুপুর বেলায় অনেক সময় রাস্তায় চলতে গিয়ে একটু আধটু ঘাম দেখা যায়। লণ্ডনে বোধ হয় আরেকটু গরম পাব।...

গত শনিবার আমাদের এখানে Manchester Indian Association-এর annual dinner ছিল। তাতে স্কুলের Principal, University-র Vice-Chanceller এঁরা ছিলেন।....

Dinner খুব ভালোই। তার পর বক্তৃতা, toasts আর গান। আমি গান করলাম, 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে'। এর আগেও আমাদের এক social-এ গান করেছিলাম। এতেই গাইয়ে বলে আমার ভয়ানক নাম হয়ে গিয়েছে।

Textile Departmentএর এক বুড়ো মাস্টার অমনি...আমার সঙ্গে আলাপ করল। বলল, 'By Gad! I thought you fellows could not sing! By Gad!'

...আমি সেই জাপানী ছেলেকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছিলাম। আমার পর তাকে গাইতে বলা হল। সে তো উঠেই...'মার মার কাট কাট গোছের' সুরে এক গান করল। আর তার পর দম্‌দম্‌-বম্‌বম্‌ গোছের

কি একটা বলে শেষ করল। আমরা তো ভাবলাম খুব বুঝি লড়াই চলেছে। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কি war song?' সে বলল, 'No, love song.'

শুনে সকলেই হো-হো করে হেসে উঠেছে।···

দাদা

(১৬)

পাইন হার্স্ট
বোর্ণমাউথ
১১ই এপ্রিল ১৯১২

বাবা,

গত শনিবার বোর্ণমাউথে এসেছি। লন্ডন থেকে প্রায় তিন ঘন্টা লাগে। এখানে এসে খুব ভালো লাগছে। জায়গাটা ভারি সুন্দর। একেবারে সমুদ্রের ধারে cliff-এর উপর শহর। রাস্তায় চলতে ক্রমাগত ওঠা আর নামা, অনেকটা দার্জিলিঙের কথা মনে হয়। ক'মাস লন্ডনের একঘেয়ে বাড়িঘর দেখে এখন এসব যেন আর-ও ভালো লাগে। এর মধ্যে একদিন একটু মেঘলা হয়েছিল। তা না হলে ··পরিষ্কার রোদ, শীত-ও কম, সকাল বিকাল খুব হাঁটি।

যেখানে রয়েছি এটা একটা বোর্ডিং বাড়ির মতো। Easter-এর ছুটিতে অনেকে বোর্ণমাউথে এসেছে। আমাদের এখানে প্রায় ৩০/৪০ জন লোক। আমার সঙ্গে একটি বাঙালী ছেলে আছে, তার নাম হিরণ্ময় রায়চৌধুরী। অবনীবাবুদের আর্ট স্কুলের ছাত্র, এখানে sculpture শিখছে। ·····বেশ সুন্দর কাজ করে, ছেলেও বেশ ভালো।

আমরা যে টেবিলে খাই সেই টেবিলে এক সাহেব আর মেম আর তাদের ছোট্ট মেয়েও, বছর ৩/৪ হবে, বসেন। সেই মেয়েটি যা মজার, চোখেমুখে কথা বলে। তার মা খাওয়া দেখিয়ে দিতে যান সে তা শুনবে না। এক হাতে প্রকাণ্ড এক চামচে নিয়েছে, আর এক হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে খাবারটা তাতে ঠেলে তুলছে। বলে, 'I do it this way, when I grow up like Mummy I'll use the fawk!' হিরণ্ময় লেমনেড খাচ্ছিল দেখে ও তাড়াতাড়ি বলে উঠেছে—'Don't take it now, its too figgy, it'll get into your nose!'···

তাতা

(১৭)

জুন ২১ ; ১৯১২

খুসী,

……পরশুদিন Mr. Pearson, (যিনি ডাঃ রায়ের জায়গায় এখন আছেন) তাঁর বাড়িতে আমায় Bengali Literature সম্বন্ধে একটা paper পড়বার নেমন্তন্ন (করেছেন) । Mr. Pearson কিছু কিছু বাংলা পড়তে পারেন, খুব ভালো মানুষ। সেখানে গিয়ে Mr. & Mrs. Arnold, Mr. & Mrs. Rothenstein, Dr. P. C. Ray, Mr. Sarbadhikary প্রভৃতি অনেকে, তাছাড়া কয়েকজন অচেনা সাহেব মেম সব উপস্থিত।

শুধু তাই নয়, ঘরে ঢুকে দেখি রবিবাবু বসে রয়েছেন। বুঝতেই পারছিস্, আমার কি রকম অবস্থা। যা হোক, চোখ কান বুজে পড়ে দিলাম। লেখাটার জন্যে খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে। India Office Library থেকে বইটই এনে materials যোগাড় করতে হয়েছিল। তাছাড়া রবিবাবুর কয়েকটা কবিতা, ('সুদূর' 'পরশপাথর' 'সন্ধ্যা' 'কুঁড়ির ভেতরে কাঁদিছে গন্ধ' ইত্যাদি) অনুবাদ করেছিলাম। সেগুলো সকলের খুব ভালো লেগেছিল।…

…Mr. Cheshire আর Mr. Cranmer Byng (Northbrook-এর Secretary আর Wisdom of the East Series-এর Editor) খুব খুশি হয়েছেন। Mr. Byng আমাকে ধরেছেন আর-ও অনুবাদ করে দিতে, তিনি publish করবেন। বলছেন ছুটিতে তাঁর সঙ্গে তাঁর Country House-এ যেতে আর সেখানে বসে লিখতে।

Rothenstein আমার ঠিকানা নিয়ে গেলেন। বললেন, 'You must come to our place to dinner.'

তার পর Pearson-এর ছাতে গেলাম, সেখান থেকে Hampstead Heath-এর চমৎকার view পাওয়া যায়। Pearson লোকটা একটু ভাবুক গোছের। ছাতের উপর রীতিমতো বাগান বসিয়েছে। সেখানে রথী ঠাকুরের সঙ্গেও দেখা হল। রবিবাবু আমাকে দেখেই বললেন, 'এখানে এসে তোমার চেহারা improve করেছে।'

আমাদের এখন long vacation চলছে। September-এর

মাঝামাঝি পর্যন্ত বন্ধ। তার পর L. C. C.-তেই থাকব কি Polytechnic-এ যাব বলতে পারি না।

নিরামিষ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। একেবারে একঘেয়ে রান্না; দেড়মাসে ...অরুচি ধরিয়ে দিয়েছে। এখন এদের vegetable curry-র চেহারা দেখলে রাগ ধরে। সেদিন Pearson-এর সঙ্গে Eustau Miles-এর Vegetarian Restaurant-এ খেতে গিয়েছিলাম, খুব সুন্দর লাগল। তার পর His Majesty's Theatre-এ Oliver Twist দেখতে গেলাম। খুব চমৎকার অ্যাক্ট করল। একটা scene ছিল London Bridge by moonlight, অদ্ভুত!

আমার ওজন এখন 13 stones 4 or 5 poundsএ, light overcoat ইত্যাদি সুদ্ধ, এসে থেমেছে। এই দুই মাস এই ওজন constant রয়েছে। বোধ হয় আর কমবে না।

..................তোরা কেমন আছিস?

দাদা

(১৮)

২৭শে জুন ১৯১২?

মা,

তোমার চিঠি পেয়েছি।

পরশু দিন এখানে আলেকজান্দ্রা উৎসব ছিল। সেদিন সব হাসপাতালের সাহায্যের জন্যে ফুল বিক্রি হয়। রাস্তাঘাটে চারিদিকে সাদা পোষাক পরে মেয়েরা ফুল বিক্রি করে। তাতে যা পয়সা ওঠে সব হাসপাতালের সাহায্যে (দেওয়া হয়)। আমরা রাস্তায় বেরুতেই আমাদের ধরে ৪/৫ জন ফুল গছিয়ে দিল। শেষটায় মুস্কিল দেখে একটা বাসে চড়ে পড়লাম। শুনছি শুধু ফুল বিক্রি করেই দেড় লক্ষ টাকার বেশি আদায় হয়েছে।

ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট সেদিন লণ্ডনে এসেছিলেন। দেখতে গিয়েছিলাম। রাজা, রানী, প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্ সব দেখা হল।

গত শনিবার ব্রাহ্মসমাজে রবিবাবু কর্মযোগ বিষয়ে চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছিলেন। অনেক লোক হয়েছিল।......

স্নেহের তাতা

(১৯)

২৫শে জুলাই ১৯১২ ?

নি,

…আজ একটা বড় পার্টি আছে। মিসেস্ নাইডু আসবেন। আমাদেরও সব নেমন্তন্ন হয়েছে। গত সোমবার এখানের একটা ক্লাবে, East West Societyতে, 'The Spirit of Rabindranath' বলে একটা paper পড়লাম। লোক মন্দ হয়নি। Quest কাগজের editor Mr. Mead (যিনি এখানে রবিবাবুর lecture সব arrange করেছিলেন)—তাঁর প্রবন্ধটা খুব পছন্দ হয়েছে। তিনি সেটা Questএ ছাপাচ্ছেন।

রবিবাবু দু সপ্তাহ nursing homeএ ছিলেন, কয়েকদিন হল সেখান থেকে এসেছেন। তরশু দিন আমরা তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। সেদিন Royal Court Theatreএ তাঁর ডাকঘর অভিনয় হয়েছিল। 'মালিনী' আর 'চিত্রাঙ্গদা'ও বোধ হয় শীগ্গির-ই কোথাও করা হবে। বিলেতে রবিবাবুর খুব-ই নাম হয়েছে। এখানকার বড় বড় Poetরা রবিবাবুর নাম করতে পাগল। এবার যিনি Poet Laureate হলেন, Dr. Bridges, তিনি তাঁর ছেলেকে রবিবাবুর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করবার জন্য নিয়ে এসেছিলেন।

আমি Universityর টাকা পেলেই বোধ হয় Continentএ বেরিয়ে পড়ব। Parisএ ৮/১০ দিন, Germany আর Austriaয় সপ্তাহখানেক, তারপর Switzerland হয়ে, Italyতে ৮/১০ দিন কাটিয়ে, বোধ হয় Trieste থেকে কোনো জাহাজ ধরব। এখান থেকে বেরোতে এখনো মাস দেড়েকের বেশি বোধ হয়।……

দাদা

(২০)

৯ই আগস্ট ১৯১২ ?

মা,

……সেই যে একটা ফটোগ্রাফিক ক্লাবে আমি মাঝে মাঝে ছবি

পাঠাতাম, আজ তাদের ছবি দেবার শেষ দিন। তাই সমস্ত দিন ছবি প্রিন্ট করে দিতে ব্যস্ত ছিলাম।

······তোমাদের ফটো পেয়েছি। বেশ সুন্দর হয়েছে। দাদামশাইকে বড্ড রোগা দেখায়। বাবাকেও একটু রোগা বোধ হল। টুনি বেজায় মোটা হয়েছে।···

কাল থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম। এর আগেও দু'একটা দেখেছি। কিন্তু কালকে ভারি মজার ছিল। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত লোকে ক্রমাগত হেসেছিল। রথীবাবুও···আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। তিনি এখন খুব কাছে একটা বাসা নিয়েছেন। সুতরাং রোজ-ই আমাদের এখানে আসেন। রবিবাবু উত্তরে কোথায় যেন গিয়েছেন।

গত সোমবার ব্যাঙ্ক হলিডে'র ছুটিতে প্রায় সমস্ত দোকান আপিস বন্ধ ছিল। সেদিন আমরা Hendonএ এয়ারোপ্লেন দেখতে গিয়েছিলাম। খুব বাতাস ছিল বলে বেশি কিছু দেখলাম না। এখান থেকে প্রায় ঘণ্টাখানেক মাটির নিচের রেলওয়ে দিয়ে গেলে, গোল্ডার্স গ্রীন স্টেশন। সেখান থেকে বাসে হেণ্ডন যেতে হয়। বাস থেকে নেমেও মাইলখানেক হাঁটতে হয়।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে দেখি ভয়ানক ভিড়। প্রায় সকলেই হেণ্ডন যাচ্ছে। তবে এখানে সব কাজের-ই বন্দোবস্ত ভালো, কাজেই ধাক্কাধাক্কি করতে হয় না। লোকেরা সব ২/৩ জন করে সার বেঁধে লম্বা লাইন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরাও লাইনের পেছনে সার বাঁধলাম। এমনি করে প্রায় ২০/২৫ মিনিট দাঁড়িয়ে বাসে জায়গা পেলাম।

তারপর হেণ্ডনে গিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছু দেখা গেল না। লোকে বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগল। খুব হাওয়া বলে ওড়া বন্ধ ছিল। খানিকক্ষণ পর্যন্ত হাউই ছুঁড়ে লোকদের ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করল। সে হাউই ফেটে নানা রকম নিশান ফানুস পুতুল এই সব বেরোয়। এক বেচারা এয়ারোপ্লেন আপিসের পিওন বাইসাইকেল্ করে সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, লোকেরা তাকে খুব হাততালি দিতে লাগল।

তারপর একটা লোক এসে ফনোগ্রাফের সেই চোঙ্গার মতো একটা চোঙ্গা মুখে দিয়ে ভয়ানক চীৎকার করে বলে গেল—মিস্টার ডিসুজা এখন এয়ারোপ্লেনে করে উড়বেন। কিন্তু এয়ারোপ্লেনটার কি গোলমাল ছিল, কিছুতেই উড়ল না—কয়েক হাত উঠেই ধপ্ করে লাফিয়ে পড়ল।

আমরা তখন বাড়ি ফিরব মনে করছিলাম, এমন সময় কয়েকটা এয়ারোপ্লেন মাঠের মাঝে থেকে উড়ে উঠল। ½ ঘণ্টা খানেক বেশ দেখা গেল।

আসবার সময় বাস পাওয়া গেল না। আধঘণ্টা হেটে গোল্ডার্স গ্রীনের বাস ধরলাম। বাড়ি ফিরতে ৮৷৷টা হয়ে গেল। সাধারণতঃ ৭টার সময় ডিনার খাই। খুব খিদে পেয়েছিল আর রান্নাও বেশ করেছিল। দুজন খেতে আসেনি, তারা অন্য কোথায় খেতে গিয়েছিল। আমরা তিনজনে মিলে পাঁচজনের খাবার খেয়ে ফেললাম।

তোমরা কেমন আছ? আমি ভালো আছি।

স্নেহের তাতা

(২১)

১৬ই আগস্ট
১৯১২

বাবা,

...গতকাল খুসীর চিঠি পেয়েছি। সে লিখেছে তুমি কি একটা ছবি আঁকছিলে। কোন নতুন painting কি?

এবার 'Process Engravers' Monthly-তে Verfasser-এর বইয়ের review করেছে। তার মধ্যে automatic screen adjustment-এর কথায় বলেছে যে ওটা practical কাজে আসা সম্বন্ধে অসুবিধা এই যে বড় complicated হয়ে পড়ে। আর তাছাড়া ওটা কেবল এক রকমের original হলেই ব্যবহার করা চলে। নানান রকম কপি হলে আর machineএ কুলিয়ে ওঠে না। আমি এ কথাটায় একটু protest করে, screen adjusting machine-এর aims আর scope সম্বন্ধে একটা চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি। তার একটা কপি তোমাকে পাঠাব।...

সেদিন Mr. Rothenstein-এর ওখানে গিয়েছিলাম। তিনি রবিবাবুর অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর sketch করেছেন। তার কয়েকটা কপি করে রামানন্দবাবুকে পাঠাব। আমাকে একদিন তাঁর ওখানে গিয়ে sitting দিতে বলেছেন। রামানন্দবাবুর সেই ছবিগুলো পাঠাচ্ছি। তাছাড়া দু'একটা ছবি থেকে autochrome করে পাঠাব। তার থেকে

three-colour করলে বোধ হয় বেশ হবে। এখানে এসে কয়েকখানা খুব সুন্দর autochrome করেছি। Art Gallery-তে কাজ করবারও অনুমতি যোগাড় করছি।

স্নেহের তাতা

(২২)

ট্রেভোস সোয়ানেজ
২রা জানুয়ারি ১৯১৩

বাবা,

মঙ্গলবার বুবা (কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়) আর মেসোমশাইয়ের (সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের) সঙ্গে এখানে এসেছি। কয়েকদিন থেকেই ম্যাঞ্চেস্টারে ফিরব।

এ জায়গাটা অতি সুন্দর। বোর্নমাথের চেয়ে অনেক নির্জন আর দেখতেও সুন্দর। এসে বেশ লাগছে, খুব খিদে আর ভালো ঘুম হয়। এখানে New Year's Day সম্বন্ধে এদের একটা কথা আছে যে কোনো dark লোকে যদি বাড়িতে New Year আনে, অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর রাত বারোটার পরে প্রথম যদি একজন dark লোক বাড়িতে আসে, সেটা ভারি lucky! সেই জন্য ম্যাঞ্চেস্টারেও ঐ সময়ে তাদের বাড়ি যাবার জন্যে অনেক লোক বলেছিল। কেউ কেউ কোনো দেশী ছেলেকে ৩১শে ডিসেম্বর নেমন্তন্ন করে রাত বারোটা পর্যন্ত আটকে রেখে ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে। এখানেও সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত লোকে খুব গানটান করেছে, আমাদের ঘুমোতে দেয়নি।

সেই collotype-এর কয়েকটা প্রুফ তোমাকে পাঠাব বলে আজ দু তিন সপ্তাহ হল রেখেছি। এর মধ্যে গ্যাম্বল সাহেব সেগুলো দেখতে চেয়েছেন, তাই পাঠাতে পারিনি। আসছে মেলে পাঠাতে পারব।

June পর্যন্ত ম্যাঞ্চেস্টারের course, তারপরে এসে মাস দুই কেবল ভালো ভালো firm আর printing works ইত্যাদি দেখা আর সকল রকম information জোগাড় করব। তারপর Continent হয়ে দেশে ফিরব।......

স্নেহের তাতা

(২৩)

১২ থর্নক্লিফ গ্রোভ

হুইটওয়ার্থ পার্ক

ম্যাঞ্চেস্টার

৯/১/১৩

টুনি,

…মাঘোৎসবের সব খবর দিয়ে চিঠি লিখিস্, মনিকেও লিখতে বলিস। আমি মাঘোৎসবের সময় week-end ticket করে লণ্ডনে যাব। সেখানে মাঘোৎসব হবে।

ছুটিতে কয়েকদিন লণ্ডনে আর সোয়ানেজে বেশ কাটিয়ে এলাম। আবার এসে ম্যাঞ্চেস্টারের ধোঁয়া আর অন্ধকারে কাজ করতে ইচ্ছা হয় না। আজ বুকপোস্টে একটা ফটো (গ্রুপ, গত নভেম্বারে তোলা) আর কয়েকটা collotype প্রুফ পাঠালাম।

ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেটখানা পেয়েছি। ম্যাঞ্চেস্টারের ঠিকানায় পাঠানোর দরুন কোন অসুবিধা হয় নি। কারণ এখানে আরও দু একজন ছেলে ছিল।

পিয়ার্সন সাহেবের চিঠি পেয়েছি। তিনি আমাদের ওখানে গিয়ে খুব খুশি হয়েছেন। লিখেছেন, 'আমি তোমার ভাইকে দেখেই চিনেছি যে তোমার ভাই।' মনিকে জিজ্ঞাসা করিস্ ও Process Year Book পেয়েছে কি না।

আমাদের এখানে আজ দু' দিন ধরে খুব পরিষ্কার রোদ হচ্ছে, শীতও কিছু কম। এর পরেই যদি ঠাণ্ডা আসে তবে খুব বেশি frost হবার সম্ভাবনা।

দাদা

(২৪)

হুইটওয়ার্থ পার্ক

ম্যাঞ্চেস্টার

১০ই এপ্রিল ১৯১৩

মা,

তোমার চিঠি পেয়েছি।

টুনির engagement-এর কথা গতবারেই বাবার চিঠিতে পেয়েছি।

এখানে অনেকেই প্রভাতের কথা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে। প্রভাত এখন কোথায় আছে? তার কাজের কি রকম হল?···

এখানে ক'দিন ধরে বড় বিশ্রী দিন করেছে, কেবল মেঘলা আর বৃষ্টি। আবার যেন একটু শীত পড়েছে। আমাদের বাড়ির প্রায় সামনেই বেশ বড় খোলা পার্ক। আশেপাশেও বাড়ি ভালো। আজকাল ক্রমেই দিন লম্বা হয়ে আসছে। আর মাসখানেকের মধ্যে রাত দুটো থেকে ভোর আরম্ভ হবে। তখন রাত ৯/১০টা পর্যন্ত বেশ আলো থাকবে। এবারে গতবারের চেয়ে শীত অনেক কম হয়েছে।···

এবারের প্রবাসী পাইনি। হয়তো এই ডাকেও পেতে পারি। প্রশান্ত মহলানবীশ বিলাত আসছে শুনলাম। এতদিনে হয়তো লণ্ডনে এসেছে। এল কি না জানবার জন্য বুবাকে চিঠি লিখছি।

মে মাসে রবিবাবু আমেরিকা থেকে আসবেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য শুনলাম লণ্ডনে খুব বড় রকমের আয়োজন হচ্ছে। মিসেস পি কে রায় বলেছিলেন তাঁরা ফেব্রুয়ারির শেষে দেশে ফিরবেন। শুনলাম তাঁরা এখনো লণ্ডনে আছেন। এবার লণ্ডনে তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়নি, ঠিকানা জানতাম না।

অক্টোবরে সম্ভবতঃ দেশে ফিরব। অনেকে সে সময়ে ফিরবে, কাজেই সঙ্গীর অভাব হবে না।···

স্নেহের তাতা

সংযোজন ঃ সুকুমার রায়ের রচনা

॥ ১ ॥

ভাবুক সভা

পাত্রগণ

ভাবুকদাদা
প্রথম ভাবুক
দ্বিতীয় ভাবুক
ভাবুক দল

[ভাবুকদাদা নিদ্রাবিষ্ট—ছোকরা ভাবুক দলের প্রবেশ]

১ম ভাবুক—ইকি ভাই লম্বকেশ, দেখছ নাকি ব্যাপারটা ?
ভাবুক দাদা মূর্চ্ছাগত, মাথায় গুঁজে র‍্যাপারটা !
২য় ভাবুক—তাই তো বটে ! আমি বলি এত কি হয় সহ্য ?
সকাল বিকাল এমনধারা ভাবের আতিশয্য !
১ম ভাবুক—অবাক্ কল্লে ! ঠিক যেমন শাস্ত্রে আছে উক্ত—
ভাবের ঝোঁকে এক্কেবারে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত।
সাংঘাতিক এ ভাবের খেলা বুঝতে নারে মূর্খ—
ভাবরাজ্যের তত্ত্ব রে ভাই সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম !
২য় ভাবুক—(যখন) ভাবের বেগে জোয়ার লেগে বন্যা আসে তেড়ে,
আত্মারূপী সূক্ষ্ম শরীর পালায় দেহ ছেড়ে—
(কিন্তু) হেথায় যেমন গতিক দেখছি শঙ্কা হচ্ছে খুব-ই
আত্মাপুরুষ গেছেন হয়তো ভাবের স্রোতে ডুবি।
যেমন ধারা পড়ছে দেখ গুরু-গুরু নিশ্বাস,
বেশিক্ষণ বাঁচবে এমন কর নাকো বিশ্বাস।
কোনখানে হায় ছিঁড়ে গেছে সূক্ষ্ম কোনো স্নায়ু।
ক্ষণজন্ম পুরুষ কিনা, তাইতে অল্প আয়ু।

বিলাপ সঙ্গীত

ভাবনদী পার হবি কে চড়ে ভবের নায় ?
ভাবের ভাবনা ভাবতে ভাবতে ভবের পারে যায় রে

ভাবুক ভবের পারে যায়।
ভবের হাটে ভাবের খেলা, ভাবুক কেন ভোল ?
ভাবের জমি চাষ দিয়ে ভাই ভবের পটোল তোল রে
ভাই, ভবের পটোল তোল্।
শান বাঁধানো মনের ভিটেয় ভাবের ঘুঘু চরে—
ভাবের মাথায় টোক্কা দিলে বাক্য-মানিক ঝরে রে মন,
বাক্য-মানিক ঝরে।
ভাবের ভারে হদ্দ কাবু ভাবুক বলে তায়,
ভাব-তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ভাবের খাবি খায় রে
ভাবুক ভাবের খাবি খায়।
(কীর্তন জমাট হওয়ায় ভাবুকদাদার নিদ্রাচ্যুতি)

ভাবুকদাদা—জুতিয়ে সব করব সিধে, বলে রাখছি পষ্ট—
চ্যাঁচামেচি করে ব্যাটা ঘুমটি করলি নষ্ট !

১ম ভাবুক—ঘুম কি হে ? সি কি কথা ? অবাক্ কল্লে খুব !
ঘুমোও নি তো, ভাবের স্রোতে দিয়েছিলে ডুব।
ঘুমোয় যত ইতর লোকে,—তেলী মুদি চাষা—
তুমি আমি ভাবুক মানুষ ভাবের রাজ্যে বাসা।

ভাবুকদাদা—সে ঘুম নয়, সে ঘুম নয়, ভাবের ঝোঁকে টং,
ভাবের কাজল চোখে দিয়ে দেখছি ভবের রং ;
মহিষ যেমন পড়ে রে ভাই শুকনো নদীর পাঁকে,
ভাবের পাঁকে নাকটি দিয়ে ভাবুক পড়ে থাকে।

১ম ভাবুক—তাই তো বটে, মনের নাকে ভাবের তৈল গুঁজি,
ভাবের ঘোরে ভোঁ হয়ে যাই চক্ষু দুটি বুজি।

২য় ভাবুক—হাঃ হাঃ হাঃ—দাদা তোমার বচনগুলো খাসা,
ভাবের চাপে জমাট, আবার হাস্যরসে ঠাসা।

ভাবুকদাদা—ভাবের ঝোঁকে দেখতেছিলেম স্বপ্ন চমৎকার,
কোমর বেঁধে ভাবুক জগৎ ভবের পগার পার।
আকাশ জুড়ে তুফান চলে, বাতাস বহে দমকায়,
গাছের পাতা শিহরি কাঁপে, বিজলী ঘন চমকায়।
মাভৈ রবে ডাকছি সবে, খুঁজছি ভাবের রাস্তা,
এই ভণ্ডগুলোর গণ্ডগোলে স্বপ্ন হল ভ্যাস্তা !

১ম ভাবুক—যা হবার তা হয়ে গেছে—বলে গেছেন আর্য,
গতস্য শোচনা নাস্তি বুদ্ধিমানের কার্য।
২য় ভাবুক—কি আশ্চর্য ভাবতে গেলে কাঁটা দিচ্ছে মশায়,
এমনি করে মহাত্মারা পড়েন ভাবের দশায়।
ভাবুকদাদা—অন্তরে যার মজুত আছে ভাবের খোরাকি,
তার ভাবের নাচন মরণ বাঁচন বুঝবি তোরা কি?
২য় ভাবুক—পরাবিদ্যা ভাবের নিদ্রা—আর কি প্রমাণ বাকি,
পায়ের ধুলো দাও তো দাদা, মাথায় একটু মাখি।
ভাবুকদাদা—সবুর কর, স্থিরোভব, রাখ এখন টিপ্পনী,
ভাবের একটা ধাক্কা আসছে, সরে দাঁড়াও এক্ষনি।

(ভাবের ধাক্কা)

১ম ভাবুক—বিনিদ্র চক্ষু, মুখে নাহি অন্ন,
আক্কেল বুঝি জড়তাপন্ন।
স্নানবিহীন যে চেহারা রুক্ষ—
এত কি চিন্তা, এত কি দুঃখ?
২য় ভাবুক—সঘনে বহিছে নিশ্বাস তপ্ত—
মগজে ছুটিছে উদ্দাম রক্ত।
দিন নাই রাত নাই—লিখে লিখে হাত ক্ষয়।
একেবারে পড়ে গেলে ভাবের পাতকোয়!
ভাবুকদাদা—শৃঙ্খল টুটিয়া উন্মাদ চিত্ত
আঁকুপাঁকু ছন্দে করিছে নৃত্য।
নাচে ল্যাগব্যাগ তাণ্ডব তালে,
ঝনক জ্যোতি জ্বলিছে ভালে।
জাগ্রত ভাবের শব্দ পিপাসা,
শূন্যে শূন্যে খুঁজিছে ভাষা।
সংহত ভাবের ঝঙ্কার মাঝে
বিদ্রোহ ডম্বরু অনাহত বাজে।
২য় ভাবুক—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ শোন দুড়দাড় মারমার শব্দ
দেবাসুর পশু নর ত্রিভুবন স্তব্ধ।

১ম ভাবুক—বাজে শিঙ্গা ডমরু শাঁখ ঝগঝম্প,
ঘন মেঘ গর্জন, ঘোর ভূমিকম্প।

ভাবুকদাদা—কিসের তরে দিশেহারা, ভাবের ঢেঁকি পাগলপারা
আপনি নাচে নাচে রে।
ছন্দে ওঠে, ছন্দে নামে, নিত্যধ্বনি চিত্তধামে
গভীর সুরে বাজে রে।
রক্ত আঁখি নাচে ঢেঁকি, চিত্ত নাচে দেখাদেখি,
নৃত্যে মাতে মাতে রে।

১ম ভাবুক—চিন্তা পরাহতা বুদ্ধি বিশুষ্কা,
মগজে পড়েছে ভীষণ ফোস্কা।
সরিষার ফুল যেন দেখি দুই চক্ষে!
ডুবজলে হাবুডুবু, কর দাদা রক্ষে!

২য় ভাবুক—সূক্ষ্ম নিগূঢ় নব ঢেঁকিতত্ত্ব,
ভাবিয়া ভাবিয়া নাহি পাই অর্থ!

ভাবুকদাদা—অর্থ! অর্থ তো অনর্থের গোড়া!
ভাবুকের ভাত মারা সুখ-মোক্ষ-চোরা।
যত সব তালকানা অঘামারা আনাড়ে
অর্থ অর্থ করি খুঁজে মরে ভাগাড়ে!
আরে, অর্থের শেষ কোথা, কোথা তার জন্ম?
অভিধান ঘাঁটা, সে কি ভাবুকের কম্ম?
অভিধান, ব্যাকরণ আর ঐ পঞ্জিকা,
ষোল আনা বুজরুকি, আগাগোড়া গঞ্জিকা!
মাখন তোলা দুগ্ধ আর লবণহীন খাদ্য,
আর ভাবশূন্য গবেষণা এ কি ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ?

(ভাবের নামতা)

ভাবের পিঠে রস, তার উপরে শূন্যি—
ভাবের নামতা পড় মানিক, বাড়বে কত পুণ্যি।
(ওরে মানিক মানিক রে নামতা পড় খানিক রে)
ভাব এক্কে ভাব, ভাব দুগুণে ধোঁয়া,

তিন ভাবে ডিস্‌পেপসিয়া, ঢেকুর উঠেবে চোঁয়া।
(ওরে মানিক মানিক রে চুপটি কর খানিক রে)
চার ভাবে চতুর্ভুজ ভাবের গাছে চড়,
পাঁচ ভাবে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত, গাছের থেকে পড়।
(ওরে মানিক মানিক রে, এবার গাছে চড় খানিক রে)
যবনিকা পতন

॥ ২ ॥

খিলিখিল্লির মুল্লুকেতে থাকত নাকি দুই বেড়াল,
একটা শুধোয় আরেকটাকে, তুই বেড়াল না মুই বেড়াল!
তাই থেকে হয় তর্ক শুরু, চিৎকারে তার ভূত পালায়,
আঁচড় কামড় চরকি বাজি, ধাঁই চটাপট চড় চালায়।
খামচা খাবল ডাইনে বাঁয়ে হুড়মুড়িয়ে হুলোর মতো,
উড়ল রোঁয়া চারদিকেতে রাম-ধুনুরির তুলোর মতো।
তর্ক যখন শান্ত হল, ক্ষান্ত হল আঁচড় দাগা,
থাকত দুটো আস্ত বেড়াল, রইল দুটো ল্যাজের ডগা।

॥ ৩ ॥

উঠোন-কোণে কড়াই ছিল,
পায়েস ছিল তাতে,
তাই নিয়ে কাক লড়াই করে,
কুঁকড়ো বুড়োর সাথে।
যুদ্ধ জিতে বড়াই ভারি,
তখন দেখে চেয়ে—
কখন এসে চড়াই পাখি
পায়েস গেছে খেয়ে!

॥ ৪ ॥

দাশুর কীর্তি

নবীনচাঁদ স্কুলে এসেই বলল, কাল তাকে ডাকাতে ধরেছিল। শুনে

স্কুলসুদ্ধ সবাই হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল। 'ডাকাতে ধরেছিল? বলিস্ কিরে!' ডাকাত না তো কি? বিকেলবেলায় সে জ্যোতিলালের বাড়িতে পড়তে গিয়েছিল, সেখান থেকে ফিররার সময়, ডাকাতরা তাকে ধরে মাথায় চাঁটি মেরে, তার নতুন কেনা শখের পিরানটিতে কাদাজলের পিচকিরি দিয়ে গেল। আর যাবার সময় বলে গেল, 'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। নইলে দড়াম করে তোর মাথা উড়িয়ে দেব।' তাই সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে, রাস্তার ধারে প্রায় বিশ মিনিট দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় তার বড়মামা এসে তার কান ধরে বাড়ি নিয়ে গিয়ে বললেন, 'রাস্তায় সঙ সেজে এয়াকি করা হচ্ছিল?' নবীনচাঁদ কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'আমি কি করব? আমায় ডাকাতে ধরেছিল—'; শুনে তার মামা প্রকাণ্ড এক চড় তুলে বললেন, 'ফের জ্যাঠামি!'

নবীনচাঁদ দেখল মামার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। কারণ সত্যি সত্যি-ই তাকে যে ডাকাতে ধরেছিল, এ কথা তার বাড়ির কাউকে বিশ্বাস করানো শক্ত। সুতরাং তার মনের দুঃখ এতক্ষণ মনের মধ্যেই চাপা ছিল। যা হোক, স্কুলে এসে তার দুঃখ অনেকটা বোধ হয় দূর হতে পেরেছিল। কারণ স্কুলের অন্ততঃ অর্ধেক ছেলে তার কথা শুনবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে পড়েছিল। এবং তার প্রত্যেকটি ঘামাচি ফুসকুড়ি আর চুলকানির দাগটি পর্যন্ত তারা আগ্রহ করে, ডাকাতির সুস্পষ্ট প্রমাণ বলে স্বীকার করেছিল। দু-একজন যারা তার কনুইয়ের আঁচড়টাকে পুরনো বলে সন্দেহ করেছিল, তারাও বলল, হাঁটুর কাছে যে ছড়ে গেছে সেটা একেবারে টাটকা নতুন। কিন্তু তার পায়ের গোড়ালিতে যে ঘায়ের মতো ছিল, সেটাকে দেখে কেষ্টা যখন বলল, 'ওটা তো জুতোর ফোস্কা।' তখন নবীনচাঁদ ভয়ানক চটে বলল, 'যাও, তোমাদের কাছে আর কিছুই বলব না।' কেষ্টাটার জন্য আমাদের আর কিছু শোনাই হল না।

ততক্ষণে দশটা বেজে গেছে, ঢং ঢং করে স্কুলের ঘণ্টা পড়ে গেল। সবাই যে-যার ক্লাসে চলে গেলাম; এমন সময় দেখি পাগলা দাশু এক গাল হাসি নিয়ে ক্লাসে ঢুকছে। আমরা বললাম, 'শুনেছিস্, কাল নবুকে ডাকাতে ধরেছিল।' যেমন বলা অমনি দাশরথী হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়ে, বই-টই ফেলে খ্যাঃ-খ্যাঃ-খ্যাঃ-খ্যাঃ করে, হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে একেবারে মেঝের উপর বসে পড়ল। পেটে হাত দিয়ে গড়াগড়ি করে, একবার চিৎ হয়ে, একবার উপুড় হয়ে, তার হাসি আর কিছুতেই থামে

না। দেখে আমরা অবাক্!

পণ্ডিতমশাই ক্লাসে এসেছেন, তখন-ও পুরোদমে তার হাসি চলেছে সবাই ভাবল, 'ছোঁড়াটা ক্ষেপে গেল নাকি?' যা হোক, খুব খানিকটা হুটোপাটির পর সে ঠাণ্ডা হয়ে, বই-টই গুটিয়ে বেঞ্চের উপর উঠে বসল।

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'ও-রকম হাসছিলে কেন?' দাশু নবীনকে দেখিয়ে বলল, 'ঐ, ওকে দেখে।' পণ্ডিতমশাই খুব কড়া রকমের ধমক লাগিয়ে, তাকে ক্লাসের কোণায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন। কিন্তু পাগলার তাতেও লজ্জা নেই। সে সারাটি ঘণ্টা থেকে থেকে বই দিয়ে মুখ আড়াল করে, ফিক্‌ফিক্ করে হাসতে লাগল।

টিফিনের ছুটির সময় নবু দাশুকে চেপে ধরল। 'কি রে দেশো, বড্ড যে হাসতে শিখেছিস্!' দাশু বলল, 'হাসব না? তুমি কাল ধুচনি মাথায় দিয়ে কি রকম নাচটা নেচেছিলে, সে তো আর তুমি নিজে দেখনি। দেখলে বুঝতে কেমন মজা।'

আমরা সবাই বললাম, 'সে কি রকম? ধুচনি মাথায় নাচছিল মানে?'

দাশু বলল, 'তাও জান না? ঐ কেষ্টা আর জগাই—ঐ যা। বলতে না বারণ করেছিল!' আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কি বলছিস্ ভালো করেই বল না।' দাশু বলল, 'কালকে শেঠদের বাগানের পিছন দিয়ে নবু একলা একলা বাড়ি যাচ্ছিল। এমন সময় দুটো ছেলে, তাদের নাম বলতে বারণ—তারা দৌড়ে এসে নবুর মাথায় ধুচনির মতো কি একটা চাপিয়ে, তার গায়ের উপর আচ্ছা করে পিচকিরি দিয়ে পালিয়ে গেল।'

নবু ভয়ানক রেগে বলল, 'তুই তখন কি করছিলি?' দাশু বলল, 'তুমি তখন মাথার থলি খুলবার জন্য ব্যাঙের মতো হাত-পা ছুঁড়ে লাফাচ্ছ দেখে আমি বললাম, ফের নড়বি তো দড়াম করে মথা উড়িয়ে দেব। শুনে তুমি রাস্তার মধ্যে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে। তাই আমি তোমার বড়-মামাকে ডেকে আনলাম।'

নবীনচাঁদের যেমন বাবুয়ানা তেমনি তার দেমাক। সেইজন্য কেউ তাকে পছন্দ করত না। তার লাঞ্ছনার বর্ণনা শুনে সবাই বেশ খুশি হলাম।

ব্রজলাল ছেলেমানুষ, সে ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বলল, 'তবে যে নবীনদা বলছিল তাকে ডাকাতে ধরেছে?' দাশু বলল, 'দূর বোকা, কেষ্টা

কি ডাকাত?' বলতে না বলতেই কেষ্টা সেখানে এসে হাজির। কেষ্টা আমাদের উপরের ক্লাসে পড়ে, তার গায়েও বেশ জোর আছে। নবীনচাঁদ তাকে দেখামাত্র শিকারী বেড়ালের মতো ফুলে উঠল, কিন্তু মারামারি করতে সাহস পেল না। খানিকক্ষণ কটমট করে তাকিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। আমরা ভাবলাম গোল মিটে গেল।

কিন্তু তার পরদিন ছুটির সময় দেখি নবীন তার দাদা মোহনচাঁদকে নিয়ে হন্ হন্ করে আমাদের দিকে আসছে। মোহনচাঁদ ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে, সে আমাদের চাইতে অনেক বড়। তাকে ওরকম ভাবে আসতে দেখে আমরা বুঝলাম এবার একটা কাণ্ড হবে।

মোহন এসেই বলল, 'কেষ্টা কই?' কেষ্টা দূর থেকে তাকে দেখেই কোথায় সরে পড়েছে, তাই তাকে আর পাওয়া গেল না। তখন নবীনচাঁদ বলল, 'ঐ দাশুটা সব জানে। ওকে জিজ্ঞাসা কর।'

মোহন বলল, 'কি হে ছোকরা, তুমি সব জান নাকি?' দাশু বলল, 'না, সব আর জানব কোত্থেকে—এই তো সবে ফোর্থ ক্লাসে পড়ি, একটু ইংরিজি জানি, ভূগোল, বাংলা, জিওমেটরি—' মোহনচাঁদ ধমক দিয়ে বলল, 'সেদিন নবুকে যে কারা সব ঠেঙিয়েছিল, তুমি তার কিছু জানো কিনা?' দাশু বলল, 'ঠেঙায়নি তো, মেরেছিল, খুব অল্প মেরেছিল।'

মোহন একটুখানি ভেংচিয়ে বলল, 'খুব অল্প মেরেছে, না? তবু কতখানি শুনি।'

দাশু বলল, 'সে কিছুই না—ওরকম মারলে একটুও লাগে না।' মোহন আবার ব্যঙ্গ করে বলল, 'তাই নাকি? কি রকম মারলে পর লাগে?'

দাশু খানিকটা মাথা চুলকিয়ে তারপর বলল, 'ঐ সেবার হেডমাস্টার মশাই তোমাকে যেমন বেত মেরেছিলেন, সেই-রকম।' এ কথায় মোহন ভয়ানক চটে দাশুর কান মলে চিৎকার করে বলল, 'দ্যাখ, বেয়াদব, ফের জ্যাঠামি করবি তো চাবকিয়ে লাল করে দেব। কাল তুই সেখানে ছিলি কিনা, আর কি দেখেছিলি, সব খুলে বলবি কিনা?'

জানই তো দাশুর মেজাজ কি রকম পাগলাটে গোছের। সে একটুখানি কানে হাত বুলিয়ে, তারপর হঠাৎ মোহনচাঁদকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করে বসল। কিল ঘুঁষি চড়, আঁচড় কামড়, সে এমনি চটপট চালিয়ে গেল যে আমরা সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

মোহন বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবে নি যে ফোর্থ ক্লাসের একটা রোগা ছেলে

তাকে অমন ভাবে তেড়ে আসতে সাহস পাবে। তাই সে একেবারে থতমত খেয়ে, কেমন যেন লড়তেই পারল না। দাশু তাকে পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে মাটিতে চিৎ করে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এর চাইতেও ঢের আস্তে মেরেছিল।'

ম্যাট্রিক ক্লাসের কয়েকটি ছেলে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা যদি মোহনকে সামলিয়ে না ফেলত, তা হলে সেদিন তার হাত থেকে দাশুকে বাঁচানোই মুশকিল হত।

পরে একদিন কেষ্টাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'হ্যাঁরে, নবুকে সেদিন তোরা অমন করলি কেন?' কেষ্টা বলল, 'ঐ দাশুটাই তো শিখিয়েছিল ও-রকম করতে। আর বলেছিল, তা হলে এক সের জিলিপি পাবি।' আমরা বললাম, 'কৈ, আমাদের তো ভাগ দিলি নে?'

কেষ্টা বলল, 'সে-কথা আর বলিস্ কেন। জিলিপি চাইতে গেলাম, হতভাগা বলে কিনা, আমার কাছে কেন? ময়রার দোকানে যা, পয়সা ফেলে দে, যত চাস্ জিলিপি পাবি।'

আচ্ছা, দাশু কি সত্যি সত্যি পাগল, না কেবল মিচকেমি করে?

॥ ৫ ॥

বর্ণমালাতত্ত্ব

পড় বিজ্ঞান হবে দিকজ্ঞান, ঘুচিবে পথের ধাঁধা,
দেখিবে গুণিয়া, এ দীন দুনিয়া নিয়ম নিগড়ে বাঁধা।
কহে পণ্ডিত, জড়-সন্ধিতে, বস্তু-পিণ্ড ফাঁকে,
অণু-অবকাশে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে, আকাশ লুকায়ে থাকে।
হেথা হোথা সেথা জড়ের পিণ্ড, আকাশ প্রলেপে ঢাকা,
নয়কো কেবল নীরেট গাঁথন, নয়কো কেবলি ফাঁকা।
জড়ের বাঁধন বদ্ধ আকাশে, আকাশ-বাঁধন জড়ে—
পৃথিবী জুড়িয়া সাগর যেমন, প্রাণটি যেমন ধড়ে।
ইথার পাথারে তড়িৎ বিকারে, জড়ের জীবন দোলে,
বিশ্ব-মোহের সুপ্তি ভাঙিছে সৃষ্টির কলরোলে।
শুন শুন শুন তত্ত্ব নূতন, কে যেন স্বপন দিলা,
ভাষা প্রাঙ্গণে স্বরে-ব্যঞ্জনে ছন্দ করেন লীলা।

স্বর-ব্যঞ্জন যেন দেহ-মন, জড়েতে চেতন বাণী,
এক বিনা আরে থাকিতে না পারে, প্রাণ-হারা যেন প্রাণী।
দোঁহে ছাড়ি দোঁহে, মূক রহে মোহে, ভাষার বারতা ভুলি,
স্বরের নিশ্বাসে, আহা উহু ভাষে, ব্যঞ্জনে নাহি বুলি।
স্তিমিত-চেতন জগৎ যখন, মগন আদিম ধূমে,
অঘোর তিমির, স্তব্ধ বধির, স্বপ্ন-মদির ঘুমে ;
আকুল গন্ধে আকাশ-কুসুম উদাসে সকল দিশি,
অন্ধ জড়ের বিজন আড়ালে কি যেন রয়েছে মিশি।
জাগে হা-হুতাশ, স্বরের বাতাস, জড়ের বাঁধন ছিঁড়ি,
ফিরে দিশাহারা, কোথা ধ্রুবতারা, কোথা স্বর্গের সিঁড়ি।
অ-আ-ই-ঈ-উ-ঊ হা হা হি হি হু হু হালকা শীতের হাওয়া,
অলখচরণ প্রেতের চলন, নিশ্বাসে আসা যাওয়া,
খেলে কিনা খেলে, ছায়ার আঙুলে, বাতাসে বাজায় বীণা,
আলস বিভোর আফিঙের ঘোর, বস্তুতন্ত্রহীনা।
ভাবে কুল নাই, শুধু ভেসে যাই, যুগে যুগে চিরদিন,
কাল হতে কালে, আপনার তালে অনাহত বাধাহীন।
অকুল অতলে অন্ধ অচলে, অস্ফুট অমানিশি,
অরূপ আঁধারে আঁখি অগোচরে, অণুতে অণুতে মিশি।
আসে যায় আসে, অবশ আয়াসে, আবেগে আকুল প্রাণে,
অতি আনমনা, করে আনাগোনা, অচেনা অজানা টানে,
আধো আধো ভাষা, আলেয়ার আসা, আপনি আপন হারা,
আদিম আলোতে, আবছায়া পথে, আকাশ-গঙ্গা ধারা।
ইচ্ছা-বিকল ইন্দ্রিয় দল, জড়িত ইন্দ্রজালে,
ইশারা আভাসে, ইঙ্গিতে ভাষে, রহ রহ ইহকালে।
কেন ইতি উতি, উতলা আকুতি, উসখুস উঁকিঝুঁকি,
উড়ে উচাটন, উড়ু উড়ু মন, উদাসে ঊর্ধ্বমুখী।
হের একবার, সবি একাকার, একেরি এলাকা মাঝে
ঐ ওঠে—শুনি, ওঙ্কার ধ্বনি, একূলে ও কূলে বাজে।
ওরে মিথ্যা এ আকাশ-চারণ, মিথ্যা তোদের খোঁজা,
স্বর্গ তোদের বস্তু সাধনে, বহিতে জড়ের বোঝা।
আকাশ বিহনে বস্তু অচল, চলে না জড়ের চাকা,

আইল আকাশে ফোকলা বাতাস, কেবলি আওয়াজ ফাঁকা।
সৃষ্টিতত্ত্ব বিচার কর নি, শাস্ত্র পড় নি দাদা—
জড়ের পিণ্ড আকাশে গুলিয়া, ঠাসিবে ভাষার কাদা।
শাস্ত্র বিধান কর প্রণিধান, ওরে উদাসীন অন্ধ,
ব্যঞ্জন-স্বরে, যেন হরি-হরে, কোথাও রবে না দ্বন্দ্ব।
মরমে মরমে সরম পরশে বাতাস লাগিলে হাড়ে,
ভাষার প্রবাহ পুলক কম্পে, জড়ের জড়তা ছাড়ে।
(তবে) আয় নেমে আয়, জড়ের সভায়, জীবন-মরণ-দোলে,
আয় নেমে আয় ধরণী-ধূলায়, কীর্তন কলরোলে।
আয় নেমে আয় কণ্ঠে-বর্ণে কাকুতি করিছে সবে,
আয় নেমে আয় কর্কশ ডাকে, প্রভাতে কাকের রবে।
নমো নমো নমঃ, সৃষ্টি প্রথম, কারণ জলধি জলে
স্তব্ধ তিমিরে প্রথম কাকলী, প্রথম কৌতূহলে ;
আদিম তমসে প্রথম বর্ণ, কনককিরণমালা,
প্রথম ক্ষুধিত বিশ্বজঠরে প্রথম প্রশ্ন জ্বালা।
কহে—কই কেগো কোথায় কবেগো, কেন বা কাহারে ডাকি ?
কহে—কহ কহ কেন অহরহ, কালের কবলে থাকি ?
কহে কানে কানে করুণ কূজনে, কলকল কত ভাষে,
কহে কোলাহলে, কলহ-কুহরে, কাষ্ঠ-কঠোর হাসে।
কহে কটমট, কথা কাটা কাটা, কেওকেটা কহ কারে ?
কাহার কদর কোকিল কণ্ঠে, কুন্দ কুসুম হারে ?
কবি-কল্পনে, কাব্যে কলায়, কাহারে করিছ সেবা ?
কুবের কেতনে, কুঞ্জ কাননে, কাঙাল কুটিরে কেবা ?
কায়দা কানুনে, কার্যে কারণে, কীর্তি-কলাপ মূলে,
কেতাবে কোরাণে, কাগজে কলমে, কাঁদায়ে কেরানীকুলে ?
কথা কাঁড়ি-কাঁড়ি, কত কানাকড়ি, কাজে কচু কাঁচকলা,
কভু কাছাকোছা, কোর্তা কলার, কভু কৌপীন ঝোলা।
কুটিল কৃপণে, কুৎসা কথনে, কুলীন কন্যাদায়ে,
কর্ম-ক্লান্ত, কালিমা-কান্ত, ক্লিষ্ট কাতর কায়ে।
কলে কৌশলে, কপট কোঁদলে, কঠিনে কোমলে মিঠে—
ক্লেদ-কুৎসিত, কুষ্ঠ কলুষ, কিলবিল কৃমি কীটে।

'ক'য়ের কাঁদনে কাংস্য ক্বণনে, বস্তু চেতন জাগে,
অকাল-ক্ষুধিত খাই-খাই রবে, বিশ্বে তরাস লাগে।
আকাশ অবধি ঠেকিল জলধি, খেয়াল জেগেছে খ্যাপা।
কারে খেতে চায়, খুঁজে নাহি পায়, দেখ কি বিষম হ্যাঁপা।
(খালি) করতালে কভু কীর্তন খোলে ? খোলে দাও চাঁটিপেটা।
নামাও আসরে কয়ের দোসরে, খেঁদেলো খেঁদেলো খেটা।
এখনো খোলেনি মুখের খোলস, এখনো খোলে নি আঁখি,
ক্ষণিক খেয়ালে পেখম ধরিয়া, কি খেলা খেলিল পাখি।
খোল খরতালে, খোলসা খেয়ালে, খোল খোল খোল, বলে
শখের খাঁচার খিড়কি খুলিয়া খঞ্জ-খেয়াল চলে।
প্রখর ক্ষুদিত তোখড় খেয়াল, খেপিয়া রুখিল ত্বরা,
চাখিয়া দেখিল খাসা এ অখিল, খেয়াল-খচিত ধরা।
খুঁজি সুখে দুখে, খেয়ালের ভুলে, খেয়ালে নিরখি সবি,
খেলার খেয়ালে নিখিল খেয়াল লিখিল খেয়াল ছবি।
খেয়ালের লীলা খদ্যোৎ শিখা, খেয়াল খধূপ ধূপে,
শিখী পাখা পরে, নিখুঁত আখরে, খচিত খেয়াল রূপে।
খোদার উপরে খোদকারি করে, ওরে ও ক্ষিপ্ত মতি,
কীলিয়ে অকালে কাঁঠাল পাকালে, আখেরে কি হবে গতি ?
খেয়ে খুরো চাঁটি, খোল কহে খাঁটি, 'খাবি খাব, ক্ষতি নাই।'
খেয়ালের বাণী করে কানাকানি—গতি নাই, গতি নাই।
গতি কিসে হবে, চিন্তিয়া তবে, বচন শুনিনু খাসা,
পঞ্চ-কোষের প্রথম খোসাতে, অন্ন রয়েছে ঠাসা।
আত্মার মুখে আদিম অন্ন, তাহে ব্যঞ্জনগুলি,
অনুরাগে লাগি, করে ভাগাভাগি, মুখে মুখে দাও তুলি।
এত বলি ঠেলি, আত্মারে তুলি, তত্ত্বের লগি ধরি,
খেয়ালের প্রাণী রহে চুপ মানি, বিস্ময়ে পেট ভরি।
কবে কেবা জানে, গতির গড়ানে, গোপন গোমুখী হতে,
কোন ভগীরথে গলাল জগতে গতির গঙ্গা স্রোতে।
দেখ আগাগোড়া, গণিতের গড়া, নিগূঢ় গণন সবি
গতির আবেগে, আগুয়ান বেগে, অগণিত গ্রহ রবি।
গগনে গগনে গোধূলি লগনে, মগন গভীর গানে,

করে গম গম আগম-নিগম, গুরু-গম্ভীর ধ্যানে।
গিরি-গহ্বরে অগাধ সাগরে ; গঞ্জে নগরে গ্রামে,
গাঁজার গাজনে, গোষ্ঠে-গহনে, গোকুলে, গোলক-ধামে।
বিকল অঙ্গ, ভগ্ন-জঙ্ঘ, এ কোন পঙ্গু মুনি ?
কেন ভাঙা ঠ্যাঙে ডাঙায় নামিল, বাঙালা মুলুকে শুনি ?
রাঙা আঁখি জ্বলে, চাঙা হবে বলে, ডিঙাব সাগর গিরি,
কেন ঢঙ ধরি, ব্যাঙাচির মতো, লাঙুলে জুড়িয়া ফিরি ?
টলিল দুয়ার চিত্ত গুহার, চকিতে চিচিং ফাঁক,
শুনি কলকল ছুটে কোলাহল, শুনি চল চল ডাক।
চলে চটপট চকিত চরণ, চোঁচা চম্পট নৃত্যে,
চল চিত্রিত চির চিন্তন, চলে চঞ্চল চিত্তে।
চলে চঞ্চলা চপল চমকে, চারু চৌচির বক্রে,
চলে চন্দ্রিমা, চলে চরাচর, চড়ি চড়কের চক্রে।
চলে চকমকি চোখের চাহনে, চঞ্চরী-চল-ছন্দ,
চলে চিৎকার চাবুক চালনে, চপেট চাপড়ে চণ্ড।
চলে চুপিচুপি চতুর চৌর, চৌদিকে চাহে ত্রস্ত,
চলে চূড়মণি চর্বে চোষ্যে, চটি চৈতনে চোস্ত।
চিকন চাদর চিকুর চাঁচর, চোখা চালিয়াৎ চ্যাংড়া,
চলে চ্যাং ব্যাং, চিতল কাতল, চলে চুনোপুঁটি ট্যাংরা।

[রচনা অসমাপ্ত]

॥ ৬ ॥

হ-য-ব-র-ল

বেজায় গরম। গাছতলায় দিব্যি ছায়ার মধ্যে চুপচাপ শুয়ে আছি, তবু ঘেমে অস্থির। ঘাসের উপর রুমালটা ছিল, ঘাম মুছবার জন্য যেই সেটা তুলতে গিয়েছি, অমনি রুমালটা বলল, 'ম্যাও!'

কি আপদ, রুমালটা ম্যাও করে কেন ?

চেয়ে দেখি রুমাল তো আর রুমাল নেই, দিব্যি মোটাসোটা লাল টকটকে একটা বেড়াল গোঁফ ফুলিয়ে প্যাট-প্যাট করে আমার দিকে চেয়ে আছে।

আমি বললাম, 'কি মুশকিল! ছিল রুমাল, হয়ে গেল একটা বেড়াল।'

অমনি বেড়ালটা বলে উঠল, 'মুশকিল আবার কি? ছিল একটা ডিম, হয়ে গেল দিব্যি একটা প্যাঁকপেঁকে হাঁস। এ তো হামেশাই হচ্ছে।'

আমি খানিক ভেবে বললাম, 'তা হলে তোমায় এখন কি বলে ডাকব? তুমি তো সত্যিকার বেড়াল নও, আসলে তুমি হচ্ছ রুমাল।'

বেড়াল বলল, 'বেড়াল-ও বলতে পার, রুমাল-ও বলতে পার, চন্দ্রবিন্দু-ও বলতে পার।'

আমি বললাম, 'চন্দ্রবিন্দু কেন?'

শুনে বেড়ালটা বলল, 'তাও জান না?' বলে এক চোখ বুজে বিশ্রী ফ্যাচ-ফ্যাচ করে হাসতে লাগল। আমি ভারি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। মনে হল, ঐ চন্দ্রবিন্দুর কথাটা নিশ্চয় আমার বোঝা উচিত ছিল। তাই থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম, 'ও হ্যাঁ—হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।'

বেড়ালটা খুশি হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এ তো বোঝাই যাচ্ছে—চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ, রুমালের মা—হল চশমা। কেমন, হল তো?'

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, কিন্তু পাছে বেড়ালটা আবার সেই-রকম বিশ্রী করে হেসে ওঠে, তাই সঙ্গে সঙ্গে হুঁ-হুঁ করে গেলাম। তারপর বেড়ালটা খানিকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, 'গরম লাগে তো তিব্বত গেলেই পার।' আমি বললাম, 'বলা ভারি সহজ, কিন্তু বললেই তো আর যাওয়া যায় না।'

বেড়াল বলল, 'কেন? সে আর মুশকিল কি?'

আমি বললাম, 'কি করে যেতে হয় তুমি জান?'

বেড়াল এক গাল হেসে বলল, 'তা আর জানি নে? কলকেতা, ডায়মন্ডহারবার, রানাঘাট, তিব্বত, ব্যাস্! সিধে রাস্তা, সওয়া ঘণ্টার পথ, গেলেই হল।'

আমি বললাম, 'তা হলে রাস্তাটা আমায় বাতলে দিতে পার?'

শুনে বেড়ালটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু, সে আমার কর্ম নয়। আমার গেছোদাদা যদি থাকত, তা হলে সে ঠিক ঠিক বলতে পারত।'

আমি বললাম, 'গেছোদাদা কে? তিনি থাকেন কোথায়?'

বেড়াল বলল, 'গেছোদাদা আবার কোথায় থাকবে? গাছেই থাকে।'

আমি বললাম, 'কোথায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়?'

বেড়াল খুব জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'সেটি হচ্ছে না, সে হবার যো নেই।'

আমি বললাম, 'কি রকম?'

বেড়াল বলল, 'সে কি রকম জান? মনে কর তুমি যখন যাবে উলুবেড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, তখন তিনি থাকবেন মতিহারি। যদি মতিহারি যাও, শুনবে তিনি আছেন রামকেষ্টপুরে। আবার সেখানে গেলে দেখবে তিনি গেছেন কাশিমবাজার। কিছুতেই দেখা হবার যো নেই।'

আমি বললাম, 'তা হলে তোমরা কি করে দেখা কর?'

বেড়াল বলল, 'সে অনেক হাঙ্গামা। আগে হিসেব করে দেখতে হবে, দাদা কোথায় কোথায় নেই। তারপর হিসেব করে দেখতে হবে, দাদা এখন কোথায় আছে। তারপর দেখতে হবে, সেই হিসেব মতো যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছবে, তখন দাদা কোথায় থাকবে, তারপর দেখতে হবে—'

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, 'সে কি রকম হিসেব?'

বেড়াল বলল, 'সে ভারি শক্ত। দেখবে কি রকম?' এই বলে সে একটা কাঠি দিয়ে ঘাসের উপর লম্বা আঁচড় কেটে বলল, 'এই মনে কর গেছোদাদা।' বলেই খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে রইল।

তারপর আবার ঠিক তেমনি একটা আঁচড় কেটে বলল, 'এই মনে কর তুমি।' বলে ঘাড় বাঁকিয়ে চুপ করে রইল।

তারপর হঠাৎ আরেকটা আঁচড় কেটে বলল, 'এই মনে কর চন্দ্রবিন্দু।' এমনি করে খানিকক্ষণ কি ভাবে আর একটা করে লম্বা আঁচড় কাটে, আর বলে, 'এই মনে কর তিব্বত'—'এই মনে কর গেছো বৌদি রান্না করছে'—'এই মনে কর গাছের গায়ে একটা ফুটো—'

এই রকম শুনতে শুনতে শেষটায় আমার কেমন রাগ ধরে গেল। আমি বললাম, 'দুর ছাই! কি সব আবোল-তাবোল বকছ, একটুও ভালো লাগে না।'

বেড়াল বলল, 'আচ্ছা, তা হলে আরেকটু সহজ করে বলছি। চোখ বোজ, আমি যা বলব, মনে মনে তার হিসেব কর।'

আমি চোখ বুজলাম।

চোখ বুজেই আছি, বুজেই আছি, বেড়ালের আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। হঠাৎ কেমন সন্দেহ হল, চোখ চেয়ে দেখি বেড়ালটা ল্যাজ খাড়া

করে বাগানের বেড়া টপকিয়ে পালাচ্ছে আর ক্রমাগত ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে হাসছে।

কি আর করি, গাছতলায় একটা পাথরের উপর বসে পড়লাম। বসতেই কে যেন ভাঙা-ভাঙা মোটা গলায় বলে উঠল, 'সাত দুগুণে কত হয়?'

আমি ভাবলাম, এ আবার কে রে? এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, এমন সময় আবার সেই আওয়াজ হল, 'কই জবাব দিচ্ছ না যে? সাত দুগুণে কত হয়?' তখন উপর দিকে তাকিয়ে দেখি একটা দাঁড়কাক স্লেট পেনসিল দিয়ে কি যেন লিখছে আর এক-একবার ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

আমি বললাম, 'সাত দুগুণে চোদ্দ।'

কাকটা অমনি দুলে দুলে বলল, 'হয় নি, হয় নি, ফেল।'

আমার ভয়ানক রাগ হল। বললাম, 'নিশ্চয় হয়েছে। সাতেক্কে সাত, সাত দুগুণে চৌদ্দ, তিন সাত্তে একুশ।'

কাকটা কিছু জবাব দিল না। খালি পেনসিল মুখে দিয়ে খানিকক্ষণ কি ভাবল। তারপর বলল, 'সাত দুগুণে চোদ্দর নামে চার, হাতে রইল পেনসিল।'

আমি বললাম, 'তবে যে বলছিলে সাত দুগুণে চোদ্দ হয় না? এখন কেন?'

কাক বলল, 'তুমি যখন বলেছিলে, তখনো পুরো চোদ্দ হয় নি। তখন ছিল, তেরো টাকা চোদ্দ আনা তিন পাই। আমি যদি ঠিক সময় বুঝে ধাঁ করে চোদ্দ লিখে না ফেলতাম, তা হলে এতক্ষণে হয়ে যেত চোদ্দ টাকা এক আনা নয় পাই।'

আমি বললাম, 'এমন আনাড়ি কথা তো কখনো শুনি নি। সাত দুগুণে যদি চোদ্দ হয়, তা সে সব সময়েই চোদ্দ। এক ঘণ্টা আগে হলেও যা, দশ দিন পরে হলেও তাই।'

কাকটা ভারি অবাক হয়ে বলল, 'তোমাদের দেশে সময়ের দাম নেই বুঝি?'

আমি বললাম, 'সময়ের দাম কি রকম?'

কাক বলল, 'এখানে কদিন থাকতে, তা হলে বুঝতে। আমাদের বাজারে সময় এখন ভয়ানক মাগ্যি, এতটুকু বাজে খরচ করবার যো নেই।

এই তো সেদিন খেটেখুটে চুরিচামার করে খানিকটে সময় জমিয়েছিলাম, তাও তোমার সঙ্গে তর্ক করতে অর্ধেক খরচ হয়ে গেল।'

বলে সে আবার হিসেব করতে লাগল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বসে রইলাম।

এমন সময় হঠাৎ গাছের একটা ফোকর থেকে কি যেন একটা সুরুৎ করে পিছলিয়ে মাটিতে নামল। চেয়ে দেখি, দেড় হাত লম্বা এক বুড়ো, তার পা পর্যন্ত সবুজ রঙের দাড়ি, হাতে একটা হুঁকো, তাতে কলকে-টলকে কিছু নেই, আর মাথা ভরা টাক। টাকের উপর খড়ি দিয়ে কে যেন কি সব লিখেছে।

বুড়ো এসেই খুব ব্যস্ত হয়ে হুঁকোতে দু-এক টান দিয়েই জিগ্‌গেস করল, 'কই, হিসেবটা হল?' কাক খানিক এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'এই হল বলে।'

বুড়ো বলল, 'কি আশ্চর্য। উনিশ দিন পার হয়ে গেল, এখনো হিসেবটা হয়ে উঠল না?'

কাক দু-চার মিনিট খুব গম্ভীর হয়ে পেনসিল চুষল, তারপর জিগ্‌গেস করল, 'কতদিন বললে?'

বুড়ো বলল, 'উনিশ।'

কাক অমনি গলা উচিয়ে হেঁকে বলল, 'লাগ্ লাগ্ লাগ্ কুড়ি!'

বুড়ো বলল, 'একুশ,' কাক বলল, 'বাইশ।'

বুড়ো বলল, 'তেইশ।' কাক বলল, 'সাড়ে তেইশ।'

ঠিক যেন নিলেম ডাকছে।

ডাকতে ডাকতে কাকটা হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি ডাকছ না যে?'

আমি বললাম, 'খামকা ডাকতে যাব কেন?'

বুড়ো এতক্ষণ আমায় দেখে নি, হঠাৎ আমার আওয়াজ শুনেই সে বন-বন করে আট দশ পাক ঘুরে, আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল।

তারপর হুঁকোটাকে দূরবীনের মতো করে চোখের সামনে ধরে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর পকেট থেকে কয়েকখানা রঙিন কাচ বের করে তাই দিয়ে আমায় বার বার দেখতে লাগল। তারপর কোত্থেকে একটা পুরনো দরজির ফিতে এনে সে আমার মাপ নিতে শুরু করল, আর হাঁকতে লাগল, 'খাড়াই ছাব্বিশ ইঞ্চি, হাতা ছাব্বিশ ইঞ্চি,

ছাতি ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলা ছাব্বিশ ইঞ্চি ?'

আমি ভয়ানক আপত্তি করে বললাম, 'এ হতেই পারে না। বুকের মাপও ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলাও ছাব্বিশ ইঞ্চি ? আমি কি শওর ?"

বুড়ো বলল, 'বিশ্বাস না হয়, দেখ।'

দেখলাম ফিতের লেখাটেখা সব উঠে গিয়েছে, খালি ২৬ লেখাটা একটু পড়া যাচ্ছে, তাই বুড়ো যা-কিছু মাপে সব-ই ছাব্বিশ ইঞ্চি হয়ে যায়।

তারপর বুড়ো জিগ্‌গেস করল, 'ওজন কত ?'

আমি বললাম, 'জানি না।'

বুড়ো তার দুটো আঙুল দিয়ে আমায় একটুখানি টিপে টিপে বলল, 'আড়াই সের।'

আমি বললাম, 'সে কি, পটলার ওজন-ই তো একুশ সের, সে আমার চাইতে দেড় বছরের ছোট।'

কাকটা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'সে তোমাদের হিসেব অন্য রকম।'

বুড়ো বলল, 'তা হলে লিখে নাও—ওজন আড়াই সের, বয়স সাঁইত্রিশ।'

আমি বললাম, 'দুৎ। আমার বয়স আট বছর তিন মাস, বলে কিনা সাঁইত্রিশ।'

বুড়ো খানিকক্ষণ কি যেন ভেবে জিগ্‌গেস করল, 'বাড়তি না কমতি ?'

আমি বলতাম, 'সে আবার কি ?'

বুড়ো বলল, 'বলি বয়সটা এখন বাড়ছে না কমছে ?'

আমি বললাম, 'বয়স আবার কমবে কি ?'

বুড়ো বলল, 'তা নয়তো কেবলি বেড়ে চলবে নাকি ? তা হলেই তো গেছি ! কোন দিন দেখব বয়স বাড়তে বাড়তে একেবারে ষাট সত্তর আশী পার হয়ে গেছে। শেষটায় বুড়ো হয়ে মরি আর কি !'

আমি বললাম, 'তা তো হবেই। আশী বছর বয়স হলে মানুষ বুড়ো হবে না !'

বুড়ো বলল, 'তোমার যেমন বুদ্ধি ! আশী বছর বয়স হবে কেন ? চল্লিশ বছর হলেই আমরা বয়স ঘুরিয়ে দিই। তখন আর একচল্লিশ বেয়াল্লিশ হয় না, উনচল্লিশ আটত্রিশ সাঁইত্রিশ করে বয়স নামতে থাকে। এমনি করে যখন দশ পর্যন্ত নামে, তখন আবার বয়স বাড়তে দেওয়া হয়। আমার বয়স তো কত উঠল নামল, আবার উঠল, এখন আমার বয়স

হয়েছে তেরো।' শুনে আমার ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল।

কাক বলল, 'তোমরা একটু আস্তে আস্তে কথা কও। আমার হিসেবটা চটপট সেরে নি।'

বুড়ো অমনি চট্‌ করে আমার পাশে এসে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে ফিসফিস করে বলতে লাগল, 'একটি চমৎকার গল্প বলব। দাঁড়াও একটু ভেবে নি।' এই বলে তার হুঁকো দিয়ে টেকো মাথা চুলকোতে চুলকোতে চোখ বুজে ভাবতে লাগল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'হ্যাঁ, মনে হয়েছে, শোনো—তারপর এদিকে বড় মন্ত্রী তো রাজকন্যার গুলিসূতো খেয়ে ফেলেছে। কেউ কিচ্ছু জানে না। ওদিকে রাক্ষসটা করেছে কি, ঘুমুতে ঘুমুতে হাঁউ-মাউ-কাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ বলে হুড়মুড় করে খাট থেকে পড়ে গিয়েছে। অমনি ঢাক ঢোল সানাই কাঁসি লোকলস্কর সেপাই পল্টন হৈ-হৈ রৈ-রৈ মার-মার কাট-কাট—এর মধ্যে রাজা হঠাৎ বলে উঠলেন, পক্ষীরাজ যদি হবে, তা হলে ন্যাজ নেই কেন? শুনে পাত্র-মিত্র ডাক্তার মোক্তার আক্কেল মক্কেল সবাই বলল, ভালো কথা! ন্যাজ কি হল? কেউ তার জবাব দিতে পারে না, সব সুরসুর করে পালাতে লাগল।'

এমন সময় কাকটা আমার দিকে তাকিয়ে জিগ্‌গেস করল, 'বিজ্ঞাপন পেয়েছ? হ্যাণ্ডবিল?'

আমি বললাম, 'কই না, কিসের বিজ্ঞাপন?' বলতেই কাকটা একটা কাগজের বাণ্ডিল থেকে একখানা ছাপানো কাগজ বের করে আমার হাতে দিল। আমি পড়ে দেখলাম, তাতে লেখা রয়েছে—

শ্রীশ্রীভুশণ্ডিকাগায় নমঃ

শ্রীকাক্কেশ্বর কুচকুচে

৪১নং গেছোবাজার, কাগেয়াপটি

আমরা হিসাবী ও বেহিসাবী, খুচরা ও পাইকারী সকল প্রকার গণনার কার্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করিয়া থাকি। মূল্য এক ইঞ্চি—এক টাকা পাঁচ আনা। Children Half Price অর্থাৎ শিশুদের অর্ধমূল্য। আপনার জুতার মাপ, গায়ের রঙ, কান কটকট করে কিনা, জীবিত কি মৃত, ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিবরণ পাঠাইলেই ফেরত ডাকে ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

আমরা সনাতন বায়স-বংশীয় দাঁড়িকুলীন, অর্থাৎ দাঁড়কাক। আজকাল নানাশ্রেণীর পাতিকাক, হেড়েকাক, রামকাক প্রভৃতি কাকেরাও অর্থলোভে নানারূপ ব্যবসা চালাইতেছে। সাবধান! তাহাদের বিজ্ঞাপনের চটক দেখিয়া প্রতারিত হইবেন না।

কাক বলল, 'কেমন হয়েছে?'

আমি বললাম, 'সবটা তো ভালো করে বোঝা গেল না।'

কাক গম্ভীর হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ভারি শক্ত, সকলে বুঝতে পারে না। একবার এক খদ্দের এসেছিল, তার ছিল টেকো মাথা—'

এই কথা বলতেই বুড়ো মাৎ-মাৎ করে তেড়ে উঠে বলল, 'দেখ, ফের যদি টেকো মাথা টেকো মাথা বলবি তো হুঁকো দিয়ে এক বাড়ি মেরে তোর স্লেট ফাটিয়ে দেব।'

কাক একটু থতমত খেয়ে কি ভাবল, তারপর বলল, 'টেকো নয়, টেপো মাথা, যে-মাথা টিপে টিপে টোল খেয়ে গিয়েছে।'

বুড়ো তাতেও ঠাণ্ডা হল না, বসে গজ-গজ করতে লাগল, কাক বলল, 'হিসেবটা দেখবে নাকি?'

বুড়ো একটু নরম হয়ে বলল, 'হয়ে গেছে? কই দেখি।'

কাক অমনি, 'এই দেখ।' বলে তার স্লেটখানা ঠকাস্ করে বুড়োর টাকের উপর ফেলে দিল। বুড়ো তৎক্ষণাৎ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল আর ছোট ছেলেদের মত ঠোঁট ফুলিয়ে, ও মা, ও পিসি, ও শিবুদা, বলে হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে লাগল।

কাকটা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, 'লাগল নাকি? ষাট ষাট।'

বুড়ো অমনি কান্না থামিয়ে বলল, 'একষট্টি, বাষট্টি, চৌষট্টি—'

কাক বলল, 'পঁয়ষট্টি।'

আমি দেখলাম আবার বুঝি ডাকাডাকি শুরু হয়, তাই তাড়াতাড়ি উঠে বললাম, 'কই হিসেবটা তো দেখলে না?'

বুড়ো বলল, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই তো। কি হিসেব হল পড় দেখি।'

আমি স্লেটখানা তুলে দেখলাম খুদে খুদে অক্ষরে লেখা রয়েছে—

'ইয়াদি কির্দ অত্র কাকালতনামা লিখিতং শ্রীকাক্কেশ্বর কুচকুচে কার্যঞ্চাগে। ইমারৎ খেসারৎ দলিল দস্তাবেজ। তস্য ওয়ারিশানগণ

মালিক দখালকার সত্ত্বে অত্র নায়েব সেরেস্তায় দস্ত ব-দস্ত কায়েম মোকররি পত্তনী পাট্টা অথবা কাওলা কবুলিয়ৎ। সত্যতায় কি বিনা সত্যতায় মুনসেফী আদালতে কিম্বা দায়রায় সোপর্দ আসামী ফরিয়াদী সাক্ষী সাবুদ গয়রহ মোকর্দমা দায়ের কিম্বা আপোস মকমল ডিক্রীজারী নিলাম ইস্তাহার ইত্যাদি সর্বপ্রকার কর্তব্য বিধায়—'

আমার পড়া শেষ না হতেই বুড়ো বলে উঠল, 'এ-সব কি লিখেছ আবোল-তাবোল ?'

কাক বলল, 'ও-সব লিখতে হয়। তা না হলে হিসেব টিকবে কেন ?' ঠিক চৌকসমতো কাজ করতে হলে গোড়ায় এ-সব বলে নিতে হয়।'

বুড়ো বলল, 'তা বেশ করেছ, কিন্তু আসল হিসেবটা কি হল তা তো বললে না ?'

কাক বলল, 'হ্যাঁ, তাও তো বলা হয়েছে। ওহে শেষ দিকটা পড় তো।'

আমি দেখলাম শেষের দিকে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে—

সাত দুগুণে ১৪, বয়স ২৬ ইঞ্চি, জমা ২৷৷ সের, খরচ ৩৭ বৎসর।

কাক বলল, 'দেখেই বোঝা যাচ্ছে অঙ্কটা এল্-সি-এম্ও নয়, জি-সি-এম্ ও নয়। সুতরাং হয় এটা ত্রৈরাশিকের অঙ্ক, না হয় ভগ্নাংশ। পরীক্ষা করে দেখলাম আড়াই সেরটা হচ্ছে ভগ্নাংশ। তা হলে বাকি তিনটে হল ত্রৈরাশিক। এখন আমার জানা দরকার, তোমরা ত্রৈরাশিক চাও, না ভগ্নাংশ চাও ?'

বুড়ো বলল, 'আচ্ছা দাঁড়াও, তাহলে একবার জিগ্গেস করে নি।' এই বলে সে নিচু হয়ে গাছের গোড়ায় মুখ ঠেকিয়ে ডাকতে লাগল, 'ওরে বুধো, বুধো রে।'

খানিক পরে মনে হল কে যেন গাছের ভিতর থেকে রেগে বলে উঠল, 'কেন ডাকছিস্ ?'

বুড়ো বলল, 'কাক্কেশ্বর কি বলছে শোন্।'

আবার সেই রকম আওয়াজ হল, 'কি বলছে ?'

বুড়ো বলল, 'বলছে, ত্রৈরাশিক না ভগ্নাংশ।'

তেড়ে উত্তর এল, 'কাকে বলছে, ভগ্নাংশ, তোকে না আমাকে ?'

বুড়ো বলল, 'তা নয়। বলছে হিসেবটা ভগ্নাংশ চাস, না ত্রৈরাশিক ?'

একটুক্ষণ পরে জবাব শোনা গেল, 'আচ্ছা, ত্রৈরাশিক দিতে বল।'

বুড়ো গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ দাড়ি হাতড়াল, তারপর মাথা নেড়ে

বলল, 'বুধোটার যেমন বুদ্ধি। ভগ্নাংশটা খারাপ হল কিসে? না হে কাক্কেশ্বর, তুমি ভগ্নাংশই দাও।"

কাক বলল, 'তা হলে আড়াই সেরের গোটা সের দুটো বাদ দিলে রইল ভগ্নাংশ আধ সের, তোমার হিসেব হল আধ সের। আধ সের হিসেবের দাম পড়ে খাঁটি হলে দু টাকা চোদ্দ আনা, আর জল মেশানো থাকলে ছয় পয়সা।'

বুড়ো বলল, 'আমি যখন কাঁদছিলাম, তখন তিন ফোঁটা জল হিসেবের মধ্যে পড়েছিল। এই নাও তোমার স্লেট আর এই নাও পয়সা ছটা।'

পয়সা পেয়ে কাকের মহা ফুর্তি। সে টাক-ডুমাডুম টাক-ডুমাডুম স্লেট বাজিয়ে নাচতে লাগল।

বুড়ো অমনি আবার তেড়ে উঠল, 'ফের টাক-টাক বলছিস্? দাঁড়া। ওরে বুধো, বুধো রে! শিগগির আয়। আবার টাক বলছে।' বলতে না বলতেই গাছের ফোকর থেকে মস্ত একটা পোঁটলা মতন কি যেন হুড়মুড় করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। চেয়ে দেখলাম, একটা বুড়ো লোক একটা প্রকাণ্ড বোঁচকার নিচে চাপা পড়ে ব্যস্ত হয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে। বুড়োটা দেখতে অবিকল এই হুঁকোওয়ালা বুড়োর মতো। হুঁকোওয়ালা কোথায় তাকে টেনে তুলবে, না সে নিজেই পোঁটলার উপর চড়ে বসে, 'ওঠ্ বলছি, শিগগির ওঠ্!' বলে ধাঁই ধাঁই করে তাকে হুঁকো দিয়ে মারতে লাগল।

কাক আমার দিকে চোখ মটকিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না? উধোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে। এর বোঝা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে, এখন ও আর বোঝা ছাড়তে চাইবে কেন? এই নিয়ে রোজ মারামারি হয়।'

এই কথা বলতে বলতেই চেয়ে দেখি, বুধো তার পোঁটলা সুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়েই সে পোঁটলা উঁচিয়ে দাঁত কড়-মড় করে বলল, 'তবে রে ইস্টুপিড্ উধো!'

উধোও আস্তিন গুটিয়ে হুকো বাগিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'তবে রে লক্ষ্মীছাড়া বুধো!'

কাক বলল, 'লেগে যা, লেগে যা, নারদ-নারদ!'

অমনি ঝটাপট, খটাখট, দমাদম, ধপাধপ। মুহূর্তের মধ্যে চেয়ে দেখি

উধো চিৎপাত শুয়ে হাঁপাচ্ছে আর বুধো ছটফট করে টাকে হাত বুলোচ্ছে।

বুধো কান্না শুরু করল, 'ওরে ভাই উধো রে, তুই এখন কোথায় গেলি রে?'

উধো কাঁদতে লাগল, 'ওরে হায় হায়! আমাদের বুধোর কি হল রে।'

তারপর দুজনে উঠে খুব খানিক গলা জড়িয়ে কেঁদে, আর খুব খানিক কোলাকুলি করে, দিব্যি খোশ মেজাজে গাছের ফোকরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাই দেখে কাকটাও তার দোকানপাট বন্ধ করে কোথায় যেন চলে গেল।

নেপোর বই

এক

এটা কিন্তু সত্যিকার নেপোর বই নয়। আসল বইটিকে নেপো নিয়ে চলে গিয়েছিল। পরে যখন পাওয়া গেল, দুমড়োনো, মুচড়ানো, আঁচড়ানো, কামড়ানো, খিমচোনো, কাদামাখা, কালো কালো খাবার দাগ লাগা, কোনো কাজেই লাগে না। কিচ্ছু পড়া যায় না, মাঝে মাঝে খোবলানো ছ্যাঁদা। ভাগ্যিস তাতে কিছু লেখা ছিল না, নইলে হয়েছিল আর কি। শুধু মলাটটাই ভালো ছিল আর তাই দিয়েই গুপি এই বালি কাগজের খাতাটাকে বাঁধিয়ে দিয়েছে। হলদে মলাট, তার ওপর বেগনি কালি দিয়ে লেখা 'নেপোর বই'। নইলে নেপো কিছু এমন সৎ বেড়াল নয় যে ওর নামে বইয়ের নাম রাখব। সৎ হলে আর ওর ল্যাজটা—সে যাক গে। মোট কথা ভজুদা বলেছিলেন বইয়ের নাম রাখতে পানুপুরাণ।

আমার নাম পানু, আমার বয়স বারো। সাত মাস আগে বাস থেকে পড়ে গিয়ে আমার শিরদাঁড়ার হাড় জখম হয়েছিল। সেই থেকে আমি হাঁটতে পারি না। তবে একটু একটু করে গায়ে জোর পাচ্ছি আর ডাক্তারবাবু বলেন আমি নাকি চেষ্টা করলেই হাঁটতে পারব, কিন্তু আসলে তা পারি না। আমার একটা দু-চাকাওয়ালা ছোট গাড়ি আছে, দাদু করিয়ে দিয়েছেন, তাতে করে আমি বাড়িময় ঘুরে বেড়াই। তাতে বসেই আমি আমাদের তিন তলার ফ্ল্যাটের প্রত্যেকটি জানলা দিয়ে রাস্তা দেখি। তা যদি না দেখতাম তা হলে আর এ বই লিখবার দরকারই হত না। কিছু টের-ই পেতাম না।

বেশির ভাগ সময় আমি নিজের ঘরে থাকি আর নিজের জানলা দিয়ে দেখি। আমার ঘরে দুটো জানলা। একটার নিচে, বাইরে কার্নিসের উপর লম্বা টিনের টবে বড় মাস্টার আমাকে গাছ-গাছলা করতে শিখিয়েছেন। অদ্ভুত চেহারার সব কাঁটা গাছ, কি সুন্দর ফুল ফোটে। অথচ রোদ

লাগলেও মরে না, গরমের সময়ও শুকোয় না। রোজ ভোরে ঘুম থেকে উঠে গুণে এক মগ জল দিতে হয়।

অন্য জানলার নিচে ভজুদার টব, তাতে ধনেপাতা, রসুন, কাঁচালঙ্কা, টোমাটো ফলাই। বড় মাস্টারের পোড়া বৌ-ও নাকি ওঁদের ছাদের কোণে জলের ট্যাঙ্কের পাশে গাছ গজায়, বেল, যূঁই, রজনীগন্ধা; কুমড়ো গাছে কুমড়ো হয়, মাটির হাঁড়ির তলা ফুটো করে তাতে পুঁই ডাঁটা হয়। বৌকে কেউ নাকি চোখে দেখে নি। তবে দূর থেকে জানলা দিয়ে ওর ঘোমটাপরা মাথা দেখতে পাই। আগে নাকি বৌ পরমাসুন্দরী ছিল, দূর থেকে লোকে তাকে দেখতে আসত। তারপর আধখানা মুখ পুড়ে কালি হলে পর আর কারো সামনে বেরোয় না। তাই নিয়ে বড় মাস্টার কত দুঃখ করেন। বলেন সংসারের সব-ই অসার।

বড় মাস্টার প্রত্যেক রবিবার বিকেলে আমাকে গল্প বলতে আসেন। ঐ সময় আমাদের বাড়ির সবাই বেড়াতে চলে যায়, খালি রামকানাই থাকে। সে আমাদের জন্যে চা আর মাছের কচুরি, মেটুলির ঘুগ্‌নি, এই সব করে দেয়। আটটার সময় বাড়ির লোকেরা ফিরে এলে, বড় মাস্টার বাড়ি যান।

পাশেই বাড়ি; আসলে ছাপাখানা। আমাদের বাড়ির গলি দিয়ে মাপলে আট ফুট তফাতে। একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি ও-বাড়ির চারতলা থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে একতলা অবধি নেমে গেছে। সেটা থেকে মাপলে আরো কাছে। গুপি বলে আমাদের ঘোরানো সিঁড়ি থেকে রং মিস্ত্রিদের একটা তক্তা ফেলে ও নাকি ওদের ঘোরানো সিঁড়িতে গিয়ে উঠতে পারে। তবে বড় মাস্টার থাকেন পাঁচতলার উপরে ছাদের কোণে দুটো ঘরে, ঘোরানো সিঁড়ি অত দূর ওঠে না। বড় মাস্টার ছাপাখানার ভিতরের সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করেন।

ঐখানে উনি প্রুফ দেখেন, তাই ঘর পান। সন্ধ্যেবেলায় ছাপাখানার বড় সাহেবরা চলে গেলে, তাদের গাড়ির শেডে মাস্টারের নাইট স্কুল বসে, তার জন্যে সামান্য মাইনে পান। কষ্টেসৃষ্টে দিন চলে, বড় মাস্টার বলেছেন। অথচ এককালে কি বড়লোকামিটাই না করেছেন। শুনে কষ্ট হয়।

রবিবার ছাড়া রোজ সকালে ভজুদা এসে আমাকে তিন ঘন্টা পড়ান, আটটা থেকে এগারোটা। ক্লাসের বই নিয়ে ঠেসে পড়ান, ইংরিজী, অঙ্ক,

বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, হিন্দী, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান। কি না জানেন ভজুদা। ছবি দেওয়া মোটা মোটা বই এনে আশ্চর্য সব ছবি দেখান। মরুভূমির বালিতে চাপা পড়া হেলিওপোলিসের রাস্তার প্রাচীন কালের রথের চাকার দাগ, আরো কত কি।

ভজুদা খুব ভালো, কিন্তু বেজায় কড়া। আমি তো বাড়িতে বসেই বার্ষিক পরীক্ষা পাস করে উপরের ক্লাসে উঠেছি। এ বছর সাতজন নতুন নতুন ছেলে ভরতি হয়েছে আমাদের ক্লাসে। তাদের কাউকে অবিশ্যি এখনো দেখি নি, গুপির কাছে সব খবর পেয়েছি।

গুপি আমার বন্ধু। প্রত্যেক রবিবার আর ছুটির দিনে সে আমাকে দেখতে আসে। বড় মাস্টারের গল্প শোনে, অদ্ভুত সব গল্প। ওঁর সত্যিকার অভিজ্ঞতার কাহিনী। বর্মার গল্প; প্রশান্ত মহাসাগরে আশ্চর্য সব দ্বীপের গল্প, যার কথা কেউ জানে না; সমুদ্রে ঝড়ের গল্প, জাহাজডুবির গল্প, যুদ্ধের গল্প, ভয়ঙ্কর সব অগ্নিকাণ্ডের গল্প; উত্তরমেরু দক্ষিণমেরুর কথা। মেক্সিকো, ব্রেজিল, কোথায় যান নি বড় মাস্টার, ব্যবসার খাতিরে। তারপর বৌ পুড়ল, মাস্টারের বাঁ ঠ্যাং কাটা গেল, ঘোরাঘুরি ঘুচল। 'একদিন যে মানুষ লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার করত, আজ সে সামান্য কটা টাকার জন্যে সরকারি ছাপাখানায় কপালে একজোড়া ম্যাগনিফাইং চশমা এঁটে প্রুফ দেখে আর সন্ধ্যেবেলা নাইট স্কুল চালায়।'

এই অবধি বলে—পা ঠুকে বড় মাস্টার হেসে বললেন, 'তাতে কোনো দুঃখ নেই, একটু সময় পেলেই নিজের জীবনের সত্যিকার অভিজ্ঞতাগুলো লিখে ফেলব। প্রকাশকরা দু পাতা পড়লেই লুফে নেবে। তখন আমার লাখপতি হওয়া ঠেকায় কে। তোকেও কিছু টাকা দেব।'

মাস্টারের বাঁ ঠ্যাং হাঁটুর নিচে থেকে কাটা। তার জায়গায় চামড়ার স্ট্র্যাপ আর বগলেস দিয়ে একটা কাঠের ঠ্যাং আঁটা। দেখতে অনেকটা টেবিলের পায়ার মতো। মাঝে মাঝে গল্প বলতে বলতে বেশি হাত পা ছুঁড়লে সেটা ফস করে বেরিয়ে আসে। অনেক কষ্টে আবার পরাতে হয়; আমরা সাহায্য করি, মাস্টার ঘেমে নেয়ে ওঠেন। নাকি বড্ড লাগে। অনেক দিন আগে নাকি প্রশান্ত মহাসাগরে বাকি পা-টা হাঙরে খেয়েছিল। অনেক কষ্টে দু মাইল সাঁতরে তবে প্রাণে বেঁচেছিলেন। তা-ও বাঁচতেন না; ভাগ্যক্রমে হঠাৎ শোঁ শোঁ করে সাইমন ঝড় উঠল, তিনতলার সমান ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগল। প্রাণের ভয়ে শিকার ছেড়ে হাঙর সমুদ্রের তলায়

ডুব দিল। অবিশ্যি ঠ্যাংটা সঙ্গে নিতে ভুলল না। বড় মাস্টার খোলাম-কুচির মতো ঢেউয়ের সঙ্গে উঠতে পড়তে লাগলেন।

ভাগ্যিস একটা বড় তেল ট্যাঙ্কারের দয়ালু কাপ্তেন ঠিক সেই সময় তাঁকে দেখতে পেয়ে, পঞ্চাশ মণ তেল ঢেলে ঢেউ শান্ত করে, তাঁকে জাহাজে টেনে তুলেছিলেন, নইলে সে যাত্রা হয়ে গিয়েছিল আর কি। এ ঠ্যাংটা আসলে ঐ জাহাজেরি রান্নাঘরের একটা ভাঙা টেবিলের পায়া। নাবিকদের দয়ার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপে মাস্টার ওটাকে এখনো রেখেছেন। নইলে ছাপাখানার বড় সাহেবের চিঠি নিয়ে গেলে সস্তায়, এমন কি হয়তো বিনি পয়সাতেই, কত ভালো ভালো ঠ্যাং কিনতে পাওয়া যায়, এলুমিনিয়মের কাঠামোর উপর রবার দিয়ে প্ল্যাস্টিক দিয়ে তৈরি। সত্যিকার পা থেকে দেখতে কোনো তফাৎ নেই। বরং ঢের ভালো, আলপিন ফুটলেও টের পাওয়া যায় না। 'তবে এই টেবিল-পায়ার ঠ্যাংটাই বা মন্দ কি? বন্ধুদের দান।'

এই বলে বড় মাস্টার আমার যন্ত্রপাতির বাক্স থেকে লম্বা একটা পেরেক নিয়ে কেঠো পায়ের গোড়ালির কাছে হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে নিলেন। নাকি বোলতায় গর্ত করেছিল। পরে মাস্টার কেঠো পায়ের গুলির কাছে ছোট একটা দেরাজ করে নেবেন; তাতে পয়সাকড়ি রাখবেন, কাকপক্ষীও টের পাবে না। যা পকেটমারের দাপট আজকাল।

বড় মাস্টার চলে গেলে গুপি পকেট থেকে কাগজে মোড়া একটা মলাট-ছেঁড়া বই বের করল। বইটার নাম 'পুষ্পক থেকে পেলন।' গুপির ছোটমামার বই। অনেক কষ্টে জোগাড় করা। আশ্চর্য সব বই আনে গুপি। মঙ্গলের মানুষ, বুধে বিপত্তি, চন্দ্রনাথের চন্দ্রযাত্রা, এই সব। একটা টাইমমেশিনের বই এনেছিল; ঐ মেশিনে চেপে অতীতে ভবিষ্যতে যে সময়ে ইচ্ছা যাওয়া আসা যায়। পড়ে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। তাছাড়া কলের মানুষের গল্প আনে, তাদের রোবো বলে।

এই সবই আমাদের ভালো লাগে। আমরা বড় হয়ে প্রথমেই চাঁদে যাব। গুপির ছোটমামা নাকি চাঁদে জমি কিনবেন। সেখানে ছোট একটা বাড়ি করবেন, তাতে মেশিনে রান্না হবে। তাহলে তো আমাদের সেখানে গিয়ে কোনো অসুবিধাই হবে না। খালি তার আগে আমার পা দুটোকে সারিয়ে নিতে হবে। এদিকে ছোটমামা বি-এস্-সি পাস করেই মহাকাশযান বানাতে শিখবেন। এখন থেকেই তার জন্যে টিন, এলুমিনিয়ম, রবার, বল্টু, এই সব জমাচ্ছেন।

দুই

এর মধ্যে আবার গুপির জন্মদিন করা গেল। আমার ঘরে ; ভজুদা আর বড় মাস্টার মশাইকে নেমন্তন্ন করা হল। সেদিন ছিল রবিবার, আমাদের বাড়ির সবাই বিকেলে চা খাবার পর অন্যান্য রবিবারের মতো দাদুর বাড়ি চলে গেল। খুব ভালো চা হয়েছিল ; কোকা-কোলা, ছাঁচি পান, মাংসের সিঙ্গাড়া, আলু নারকেলের ঘুগনি, আইসক্রীম। গুপিদের বাড়িতে কারো জন্মদিন হয় না। গুপির দাদু বলেন জন্মদিন করলেই নাকি লোকেরা মারা যায়। অথচ ওঁরা কারো জন্মদিন করেন না, তবু ওঁদের পূর্বপুরুষেরা কেউ বেঁচে নেই। তার মানে জন্মদিন না করলেও লোকেরা মরে।

ভজুদার কাজকর্ম সেরে অনেক দেরি করে আসার কথা। প্রথমে গুপি এসেই 'চাঁদের যাত্রী' বলে দু-টাকা দামের একটা চমৎকার বই আমার হাতে দিল। আমি ঐ বইটা আর বালিশের তলা থেকে দুটো টাকা নিয়ে গুপিকে দিলাম। ওর জন্মদিনের উপহার। প্রথম পাতায় লিখে দিলাম, 'চাঁদের যাত্রীকে জন্মদিনে চাঁদের যাত্রী দিলাম, ইতি, চাঁদের যাত্রী।' বেশ হল না ?

গুপির ঠাকুরদা এসব বইয়ের উপর হাড়ে চটা। তিনি এক সময় জাহাজে চাকরি করতেন। গুপি বলে পৃথিবীতে হেন সাগরতীর নেই যেখানে ওর ঠাকুরদা যান নি। এমন সব অদ্ভুত জিনিস তাঁর নিজের চোখে দেখা যে তিনি আর কল্পনায় বিশ্বাস করেন না। অবিশ্যি অত বড় চাঁদকে কিছু কল্পনার জিনিস বলা যায় না। আবহমান কাল থেকে লোকে তাকে দেখে আসছে, তার টানে সমুদ্রে জোয়ার উঠছে ; রাশিয়ানরা আমেরিকানরা সেখানে রকেট নামিয়েছে পর্যন্ত ; এই সব ছবি দিয়েই 'চন্দ্রযাত্রী' বইটার পাতার পর পাতা ভরতি। যেখানে গাড়ি ঘোড়া নামানো যায়—আর রকেটকে গাড়ি ঘোড়া ছাড়া আজকাল আর কি বলা যায় ? —সেখানকার ডাঙায় যন্ত্র নামিয়ে ফটো তুলে পাঠানো যায়, সে এই পৃথিবীটার চেয়ে কোন দিক দিয়ে বেশি কাল্পনিক হল তা ভেবে পাওয়া যায় না। মোটেই পৃথিবীর সব জায়গার ফটো তোলা হয় নি।

সমস্ত বইটা গুপি এর মধ্যে একবার পড়ে ফেলেছে। অদ্ভুত জীবনযাত্রা ওখানকার। নাকি মহাকাশ-ট্রাকে করে মাটি নিয়ে গিয়ে তবে ধান-গম ফলাতে হবে। তাও সম্ভবতঃ মাটির নীচে ক্ষেত বানিয়ে। সূর্যর এমনি তেজ যে দিনের তাপমাত্রা + ২০০ ডিগ্রী আর রাতের – ২০০ ডিগ্রী। সব ঝলসিয়ে জমিয়ে শেষ করে দেবে। যদি না মাটির তলায় ফসল ফলানো হয়। এক ফোঁটা জল নেই, দু-ভাগ হাইড্রোজেন আর এক ভাগ অক্সিজেন মিলিয়ে জল তৈরি করতে হবে। সে একেবারে বোতলে পোরা বিশুদ্ধ জল, খেলে কারো অসুখ করবে না। অক্সিজেন-ও ওখানে পাওয়া যাবে না, সম্ভবতঃ হাইড্রোজেন-ও না। সব পৃথিবী থেকে নিয়ে যেতে হবে। বাঁচতে হলে সবাইকে বোতলে ভরা অক্সিজেন শুঁকতে হবে। গুপির ছোটমামা তার মস্ত ব্যবসা করে, দেখতে দেখতে ফেঁপে উঠবেন। আগেই বলেছি যাঁরা প্রথম চাঁদে জমি কিনবেন গুপির ছোটমামা তাঁদের মধ্যে একজন। এই ব্যাপারে তিনি আমেরিকায় এরি মধ্যে একটা দরখাস্ত পর্যন্ত দিয়ে রেখেছেন। প্যান্-অ্যাম্ নাকি টিকিট বিক্রি করবে।

অবিশ্যি ওঁদের বাড়িতে এ বিষয়ে কেউ এখনো কিছু জানে না। কারণ গত বছর সামান্য কয়েকটা নম্বরের জন্যে বি-এস্-সি পাস করতে না পারায়, বাড়িতে তাঁকে উদয়াস্ত যা-নয়-তাই শুনতে হয়। তাতে অবিশ্যি তাঁর চাঁদের ব্যবসা কিছু উঠে যাচ্ছে না, ছোটমামা গুপিকে বলেছেন, পরে এরাই কত খোসামোদ করবে।

গুপি বইটাতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'আমরাও ঐ ব্যবসায় ঢুকে পড়ব। ছোটমামার চাঁদের বাড়িতে থাকব, মেশিনের সাহায্যে ওর কাজটাজ করে দেব। তুই তো খুব ভালো মাংস রেঁধেছিলি সেবার যখন ডায়মণ্ড হারবারে পিকনিক হয়েছিল। আর দ্যাখ নেপোকেও নিয়ে যাওয়া যাক। দেখিস্ কেমন দেখতে দেখতে এই বিরাট বাঘের মতো হয়ে যাবে। ওখানে বাতাসের প্রেসার নেই বলে সবাইকে প্রেসার স্যুট পরতে হবে। নেপোকে পরাব না। বাতাসের চাপ না থাকায় ব্যাটা এই এত উঁচু হয়ে উঠবে, বেশ আমাদের বাড়ি পাহারা দেবে। ওদিকে প্যান্টের মধ্যে পুরে লুকিয়ে নিয়ে যেতে পারব, কেউ টের-ও পাবে না। নইলে বেড়ালদেরো চাঁদে যেতে মোটা টাকা দিয়ে টিকিট কিনতে হবে।'

বড় মাস্টার সঙ্গে করে তাঁর নতুন ছোট মাস্টারকে নিয়ে এসেছিলেন।

রোগা, ফরসা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পাৎলা চুল, নাকি সবে টাইফয়েড থেকে উঠেছেন। দু-জনে হাঁ করে গুপির কথা শুনছিলেন আর একটার পর একটা অনেকগুলো মাংসের সিঙ্গাড়া খাচ্ছিলেন। ভজুদা তখনো আসেন নি।

গুপি বলে চলল, 'ওখানে খুব রোবো ব্যবহার হবে। তারাই চাষ করবে, কারখানায় কাজ করবে। নইলে অত অক্সিজেন কে জোগাবে? তাছাড়া রোবোদের খিদেও হয় না, অসুখও হয় না, ভারি সুবিধা। নইলে চাঁদে গোরু মোষ নিয়ে গেলে, সেগুলো তো দেখতে দেখতে আট নয় ফুট উঁচু হয়ে উঠবে। তাদের খাবার জোগাতেই ট্যাঁক গড়ের মাঠ হবে। মাটির তলায় বাঁধা থাকবে, গোয়ালে অক্সিজেন ভরা থাকবে। রোবোরা তাদের দুইলে মণ মণ দুধ পাওয়া যাবে। কে জানে ছোটমামাও হয়তো একটা গোরু কিনে ফেলতে পারে। পায়েস আর রসগোল্লা করাটা ইতিমধ্যে শিখে নিস্, পানু।'

বড় মাস্টার একটু চা খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে এতক্ষণে কথা বললেন, 'অত অক্সিজেন কোথায় পাবে?'

গুপি খুব হাসতে লাগল, 'ছোটমামা বলেছে যে সব কারবন ডায়োক্সাইড্ আমরা নিশ্বাস ফেলব, সেগুলোকে আবার অক্সিজেন বানাবার ব্যবস্থা হচ্ছে শীগ্গির। এক রকম গাছের সাহায্যে।'

নতুন মাস্টার এবার বললেন, 'কিন্তু বন্ধ বালতিতে দুধ দুইতে হবে, নইলে ছল্‌কিয়ে সব বেরিয়ে আসবে। হাওয়ার চাপ নেই তো।'

বড় মাস্টার মাথা নাড়তে লাগলেন। উনিও গুপির ঠাকুরদার সঙ্গে এক মত। এই পৃথিবীটারি সব কিছু দেখার সময় হয় না, তা আবার চাঁদে যাওয়া। গুপি বিরক্ত হয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আমি বললাম, 'চাঁদে যাওয়াটাই আসল কথা নয়, মাস্টার মশাই। চাঁদটা হবে একটা ছোট স্টেশন। সেখানে মহাকাশের আপিস থাকবে; ঐখানে অন্যান্য গ্রহে যাবার টিকিট কাটা যাবে। কারখানা থাকবে, মহাকাশযান মেরামত হবে। চাঁদে আমরা চিরকাল থাকব না।'

মাস্টার মশাই হঠাৎ গুপির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বর্মা গিয়েছ কখনো?' গুপি মাথা নাড়ল। মাস্টার বললেন, 'আমি বর্মায় থাকতাম। সালওয়েন নদীর ধারে সেগুনকাঠের মস্ত ব্যবসা ছিল। আমার বাবা অনেক টাকা করেছিলেন। আমাদের নিজেদের এরোপ্লেন ছিল, নৌকো

ছিল, মাঝ সমুদ্রে যাবার বড় বড় মোটর বোট ছিল। সমুদ্রের ঝড় দেখেছ কখনো?'

গুপি একটা চেয়ারে বসে পড়ে, সেটাকে টেনে মাস্টারের খুব কাছে নিয়ে গেল। ততক্ষণে আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, বাড়ির সবাই দাদুর বাড়ি চলে গেছে। ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসছে, তবু আমার ঘরে আলো জ্বালা হয় নি, ভজুদাও আসেন নি, মাস্টার বললেন, 'একবার দারুণ ঝড়ে পড়েছিলাম। তখন আমার কুড়ি বছর বয়স। রেঙ্গুনের কলেজ থেকে সবে বি-এ পাস করে বেরিয়েছি। মাঝিদের সঙ্গে মাঝ সমুদ্রে মাছ ধরতে গেছিলাম। ওখানে ওরা প্রকান্ড সব মাছ ধরে, এক মণ, দেড় মণ, পর্যন্ত। সমুদ্রের জলটা এত পরিষ্কার যে অনেক নিচে অবধি দেখা যায়। কোথাও কোথাও তলা অবধি দেখতে পাচ্ছিলাম। হয়তো সমুদ্রের নিচে সেখানে চড়া পড়েছিল। সূর্যের আলো সেখানে ফিকে সবুজ হয়ে পৌঁছচ্ছিল। দেখলাম বড় বড় সমুদ্রের আগাছা, জলের নিচে বালির উপর একটু একটু দুলছে। মাঝে মাঝে ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট রঙিন মাছের দল ভেসে যাচ্ছে। থেকে থেকে বড় বড় কালো ছায়ার মতো কি যেন এগিয়ে আসছে। তাই দেখে মাঝিরা কথা বন্ধ করে একেবারে চুপ; নোঙর ফেলা নৌকোটাও স্থির, শুধু ঢেউয়ের দোলায় একটু একটু দুলছে। একবার মনে হল জলের নিচে মস্ত একটা চোখ আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। বুকটা ঢিপ ঢিপ করে উঠল। গাটাও কেমন সিরসির করতে লাগল। তখনো আমার দুটো ঠ্যাং ছিল। এখন আর কেয়ার করি না।

মাঝিদের দিকে তাকিয়ে দেখি, তারাও কেমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, নোঙর তুলে, ডাঙায় ফেরার দিকে তাদের মন। নাকি ঝড় উঠছে। দেখতে দেখতে হাওয়া পড়ে গেল, পশ্চিম দিকে মেঘ জমা হতে লাগল। তার পরেই সূর্যটা একেবারে মুছে গেল। দোতলার সমান উঁচু কালো ঢেউ আমাদের উপর লাফিয়ে পড়তে লাগল। ছোট্ট একটা খেলনার মতো আমাদের নৌকোও একবার ঢেউয়ের মাথায় ওঠে, তার পরেই ঝপাস্ করে পড়ে। মাঝিরা ওস্তাদ, তারা ঠিক হয়ে রইল। পরে জানতে পেরেছিলাম যে ঢেউয়ের ঝাপটা খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত তারা পরদিন ভোরে আধমরা অবস্থায় নিরাপদে ডাঙায় পৌঁছতে পেরেছিল। কিন্তু ঝড়ের গোড়ার দিকেই একটা মস্ত ঢেউ আমাকে ভাসিয়ে নিল।

খানিকটা হাঁসফাঁস করলাম, তারপর আর কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান হল দেখি মহাসাগরের মাঝখানে একটা অজ্ঞাত দ্বীপের বালির তীরে পড়ে আছি। সে কি দ্বীপ! সত্যি বলছি তোদের, পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে, তবে সে সেইখানে। মানুষের বাস নেই; বনমানুষেরা উঁচু গাছে রাত কাটায়। শিম্পাঞ্জীকে বনমানুষ বলে তা জানিস্ তো? আর গাছে গাছে যত ফুল তত ফল। কত যে পাখি তার ঠিকানা নেই। উড়ে এসে কাঁধে বসে, হাত থেকে ফল খায়। ঘাসের উপর খরগোশরা লাফিয়ে বেড়ায়, আমাকে দেখে এতটুকুও ভয় পায় না। দলে দলে হরিণ চরে বেড়ায়। গাছের কোটরে এত বড় বড় মৌচাক।

সারাদিন গাছের পাতার মধ্যে সমুদ্রের হাওয়ার শব্দ, পাখির গান, ঝরণার জল পড়ার আওয়াজ। চোখের সামনে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি ওড়ে; তার পিছনে হলদে বালির তীরে সমুদ্রের সবুজ ঢেউ সারাক্ষণ আছড়ে পড়ে।'

মাস্টারমশাইয়ের কথা শুনতে শুনতে আমার চোখের সামনে থেকে অন্ধকারে ভরা নিজের ঘরটা কোথায় মুছে গেল, ফুটপাথের চায়ের দোকানের ধোঁয়া ধোঁয়া গন্ধ আমার নাক অবধি পৌঁছল না, গা সির-সির করতে লাগল। গুপি ব্যস্ত হয়ে বলল, 'তারপর সেখান থেকে ফিরে এলেন কি করে? কেন এলেন? ই-স্ সেখানে নিশ্চয় গাছে চড়লেই পাখির ডিম! আর হরিণ মারা আর খাওয়া! আচ্ছা, মাস্টারমশাই খরগোশের মাংসও—'

মাস্টারমশাই হঠাৎ কর্কশ গলায় বললেন, 'চুপ!—ঢিল ছুঁড়ে একটা সবুজ পায়রাকে জখম করেছিলাম। মাটিতে পড়ে সেটা ছট্‌ফট্ করছিল; চোখের কোণা দিয়ে একটু রক্ত গড়াচ্ছিল। অমনি শিম্পাঞ্জীর দল আমার ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, একটা নরকোল গাছের গুঁড়ি পড়েছিল, তাতে আমাকে চাপিয়ে, ঠেলে ঠেলে ঢেউ পার করে দিয়ে এল। ভাঁটার টানে কোথায় যে ভেসে গেলাম তার ঠিক নেই। ভাগ্যিস একটা জাপানী সদাগরী জাহাজের চোখে পড়ে গেলাম, নইলে সে যাত্রা হয়েছিল আর কি!' মাস্টারমশাই হঠাৎ কাঠের পা ঠুকে উঠে পড়লেন।

গুপি বলল, 'এক্ষুণি চলে যাবেন না, মাস্টারমশাই, কি করে বর্মা ছেড়ে চলে এলেন, বৌঠানের কি করে মুখ পুড়ল, সেসব কথা—।'

মাস্টারমশাই বেজায় রেগে গেলেন। আমাকে বললেন, 'তোরা বড়

বেশি কথা বলিস্। অন্য লোকের দুঃখ কষ্ট নিয়ে খুব মজা পাস্, না?'

আমি বললাম, 'না মাস্টারমশাই, না। আমাদেরো দুঃখ হয়, মজা পাই না।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, থাক এখন। আরেক দিন বলব। উঠি। আমার নাইটস্কুলের ছেলেরা এক্ষুনি আসবে। মিটিং আছে। তলাপত্র রইল, ওর সঙ্গে গল্প কর।'

মাস্টারমশাই চলে গেলেই ছোট মাস্টার মোড়া থেকে উঠে সেই চেয়ারে বসে বললেন, 'আমার কাছে মহাকাশ-যাত্রা সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো ইংরিজি বই আছে।'

গুপি হঠাৎ মুখের উপর আঙ্গুল রেখে বলল, 'চুপ করে শুনুন! ঐযে ঠক্-ঠক্-ঠক্ শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না? স্পেস্-শিপ বানাচ্ছে।'

ছোট মাস্টার চমকে গিয়ে আরেকটু হলে চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিলেন। আমি বললাম, 'আঃ গুপি! সবাইকে সব কথা বলা কেন?'

কিন্তু ছোট মাস্টারও কিছুতেই ছাড়বেন না, 'কি স্পেস্-শিপ্, কে বানাচ্ছে, বলতেই হবে! আমাকে না বলার কারণ নেই। আমি তো আর কাউকে বলতে যাচ্ছি না!'

তখন আমি বললাম, 'সরকারি ছাপাখানার ওপাশে চার বছর ধরে ঐ যে মস্ত বাড়িটা তৈরি হচ্ছে, গুপি বলে ওখানে মহাকাশ-যান তৈরি হচ্ছে।'

ছোট মাস্টার তো অবাক। 'সে কি? শুনলাম ওটা ঠাণ্ডাঘর। ওখানে আলু পেঁয়াজ জমা থাকবে। ও-পাশেই গঙ্গা। লম্বা চোঙাপথ দিয়ে একেবারে জাহাজের খোলে মাল বোঝাই হয়ে বিদেশে যাবে। বড় মাস্টার তো তাই বললেন।'

গুপি কাষ্ঠ হেসে বলল, 'ঠাণ্ডাঘর করতে কখনো চার বছর লাগে?'

॥ তিন ॥

ঠিক এই সময় কলেজের বিকেলের ক্লাস সেরে ভজুদা উপস্থিত হলেন। মুখে শুধু এক কথা। ওঁদের কলেজের প্রিন্সিপ্যালের নতুন গাড়ি দিন দুপুরে, কলেজের গেটের ভিতর থেকে, একরকম দারোয়ানের

নাকের ডগার তলা দিয়ে চুরি গেছে। এই অবধি শুনে ছোট মাস্টার সুড়সুড় করে সরে পড়লেন। মা-বাবাও তখনি বাড়ি এলেন। সিঁড়িতে ছোট মাস্টারের সঙ্গে দেখা।

ঢুকেই বাবা আমাকে বললেন, 'কে ঐ স্লিপারি কাস্টমারটি? সোজা তাকায় না কেন?'

মা-ও বললেন, 'যাকে তাকে ঘরে ঢোকাস্ নি বাবা, কতবার বলেছি।'

আমি রেগে গেলাম, কিন্তু কিছু বলার আগেই গুপি আস্তে আস্তে বলল, 'না মাসিমা, উনি ভালো লোক, বড় মাস্টারমশাইয়ের নতুন অ্যাসিস্টেণ্ট। ওঁর নাম তলাপত্র, এম-এ পাস।'

বাবা বসে পড়ে বললেন, 'কোত্থেকে ধরে আনে এসব লোক? যে ভাবে মাথা নিচু করে পাশ কাটিয়ে হন্ হন্ করে নেমে গেল, আমি ভাবলাম নির্ঘাৎ কিছু সরিয়েছে। কেমন আছ ভজু?

আমি বললাম, 'ভজুদাদের প্রিন্সিপ্যালের নতুন গাড়ি হাওয়া।'

বাবা চমকে উঠলেন! 'আরে, তোর মেজকাকুর গাড়িও যে পোস্টাপিসের সামনে থেকে ঠিক সাত মিনিটের মধ্যে ডিস্যাপিয়ার্ড!'

মা বললেন, 'কাল সন্ধ্যেবেলায় গেছে আর আজ দুপুরে চিড়িয়া মোড়ে পাওয়া গেল। সুখের বিষয় পাঁচটা টায়ার, ব্যাটারি, যন্ত্রপাতির বাক্স আর হেডলাইট ছাড়া কিচ্ছু হারায়নি। থানার ওঁরা বলেছেন, পুরনো হলে নাকি এইভাবে পাওয়া যায় আর নতুন হলে বেমালুম উধাও। আসবে ঠাকুরপো একটু বাদেই, তার কাছেই শুনো সব কথা।'

বাবা কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'স্রেফ বিদেশে পাচার। বিদেশ তো এখন বেশি দূর নয়। পদ্মাও পার হতে হয় না।' তারপর ভজুদার কাছে শুনলাম যে এই গাড়ি চুরির ব্যাপারেরও একটা ভালো দিক আছে। গড়ে নাকি এই কলকাতা শহর থেকেই রোজ একটা করে গাড়ি চুরি থানায় রিপোর্ট হয়। বেশ কয়েক হাজার বেকার লোক এই দিয়ে করে খাচ্ছে। সেটাকে খুব খারাপ বলতে পারলাম না। তবু একটু সাবধানে থাকাই ভালো। ভাগ্যিস্ দাদুর দেওয়া আমার এই দু চাকার গাড়িটা তিনতলা থেকে নামে না। তবু আজ রাত থেকে ওটাকে আমার পায়ের বুড়ো আঙুলের সঙ্গে সুতো দিয়ে বেঁধে রাখব। এতটুকু টান পড়লেই চোর বাছাধন হাতেনাতে ধরা পড়বেন। হতে পারে আমি চলতে পারি না, কিন্তু আমার হাতে খুব জোর। তাছাড়া রাতে আমার ঘরে রামকানাই

শোয়। সে রোজ ভোরে উঠে আদা দিয়ে ছোলা ভিজে খেয়ে, আধ ঘণ্টা বুকডন করে আর মুগুর ভাঁজে। খুব ঘামে।

গুপি বাড়ি যাবার জন্য উঠেছিল এমন সময় মেজকাকু একজন মোটা বেঁটে লোককে নিয়ে উপস্থিত। লোকটাকে আগেও কাকুর বাড়িতে দেখেছি। ওঁর নাম নিতাই সামন্ত। ডাক নাম কানু। মেজকাকু বলেছেন নাকি দুঁদে ডিটেকটিভ, ওঁর ভয়ে অনেক ঘাটে বাঘে গোরুতে এক সঙ্গে জল খায়। গাড়ি চুরির কথায় বললেন, 'ওরা জানে না, কিন্তু ওদেরো এবার দিন হয়ে এসেছে। যে সে নয়, এবার বাছাধনরা বিনু তালুকদারের পাল্লায় পড়েছে। দিল্লীর পুলিসের বিখ্যাত গোপন গোয়েন্দা বিনু তালুকদার। এদিকে অক্সফোর্ড থেকে বি-এ পাস। নিজের চোখে না দেখলেও শুনেছি দেখে নাকি মনে হয় রোগা লিকলিকে নিরীহ মাস্টার মশাই, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। ওদিকে স্রেফ ম্যাজিশিয়ান!'

গুপি বলল, 'ও মোটর চোরদের ধরে দেবে?'

'দেবে না তো কি! তাদের ঘাঁটিসুদ্ধ বের করে দেবে। এবার আর ছাড়ান-ছোড়ন নয়। তালুকদার বলে গাড়িগুলো একবার গেল তো গেল! যতক্ষণ না চোররা ইচ্ছা করে পথের ধারে ফেলে রাখছে, ততক্ষণ তাদের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। তার মানে এইখানে এই কলকাতা শহরের মধ্যেই ওদের কোনো লুকানো আস্তানা আছে। সেখানে চোরাই গাড়ির রং পালটানো হয়, নম্বর বদলানো হয়, চেহারা এমনি করে দেওয়া হয় যে তাদের আসল মালিকের নাকের সামনে দিয়ে চলে গেলেও মালিকরা টের পায় না। শুধু তাই নয়, যারা এই চোরাই ব্যবসার পাণ্ডা তারাও ভোল বদলে এমনি ভালো মানুষ সেজে থাকে যে তাদেরো চেনা যায় না। এখানে ওখানে ভালো চাকরি-বাকরি করে, গাড়ি হাঁকায়। মাঝে মাঝে ওদের নিজেদের গাড়িও চুরি যাওয়া বিচিত্র নয়। একটা পান দিন তো।'

এই বলে নিতাই সামন্ত খুব হাসতে লাগলেন। তারপর পান খেয়ে আরো বলতে লাগলেন—

'এবার হয়েছে যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। বিনুর দলের টিকটিকিরাও শহরের চারিদিকে চারিয়ে আছে। তাদের টিকিটি চিনবার জো নেই কারো! চোর ছ্যাঁচড় ধরবার জন্যে তারা চোর ছ্যাঁচড় সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে! একেবারে ওদের দলের ভেতরে সেঁদিয়ে তারা সমস্ত ব্যাপারটাকে নস্যাৎ করে দেবে!'

মেজকাকু জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এখানকার আশে-পাশেই কোথাও ওদের ঘাঁটি হয়তো। ঐ তো গঙ্গার ঘাটে মাল বোঝাই নৌকোর ভিড়। ঐ কয়লা আর খড়ের তালের মধ্যে দিব্যি একটা করে আস্ত মোটর গুঁজে পাচার করে দেওয়া যায়। আরে আমারি যে—' এই অবধি বলে আমার আর গুপির দিকে তাকিয়ে মেজকাকু চুপ করলেন।

নিতাই সামন্ত তাড়াতাড়ি বললেন—'এই রকম জায়গাতেই আইন-ভঙ্গকারীরা থাকে! উঃ, তাদের মধ্যে দিব্যি আছেন, দাদা, জানলায় একটা শিক পর্যন্ত নেই!'

বাবা একটু অপ্রস্তুত হলেন, 'ইয়ে তিনতলার উপর সে-রকম—'

শুনে নিতাই সামন্তর সে কি কাষ্ঠ হাসি! 'ঐ আনন্দেই থাকুন, স্যার! আপনার বাড়িটাকে চোরদের সোনার খনি বানিয়ে রাখুন! জানেন, ওঁরা টিকটিকির মতো দেয়াল বেয়ে ওঠানামা করে! ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। আচ্ছা ঐ সরকারি ছাপাখানার শেডে ওরা কারা গুল্‌তানি করছে?'

আমি বললাম,—'বড় মাস্টারের নাইট স্কুলের ছাত্ররা রবিবার ওখানে মিটিং করে।'

নিতাই সামন্ত তো অবাক! 'তাই নাকি! বাঃ, বেড়ে আছে তো, দিনের বেলায় ছাপাখানায় ভালো মাইনের চাকরি, তেওয়ারির দোকানে চারবেলা পাতপাড়া, সন্ধ্যেবেলায় মিটিং আর রাতে—' এই বলে নিতাই সামন্ত উঠে পড়লেন।

মেজকাকুও উঠলেন, 'চলি রে পানু, নিতাইয়ের আবার নাইট-ডিউটি আছে।'

ওঁরা দরজার কাছে যেতেই বাবা গুপিকে বললেন—'কিরে, তোর বাড়িঘর নেই নাকি? যা, ওদের সঙেগই যা।' তারপর দমাস্ দমাস্ করে আমার জানলা দুটো বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিলেন। হাসি পেল। যে কেউ ইচ্ছা করলেই পাশের বাড়ির ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে রাস্তা থেকে উঠে এসে, একটা তক্তা ফেলে আমাদের ঘোরানো সিঁড়িতে উঠতে পারে। রাতে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ থাকে বটে, কিন্তু কার্নিশ দিয়ে দু হাত হাঁটলেই আমাদের পিছনের বারান্দায় ওঠা যায়। তারপর দরজার খড়খড়ির ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে খাবার ঘরের দরজা খুলে ফেলা যায়। রামকানাই নিজে একবার দেরি করে ফেলে, বাইরে বন্ধ হয়ে গিয়ে, ঐ

রকম করে এসেছিল।

পরদিন ভজুদার কাছে কথাটা তুললাম, 'ভজুদা, রাতে রোজ ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনি।'

ভজুদা চোখ পাকিয়ে বললেন, 'ভূতে বিশ্বাস আছে নাকি?'

'না না, ভূত না, কিন্তু কিছু হয়তো তৈরি হচ্ছে ওখানে।'

'কোথায়?'

ঐ ছাপাখানার পিছনে, নতুন ঠাণ্ডা ঘরে।'

'ও তো এখনো শেষই হয় নি। সব বিষয়ে যুক্তি দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করবে।'

'না ভজুদা, ভিতরটা হয়ে গেছে, শুধু সামনের দিকটাই চার বছর ধরে তৈরি হচ্ছে। গুপি বলে—'

ভজুদা বললেন, 'লেখো, একটা বাঁদর একটা তেল-তেলা বাঁশ বেয়ে এক মিনিটে—কি হল?'

'ভজুদা, বড় মাস্টারমশাই নাকি ভূত দেখেছেন। এখানে সব্বাই ভূতের ভয় পায়। সন্ধ্যার পর কেউ ঘাটের গলির দিকে যাবে না। রেলের লাইনে পা দেবে না। রামকানাই বলেছে রাতে ও-লাইনে যে-সব গাড়ি আসে, তারা কোনো মালগুদোম থেকে আসে না।'

ভজুদা বিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'তা হলে কি বুঝতে হবে যে শুধু মানুষ মলেই ভূত হয় না, রেলগাড়িদেরো ভূত হয়? নাও, চটপট অঙ্কটা টুকে ফেল। তাছাড়া একটু হাঁটাচলা করতে অভ্যাস কর এবার। যত সব আজগুবি চিন্তা! ভূতফূত নেই। এক্সারসাইজ করলেই টের পাবে।'

অঙ্ক কষা হয়ে গেলে বললাম, 'আচ্ছা, ভূত না থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে যে কেউ লুকিয়ে স্পেস্-শিপ বানাবে না, তাইবা কি করে বলা যায়?'

ভজুদা অবাক্ হয়ে আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'এ বিষয়ে কয়েকটা বৈজ্ঞানিক বই এনে দেব। তাহলেই বুঝবে যে স্পেস্-শিপ চাট্টিখানিক কথা নয় যে গুদোম ঘরে লুকিয়ে বসে রাতে হাতুড়ি পিটে অমনি বানানো যাবে। আর বড় মাস্টার ভূত দেখেছেন না হাতি দেখেছেন! ওসবে কান দিতে হয় না।' ভজুদা চলে গেলে মনে হল কথাটা না তুললেই পারতাম। গুপি বারণ করেছিল।

সব শুনে, পরের রবিবার বড় মাস্টার বললেন, 'ভূত নেই বলেছে

ভজু? চব্বিশ বছর বয়স না হতেই সব জেনে ফেলেছে নাকি? আমার আটষট্টি বছর বয়স। যতই দিন যায় ততই বুঝি কিছুই জানা হয় নি, আসল জিনিসই সব বাকি আছে। শোন্ তবে। জইন্তিয়া পাহাড়ের নাম শুনেছিস্? এখনকার জইন্তিয়া কি রকম জানি না, কেঠো পা নিয়ে কোথায়-ই বা যেতে পারি বল্? তবু মনে হয় মাঝে মাঝে দুটো পায়ের তলায় যেন জইন্তিয়া পাহাড়ের স্প্রিং-এর মতো ঘাস এখনো টের পাই। মাইলের পর মাইল শুধু ঘাস আর বড় বড় পাথর। পাথরের যে দিকটাতে রোদ পড়ে না, সেদিকে নরম শ্যাওলা হয়ে থাকে। তাতে শীতের আগে ছোট্ট ছোট্ট হলদে আর গোলাপি ফুল ফোটে, খুদে খুদে ফল ধরে। ঘাসজমির পাশেই হয়তো বাঁশবন। সে রকম বাঁশবন তোরা দেখিস্ নি। গাঢ় কালচে সবুজ, আমার পায়ের তিনগুণ মোটা গুঁড়ি থেকে সরু হতে হতে ষাট ফুট উঁচুতে উঠে, কচি কলাপাতা রঙের একগুছি পাতা আর কড়ে আঙুলের মতো সরু একটা কুঁড়িতে গিয়ে শেষ হয়েছে। গুঁড়ির পায়ে পুরু একটা খাপের মতো জড়ানো। তাতে মিহি রোঁয়া, ছুঁলেই আঙুলে লেগে যায় আর জ্বালা করতে থাকে। তার পাশে দিন রাত ঝর ঝর করে পাহাড়ের অনেক উঁচু থেকে জল পড়ে।

পাহাড়ের উপরে দেবদারুর বন। একবার আমার বন্ধু হরিদাস আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। সবুজ পায়রা শিকার করার ইচ্ছা তার। ওখানকার লোকরা অনেক বারণ করেছিল, ও পাহাড়ে নাকি কেউ চড়ে না; পাহাড়ের 'দেউ' ভারি রাগী; কেউ তাঁর জানোয়ার মারলে তাকে নাকি হাতেনাতে সাজা দেন। জিনিস বইবার জন্যে পর্যন্ত একটা লোক পাওয়া গেল না। শেষটা নিজেরাই ব্যাগে করে খাবার, জলের বোতল, টোটা আর কাঁধে বন্দুক নিয়ে চললাম। সারাদিন ঘুরে ঘুরে একটা চড়াইপাখি পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। হরিদাসের কি রাগ। এ বনে জানোয়ার গিজগিজ করে, পাহাড়ের তলা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ পায়রা উড়তে দেখা যায়, অথচ একটা কাঠবেড়ালি পর্যন্ত দেখা গেল না। বিরক্ত হয়ে আমাকে বলল, 'তুমি বড় খড়মড় করে হাঁট, তারি শব্দে জানোয়ার পালায়।' শেষে ক্লান্ত হয়ে বনের মধ্যে ছোট একটা ঝিলের ধারে বসে খাওয়া দাওয়া করলাম। তারপর হরিদাস শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। আমার কেমন বুক টিপটিপ করছিল, চোখে আর ঘুম আসছিল না।

এখানে বনের গাছগুলো যেন অন্য ধরনের, বড় বেশি ঘন, পাতাগুলো বড় বেশি বড়। হঠাৎ চমকে দেখলাম বড় বড় গাছের গুঁড়ির সঙ্গে মিলিয়ে আছে অনেক হাতির পা, তাদের মস্ত কান নাড়াও দেখতে পেলাম। তাকিয়ে তাকিয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিতে লাগল। জঙ্গলের ভেতরকার অন্ধকারে যেই চোখ সয়ে গেল, দেখি হাজার হাজার জানোয়ারের ভিড়, ছোট বড় মাঝারি, বাঘ, ভালুক, হরিণ, ভাম, খরগোশ। গাছের ডালে ডালে পাখি। অথচ এতটুকু শব্দ নেই। হাতি দেখেই বন্দুক তুলে নিয়েছিলাম। এবার সেটা হাত থেকে খসে ঝিলের জলে পড়ে গেল। চারদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব। তারি মধ্যে হরিদাস উঠে বসে, পাগলের মতো এ-পাশে ও-পাশে তাকিয়ে দেখে, বন্দুক সেইখানেই ফেলে রেখে উলটো দিকে টেনে দৌড়। ঐ যে একটু শব্দ, একটু নড়াচড়া, অমনি দেখি চারদিক ভোঁ ভাঁ, কেউ কোথাও নেই। আমার শরীর কাঁপছিল, তবু এক-পা দু-পা করে বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। গাছের নিচে পা দিতেই একটু হাওয়ায় ডালপালা দুলে উঠল আর আমার গায়ে-মাথায় টুপটাপ করে সাদা সাদা বড় বড় ফুল ঝরে পড়তে লাগল। অমনি আমার সব ভয় দূর হল। দেখলাম বনের মধ্যে একেবারে অন্ধকার নয়, গাছের ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত রোদ ঢুকছে। কি জানি মনে হল, দু-মুঠো ফুল কুড়িয়ে, বনের দেউকে মনে করে একটা গাছের গুঁড়িতে ছড়িয়ে দিলাম।

তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে পাহাড় থেকে নেমে এলাম। কত হরিণ, কত পাখি, কত সবুজ পায়রা দেখলাম, দিনের শেষে বাসায় ফিরছে। ডেরায় ফিরতেই দেখি হরিদাস তল্পিতল্পা বেঁধে যাবার জন্যে তৈরি। বললে —'জায়গাটা সত্যি ভালো না!'—সেইদিন-ই ফিরে এলাম।

মাস্টারমশাই থামলে গুপি বলল—'এ আবার কিরকম ভূতের গল্প?'

বড় মাস্টার হেসে বললেন, 'ভূতের গল্পের আবার এ-রকম সে-রকম হয় নাকি? যেমন দেখেছিলাম, বললাম। তলাপত্রকে কেমন লাগল?'

আমি বললাম, 'ভালো। কিন্তু বাবা বললেন—সোজা তাকায় না কেন? মা বললেন—যাকে তাকে ঘরে ঢুকতে দিস্ না। আচ্ছা, মাস্টারমশাই, আমার পা-দুটোতে কি কোনো তফাৎ দেখতে পাচ্ছেন? আমি স্বপ্নে খুব দৌড়ই।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'সে আর এমন কি। আমার নেই-পা-টাতে যখন চুলকোয়, তখন কি করে আরাম পাই বল্ দিকিনি?'

······এক ঝিলিক বিদ্যুতের মতো নেপো জানলা টপকে······

গুপি তখন কথা পালটে বলল, 'জানেন মাস্টারমশাই, মহাকাশযানগুলো যখন অনেক উপরে, অনেক দূরে চলে যায় তখন আর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করে না। কোনো জিনিস নিচের দিকে যায় না, সব উপরে উঠতে থাকে। আমার চন্দ্র-যাত্রার নতুন বইটাতে আছে যাত্রীরা যদি নানান উপায়ে নিজেদের নিচে আটকিয়ে না রাখে, তাহলে সবাই বেলুনের মতো উড়ে গিয়ে আকাশযানের ছাদের কাছে ঝুলে থাকবে।'

বড় মাস্টার মহাকাশযাত্রার কথা শুনলে চটে যান। বিরক্ত হয়ে বললেন, 'নিশ্বাস ফেলবার বাতাস নিয়ে যেতে হয় না বোতলে ভরে? যাত্রীরা উড়ে বেড়াবার জায়গা কোথায় পাবে?'

গুপি বলল, 'আমার চন্দ্রযাত্রার বইয়ের লোকরা একরকম আগাছা নিয়ে গেছিল, তারা যাত্রীদের নিশ্বাস ফেলা কার্বন ডায়োক্সাইডগুলোকে আবার অক্সিজেন বানিয়ে দিত। ঐ আগাছার নাম ডাক্-উইড। বোতলে করে কত বাতাস নেবে? আর শুধু চাঁদে গেলেই তো হল না, চাঁদটা খালি একটা টিকিট কাটার স্টেশনের মতো—।'

বড় মাস্টার উঠে পড়ে, ঠুক ঠুক করে কাঠের পা ঠুকতে ঠুকতে যেই এক পা পেছু হটেছেন অমনি 'ই'—য়া—য়া—ও' করে সে কি বিকট চীৎকার! তাকিয়ে দেখি কেঠো পা ঠিক পড়েছে নেপোর বেঁড়ে ল্যাজের ডগায়! পা-টা তুলতেই এক ঝিলিক বিদ্যুতের মতো নেপো জানলা টপকে ধনে পাতার গাছ মাড়িয়ে কার্নিশ পেরিয়ে, পাশের ফ্ল্যাটের কালো মেমের জানলা গলে হাওয়া!

মাস্টারমশাই কাঁপতে কাঁপতে আবার চেয়ারে বসে পড়লেন। মুখটা একেবারে সাদা, চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে, ভাঙা গলায় বললেন,— 'নেপোর গলা থেকে ঐ শব্দ বেরুল! আশ্চর্য! ওকে একটু ধরা যায় না?' আর ধরা! ততক্ষণে মেমের রান্নাঘর থেকে ঝন্-ঝন্ ক্যাঁও ম্যাও, তারপর সব চুপ।

চার

তার পরের রবিবারে গুপি এসেই বলল, 'একটা মুস্কিল হচ্ছে স্পেস্-স্টেশনটাকে নিয়ে। ছোটমামা বলছে নাকি মাধ্যাকর্ষণের এলাকা

ছাড়বামাত্র ওটাকে তিন সেকেণ্ডে একবার করে পাক খেতে হবে। নইলে ধপাস্ করে পড়ে যাবে। তা হলে তো জিনিসপত্র ভেঙেগচুরে মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি খেয়ে একাকার হবে। মহাকাশযানগুলোই বা সারানো হবে কি করে ?' আমি আঁৎকে উঠলাম।

'এ্যাঁ, তা হলে আমাদের বাতাসের বোতলের ব্যবসার কি হবে ? ডাক-উইড দিয়ে যে অক্সিজেন তৈরি হবে তাকে রাখব কিসে ?'

গুপি বিরক্ত হয়ে বলল, 'এই বিদ্যে নিয়ে হয়েছে তোর চন্দ্রযাত্রা ! বাতাসের বোতল পাৎলা প্ল্যাস্টিকের হবে, তাও জানিস না ? কাচ তো বেজায় ভারি। কিন্তু মিনিটে কুড়িবার ঘোরালে বাতাস থেকে মাখন-টাখন না উঠলে বাঁচা যায়। ছোটমামা এই নিয়ে এত বেশি ভাবছে যে এবারও পরীক্ষায় কি হয় কে জানে।'

ছোট মাস্টার সেদিন আগেই এসেছিলেন। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ধনে পাতা চিবুচ্ছিলেন আর তেওয়ারির দোকানের বুড়িকে অবাক হয়ে দেখছিলেন। এবার তিনি হঠাৎ পকেট থেকে সবুজ মলাটের একটা বই বের করে বললেন, 'ছোটমামাকে ভাবতে বারণ কর। বরং পড়াশুনো করুক। এই বইতে লেখা আছে কি করে কল-কব্জার সাহায্যে বাইরের খোলটা পাক খাবে, অথচ ভিতরকার জিনিসপত্র শূন্যে ঝুলে থাকবে, একটুকু নড়বে না। এই দেখ ছবি, এই লোকগুলো সাতঘণ্টা পাক খেয়েছে, মাখন-টাখন কিচ্ছু ওঠে নি।'

তারপর গুপি আমার দিকে ফিরে বলল, 'ও কি, তোর চোখ লাল কেন ?'

রামকানাই মাছের কচুরি এনেছিল। আমার গোল টেবিলে সেগুলোকে নামিয়ে রেখে, ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'লাল হবে না তো কি। দুদিন ধরে পাতি বেড়ালের শোকে কান্নাকাটি হয়েছে যে !'

তাই শুনে গুপি আর ছোট মাস্টার দুজনেই অবাক। সে কি ! নেপোর সাংঘাতিক কিছু হয়েছে নাকি ? রামকানাই বলল, 'হবে আবার কি ! পেয়ারের বেড়াল হাওয়া। আজ তিন দিন সে বাড়ি আসে নি।'

ছোট মাস্টার বললেন, 'গেল কোথায় ?'

শুনে রামকানাইয়ের কি হাসি ! 'গেছে কার বাড়ির পাতকুড়ুনি খেতে।'

ভারি রাগ হল। চেঁচিয়ে বললাম, 'মোটেই না। নেপো কারো পাতকুড়ুনি খায় না। বিদ্‌ঘুটে ওকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।'

ছোট মাস্টার বললেন, 'বিদ্‌ঘুটে আবার কে?'

আমি কিছু বলার আগেই রামকানাই সর্দারি করে বলল, 'ঐ যে নটে-কান কেঁদো হুলো, তাছাড়া আবার কে! শুধু কি ডাস্ট-বিন ঘেঁটে ওর অমন গতর হয়েছে নাকি? গোলগাল বেড়াল দেখলেই তাকে ভুলিয়ে অন্ধকার গলিতে নিয়ে গিয়ে কপ্‌। নেপো হতভাগাকে পই-পই করে মানা করেছি, ওর সঙ্গে মিশিস্‌ নে, তা কে কার কথা শোনে। এখন বোঝ ঠ্যালা! কোথায় ঠ্যাং ছড়িয়ে—' রামকানাই চুপ করল।

আমি বললাম, 'এই পাড়া থেকে গত ছয় মাসে একত্রিশটা বেড়াল নিখোঁজ। কালো মেমের হলদে ট্যাবি পর্যন্ত। বিদ্‌ঘুটে কিছু অত বেড়াল খায় নি। আর খায়ই যদি তো আমার নতুন খাতা নিয়ে গেছে কেন?'

ছোট মাস্টার বললেন, 'নিতাই সামন্তকে বললে হয় না? যে অত চোরাই গাড়ি খুঁজে দেবে, সে একটা সামান্য বেড়াল খুঁজে দিতে পারবে না?'

এ কথা আমার আগে মনে হয় নি।

গুপি বলল, 'আমার ছোটমামাকেও বললে হয়, তার খুব বুদ্ধি। সে বলেছে চাঁদে মাটি নিয়ে যেতে হবে। ওখানকার মাটিতে ফসল হবে না। তাছাড়া কেঁচোও নিয়ে যেতে হবে। তারা তলার মাটি উপরে তোলে। তাহলে বেশি ভারি ভারি ট্র্যাক্টর নিতে হবে না।'

বড় মাস্টার ঠিক সেই সময় এসে ঘরে ঢুকলেন। 'বড় দেরি হয়ে গেল, পানু। ঐ রাখেশ আর বকু ভূতের ভয়ে আজ কিছুতেই বাড়ি থেকে বেরুবে না! শেষ পর্যন্ত নিজে গিয়ে টেনে বের করে আনতে হল। নাকি মোড়ের ঐ কোম্পানির আমোলের গুদোম বাড়ির দেয়াল থেকে ভূত নামতে অনেকে দেখেছে। সাহেব মেম ভূত। সেজেগুজে, নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে চলে যায়, কারো দিকে তাকায় না।'

গুপি বলল, 'কিছু বলে না তো ওরা ভয় পায় কেন?'

বড় মাস্টার বললেন, 'সে কথা কে বলে!'

ছোট মাস্টার বললেন, 'পানুর অমন ভালো বেড়ালটাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

তাই নাকি? রামকানাইকে দিয়ে পাড়া খোঁজাও। ঐ চীনে হোটেলের পেছনে ঠাণ্ডাঘরের কাঠের সিঁড়িতে রোজ রাতে বেড়ালদের সভা বসে, আমি নিজের চোখে দেখেছি। তাদের মধ্যে নেপো আছে কি না একবার দেখে আসুক।'

রামকানাই ঝুরিভাজা এনেছিল। সে বললে, 'সে কি আর বাকি রেখেছি, মাস্টারবাবু। সিঁড়িতে থিক্‌থিক্ করছে বেড়াল; কোন সময় হোটেল থেকে চিংড়িমাছের খোলা বাইরে পড়ে সেই আশাতেই বসে আছে। কিন্তু তার মধ্যে নেপো নেই। তিনি কাঁটা কি খোলা খান না। পানুদাদা মাছ বেছে দিলে তবে তিনি মুখে তোলেন।'

বড় মাস্টার চেয়ারে বসে বললেন, 'খায় না আবার! তেমন অবস্থায় পড়লে, না খায় এমন জিনিস থাকে না। একবার আমরা বড় বোট নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট ছোট দ্বীপে গুয়ানো খুঁজছিলাম। সমুদ্রের পাখিদের ময়লা জমে থাকে, তাকেই গুয়ানো বলে, বাজারে চড়া দামে বিক্রি হয়।

একটা ছোট্ট দ্বীপে উঠছি, সমুদ্রের তীরে অনেকটা বালি, দ্বীপটা কিন্তু পাথরে তৈরি, ওপরটা চ্যাপ্টা, পাথরের খাঁজে খাঁজে যেখানে মাটি একটু পুরু, সেখানেই বেঁটে বেঁটে গাছপালা, ঝরণাও আছে নিশ্চয়। ভাবলাম এখানে নোঙর করে দুদিন বিশ্রাম করা যাবে। দেখে মনে হল মাছের আর পাখির ডিমের অভাব হবে না। নৌকোর ক্যাপ্টেন আর আমি আর আমার পোষা বেড়াল ম্যাও আগে নামলাম। আমরা দেখে এলে অন্যেরা নামবে।

তবে অনেকেরি খুব রাগ, ম্যাও নামছে অথচ তাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে। যাই হোক, আমরা বালি পেরিয়ে হাঁচড় পাঁচড় করে দ্বীপের পাথুরে গা বেয়ে উঠতে লাগলাম। দেখতে দেখতে নৌকো আমাদের চোখের আড়াল হয়ে গেল।

আগে আগে ক্যাপ্টেন, তারপর আমি, আমার কাঁধে ম্যাও বসে। ক্যাপ্টেন বলল, "দ্বীপটা যেন একটু অদ্ভুত ঠেকছে। পাখির ডাক নেই কেন?" সত্যি, এমন চুপচাপ দ্বীপ কখনো দেখি নি। সমুদ্রের শব্দ ছাড়া কিছু শোনা যায় না। গুয়ানো ছেড়ে দিলাম, একটা জন্তুজানোয়ার বা পাখি, কিছু দেখতে পেলাম না। তার উপর ম্যাও ঘাড়ের লোম ফুলিয়ে কেবলি রেগে গর-গর করতে লাগল।

যাকে গাছগাছড়া ভেবেছিলাম তাও দেখলাম কাঁটাঝোপ ছাড়া কিছু নয়। অনেক খুঁজে ছোট্ট একটা ঝরণা পেলাম। আরেকটু রোদ উঠলে কি সাংঘাতিক গরম হবে ভেবে তাড়াতাড়ি পাথর বেয়ে নামতে লাগলাম। ঐ ন্যাড়া পাথর তেতে উঠলেই হয়েছে আর কি। খানিকটা পথ বাকি থাকতে অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখি সমুদ্রের তীর চাঁছাপোঁছা, দূরে জলের উপর একটা কালো দাগ ক্রমে ছোট হতে হতে শেষটা মিলিয়ে গেল। নাবিকদের নামতে দেওয়া হয় নি বলে তারা রেগেমেগে আমাদের ফেলে চলে গেছে।

হতাশ হয়ে যেখানে ছিলাম, বসে পড়লাম। অমনি ম্যাও এক লাফে আমার ঘাড় থেকে নেমে, রেগে তিনগুণ বড় হয়ে গর-র গর-র করতে লাগল। দেখি পাশেই একটা গুহার মুখ।

রোদ থেকে আশ্রয়ের আশায় ঢুকে পড়লাম তার ভিতর। খানিকদূর গিয়ে দেখি ঘুটঘুটে অন্ধকারে এখানে ওখানে জোড়া জোড়া চোখ জ্বলছে। টর্চের আলো ফেলে দেখি পাথরের থাকে থাকে বেড়াল। কালো, হলদে, সাদা, ছাই, পাটকিলে। বোধ হয় ম্যাওকে দেখেই, তারা সব উঠে দাঁড়িয়ে, চার পা এক জায়গায় জড়ো করে, পিঠ কুলোর মতো বাঁকিয়ে, পাথরের উপর নখ ঘষতে লাগল। তার খড় খড় শব্দে আমাদের গায়ে কাঁটা দিল। ম্যাও একেবারে কাঠ।

কোনোমতে হোঁচট খেতে খেতে পড়িমরি করে গুহা থেকে বেরিয়ে বাঁচলাম। অবাক হয়ে দেখি আমাদের নৌকো আবার ফিরে আসছে। আমরা নিচে পৌঁছবার আগেই ম্যাও গিয়ে নৌকোয় উঠে পাটাতনের তলায় গুটিশুটি হয়ে বসে পড়ল। বেড়ালের খাদ্যের কথাই যদি বল, ঐ দ্বীপে তারা খেত কি? পাখি নেই, প্রাণী নেই, গাছপালা নেই। হয়তো পরস্পরকেই—'

ছোট মাস্টার বললেন, 'না, না, নিশ্চয় সমুদ্রের মাছ ধরে খেত। ঢেউয়ের সঙ্গে যে-সব ঝিনুক, শামুক, তারামাছ, সমুদ্রের ঘোড়া, জেলিফিস্ এসে বালির উপর পড়ে, তাও খেত।'

বড় মাস্টার বললেন, 'পরে শুনেছিলাম, এক জাহাজের ক্যাপ্টেনের দুটো বেড়াল ছিল। তাদের উৎপাতে টেঁকা দায় হয়ে উঠেছিল বলে নাবিকরা লুকিয়ে ওদের ওখানে ফেলে দিয়ে গেছিল। ওরা নাকি টিনের মাছ ছাড়া কিছু খেত না। এদিকে নাবিকরা শুকনো মাংস পেত।

ঐ সব বেড়াল নিশ্চয় তাদেরি বংশধর।'

ঠিক এই সময় ঠাণ্ডাঘরের দিক থেকে খুব জোরে কতগুলো ঠক-ঠক শব্দ, তার পরেই এমনি ঝন্-ঝন্ যে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।। বড় মাস্টার ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন। কি জানি ওঁর বাড়িতেই কিছু হল না তো। পঙ্গু বৌ একলা আছে।

ছোট মাস্টার বললেন, 'বরফ ফাটলে ঐ রকম শব্দ হয়। রাখেশ আর তার বন্ধুরা বলছিল যে ঘর এত বেশি ঠাণ্ডা করে ফেলেছে যে কয়েকটা পেঙ্গুইন পাখি দেখা দিয়েছে।'

গুপি বলল, 'ওরা তো ভূতও দেখে।'

সেদিন সবাই একটু তাড়াতাড়ি চলে গেল। রামকানাই ঘরে এসে বলল, 'তিনজনে এসে পঁচিশটা কচুরি সাঁটাল, অথচ বেড়ালের একটা গতি করতে পারল না। আমার কিন্তু বুড়ি মেমকেই সন্দেহ হয়।'

আমি বললাম, 'ওর বেড়াল-ও তো গেছে। তুমি সবাইকে সন্দেহ কর।'

'সবাইকে সন্দেহ না করেই বা করি কি। তুমি তো তেওয়ারির দুঃখে গলে যাও। আহা, বেচারা, রোদে বৃষ্টিতে চাটাইয়ের ছাউনির নিচে বসে চা জলখাবার তৈরি করে আর বিক্রি করে। রাতে শোবার একটা ভালো জায়গা পায় না, হেনা তেনা কত কি বল। জান, ঐ চারতলা ঠাণ্ডা ঘরটির মালিক কে? ঐ তেওয়ারি ছাড়া আর কেউ নয়। তোমার বাবাকে তেওয়ারি কিনে ফেলতে পারে, তা জান?'

ভীষণ রেগে গিয়ে গড়গড় করে গাড়িটা চালিয়ে জানলার কাছে গেলাম। দেখলাম বুড়ি ভিকিরি তেওয়ারির সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া করছে। রামকানাই-ও জানলার ধারে এসে বলল, 'ঐ আরেক জন। আমার হাতে দিয়ে ওর জন্যে কত পয়সাই না পাঠিয়েছ তুমি। তোমার মার কাছ থেকে চেয়ে খদ্দরের চাদর পর্যন্ত ওকে দিয়ে আসতে হয়েছে। আর তেওয়ারি তো প্রত্যেক দিন সন্ধ্যেবেলায় দোকান বন্ধ করার আগে, শালপাতার ঠোঙা ভরে ওকে ঝড়তিপড়তি খাবার দেয়। তাই নিয়েই আবার ঝগড়া করে বুড়ি। আর ঐ যে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে অনেক রাতে একটা বুড়ো ভিক্ষে করে, চোখে দেখে না। মুখে কথা নেই, শুধু হাতটা পেতে দেয়। ওকে দেখে সকলের দয়া হয়, সবাই পয়সা দেয়। দুজনার তফাৎটা দেখেছ তো?'

আমি বললাম, 'তা দেখেছি। তাই বলে ঝগড়াটি বুড়িকে চাদর দেব না কেন? ওর-ও তো ঠাণ্ডা লাগে।'

রামকানাই বলল—'তা লাগে বৈকি। তাছাড়া ঝগড়াটে বুড়ি আর ভালো মানুষ বুড়ো এক-ই লোক।

পাঁচ

শুনে আমি হাঁ। তাকিয়ে দেখি বুড়ি তেওয়ারির নিজের ভাগ থেকে আরো দুটো পুরী নিয়ে, ঝগড়া শেষ করে, খাবারগুলোকে কোঁচড়ে বেঁধে, তরতর করে ঠাণ্ডাঘরের বাঁশের ভারা বেয়ে উপরে উঠে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল! ভারায় চড়ার আগে একবার চারদিকে চেয়ে দেখল। মুখের উপর রাস্তার আলো এসে পড়ল। অবাক হয়ে দেখলাম রামকানাই ঠিক-ই বলেছে। মোড়ের মাথার বুড়োর আর ঝগড়াটি বুড়ির মুখ অবিকল এক।

বললাম, 'রামকানাইদা, ওরা তো যমজ-ও হতে পারে।'

রামকানাই কাষ্ঠ হেসে বলল, 'তা হলে দুজনকে এক সঙ্গে দেখা যায় না কেন? না পানুদা, পৃথিবীতে কাকেও বিশ্বাস হয় না। বিশেষ করে তোমাদের নতুন বন্ধু ঐ ছোট মাস্টারটিকে তো নয়-ই। এদিকে তলাপত্র বলতে বুড়ো মাস্টার অজ্ঞান! ওঁর কপালে দুঃখ আছে বলে রাখলাম।'

এই বলে রামকানাই দরজা খুলে দিতে গেল। বাবা-মা নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরে এসেছেন। সঙ্গে আবার কাকু আর নিতাই সামন্ত-ও এসেছিলেন। নিতাই সামন্তকে আজকাল এই পাড়ায় রাতে ডিউটি দিতে হয়, তাই এক পেয়ালা গরম চা না হলে চলে না। এক পেয়ালা মানেই দুই পেয়ালা আর গোটা দুই পান।

আমি গাড়ি চালিয়ে বসবার ঘরে গিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনতে লাগলাম। খালি বিনু তালুকদারের অদ্ভুত বুদ্ধির গল্প। বিনু তালুকদারের চেহারা নাকি দিল্লীর দু-একজন বড় কর্তা ছাড়া, কেউ দেখে নি। তার টিকটিকিদেরও কেউ চেনে না। এখানকার পুলিস বিভাগের

বাঁশের ভারা বেয়ে উপরে উঠে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কেউ তো নয়ই। নিতাই সামন্ত এক টিপ চুন দাঁতে লাগিয়ে বললেন, 'কে জানে মশাই, ঐ যে-লোকটাকে সন্দেহ করে আজ এই রাতের অন্ধকারে ভূতের গলিতে যাচ্ছি, সে-ই হয়তো বিনু তালুকদারের গুপ্ত গোয়েন্দা, ছদ্মবেশে বেড়াচ্ছে। আমার অবিশ্যি ভূতের ভয় নেই। কারণ প্রথমতঃ ভূত আছে বলেই বিশ্বাস করি না। দ্বিতীয়তঃ আমার হাতে গুরুদেবের দেওয়া অব্যর্থ মাদুলী বাঁধা আছে। ভূতে আমার কিছু করতে পারবে না।'

নিতাই সামন্ত চলে গেলে পর বাবা বললেন, 'ঐ গুপিটার পাল্লায় পড়ে তু-ইও যেন পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে শুধু চাঁদে যাবার জোগাড়-যন্ত্র করিস্ না। চাঁদে গেলেই হল আর কি!'

আমি বললাম, 'না, বাবা, শুধু চাঁদে যাওয়া নয়, চাঁদ থেকে আরো দূরে যাওয়া হবে। ওটা হল প্রথম স্টেশন, ওখানেই নাকি টিকিট কাটতে হবে, গুপির ছোটমামা বলেছেন।'

শুনে বাবা তো হেসেই কুটোপাটি। 'আর ছোটমামা! আরে তোদের গুপির ছোটমামা তো ফেরারি আসামী! এক বাক্স স্ক্রু-ট্রু নিয়ে হাওয়া। লিখে রেখে গেছে যে সামান্য বি-এস্-সি্ পাস করে তার কিছু হবে না, সে চাঁদে যাওয়ার চেষ্টায় আছে।'

আমার কান্না পেল। 'তা হলে গুপিকে আমাকে না নিয়েই ছোটমামা চাঁদে চলে গেলেন নাকি? জমিটমি কিনে রেখেছেন বোধ হয়, কিন্তু—'

বাবা এত বেশি হাসতে লাগলেন যে থামতে হল। বাবা বললেন, 'না, না, অত ভাবনার কারণ নেই। চৌয়াঢেকুর ওঠাতে সে আবার ফিরে এসেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই ঝন্-ঝন্ শব্দ। আমি বললাম, 'বরফ ফাটছে। ওখানে পেঙ্গুইন গজিয়েছে।'

বাবা এমনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে হাসি থেমে গেল। আমি যদি হাঁটতে পারতাম, একদিনও এ বাড়িতে থাকতাম না।

আরো সাত দিন কেটে গেল, নেপোর কোনো পাত্তা নেই। মেজকাকু বললেন, 'একটা পার্সিয়ান ক্যাট্ এনে দিই. কি বলিস? বাড়ি ছেড়ে এক পা নড়বে না, এই বড় সাইজের, ছাই রঙের গা, নীল চোখ। বেড়ালকে বেড়াল, কুকুরকে কুকুর। পাতি বেড়াল কেউ পোষে নাকি?'

খুব দুঃখ হল। বললাম, 'কেন পুষবে না? আমাদের এই বাড়িতে আটটা ফ্ল্যাট, প্রত্যেকের একটা করে বেড়াল ছিল। এখন অবিশ্যি সবার নেই। তিন নম্বর, চার নম্বর আর সাত নম্বরের বেড়ালও অদৃশ্য হয়ে গেছিল, তবে তারা ফিরে এসেছে। বিদ্‌ঘুটে তাদের খায় নি, রামকানাই যাই বলুক না কেন।'

ছোট মাস্টার বললেন, 'এ তো ভারি ইণ্টারেস্টিং ব্যাপার। আপনার বন্ধু নিতাই সামন্ত এই নিয়ে একটু তদন্ত করলে পারেন।'

মেজকাকু চটে গেলেন, 'রেখে দিন ওসব বাজে কথা। সে এখন নিজের কাজ ফেলে বেড়ালের পিছন ঘুরুক আর কি!'

বড় মাস্টারমশাই না থাকলে ছোট মাস্টারের বেজায় সাহস বেড়ে যায়। তিনি বললেন, 'আহা, এমন-ও তো হতে পারে যে গাড়ি চুরি আর বেড়াল চুরি দুটো আলাদা ব্যাপার নয়?'

মেজকাকু অবাক হয়ে ছোট মাস্টারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ঠিক সেই সময় বড় মাস্টার এসে ঢুকলেন। মেজকাকু তাঁকে তলাপত্রের মন্তব্যটা বলে খুব হাসতে লাগলেন।

বড় মাস্টারমশাই বেশ গম্ভীর মুখেই বললেন, 'তাহলে বুঝতে হবে কি যে এখনো নেপোকে পাওয়া যায় নি, আর তলাপত্রের মতে চোরাই গাড়ি আর হারানো বিল্লি একসঙ্গে পাওয়া যাবে? তা কিন্তু কিছুই বলা যায় না। হয়তো চোরাই গাড়ির গোপন কারখানায় ইঁদুরের উপদ্রবে টেকা যাচ্ছিল না বলে ওরা বেড়াল আমদানি করছে। কি বল তলাপত্র?'

তলাপত্র লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে চুপ করে রইল। বড় মাস্টার বললেন, 'তা হলে শোন। বর্মায় একবার দেখা গেল যখনি—'

এইটুকু বলেছেন, এমনি সময় হন্তদন্ত হয়ে গুপি এসে উপস্থিত। তার চোখমুখ দেখে বুঝতে পারলাম একটা কিছু হয়েছে। সে ভীষণ উত্তেজিত-ভাবে বলল, 'ছোট মাস্টারমশাই, আপনি ঠিকই বলেছিলেন। এক্ষুণি দেখলাম দু তিন জন লোক জালে জড়িয়ে ছোট ছোট জ্যান্ত মাছ নিয়ে ঠাণ্ডাঘরের গলিতে ঢুকল। ওখানে যে পেঙ্গুইন গজিয়েছে সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই।'

বড় মাস্টার অবাক হয়ে বললেন, 'কি বলেছে তলাপত্র? ঠাণ্ডাঘরে পেঙ্গুইন গজিয়েছে? মাছ গজায় নি?'

তলাপত্র আস্তে আস্তে বললেন, 'না স্যার, জল ছাড়া মাছ বাঁচবে কি করে?'

বড় মাস্টার আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বাবা মা ফিরে এলেন। 'আরে গুপি, তুই এখানে? এদিকে যে তোর ছোটমামাটি এবার সত্যি ফেরারি হয়ে গেছে সে খবর রাখিস?'

বাবা খুব হাসতে লাগলেন। কিন্তু আমাদের হাত পা জমে বরফ। ছোটমামা ফেরারি হলে আমাদের চাঁদে যাওয়ার কি হবে? বাবা একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, 'সে এক কাণ্ড, মশাই। বইয়ের সঙ্গে চাঁদু ছোকরার সম্বন্ধ নেই, খালি অলি-গলিতে ঘুরবে আর যত রাজ্যের রাবিশ কিনে আনবে। যত সব মলাট ছেঁড়া বাজে বই আর জং ধরা লোহার টুকরো। নিজের ঘরটাকে ছাদ অবধি বোঝাই করে ফেলছে। তারপর কাল একেবারে বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি! বাছাধন বাজারের থলি বোঝাই পেরেক, শেকল ইত্যাদি নিয়ে বাড়িতে ঢুকছেন। তাও সোজা পথে না, জলের পাইপ বেয়ে। আর পেছন থেকে বেল্ট খামচে ধরেছেন প্রাণেশবাবু।'

বড় মাস্টার বললেন, 'তিনি কে?'

'কে আবার, ছোটমামার বাবা, অর্থাৎ গুপির দাদু। বুড়ো তো চটে কাঁই। হতভাগা কিছুতেই পড়বে না। পাছে পালায় তাই ঘরের শেকল তুলে দিয়েছিলেন, জানলা দিয়ে বেরিয়ে পাইপ বেয়ে পালাল!!—ছেলের হাত থেকে থলি পড়ে পেরেক ছড়িয়ে একাকার। তাই দেখে বুড়োর হাত-ও হয়তো একটু ঢিলে হয়েছিল, অমনি হ্যাঁচকা টানে বেল্ট ছিঁড়ে ছোকরা পগার পার! সারা রাত সারা দিন গেছে ছেলের দেখা নেই। ওবাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। তুই বলতে চাস্, তুই কিছু জানিস্ না, গুপি?'

গুপি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বলল, 'আমি কি করে জানব? আমরা থাকি হেদোর কাছে—আর দাদুরা বাদুড়বাগানে। যাই, অনেকগুলো হোমটাস্ক করতে হবে।' এই বলে দৌড়।

গুপি চলে গেলে বাবা বললেন, 'ঐ দুষ্টু মামা আর তার এমন ভালো ভাগ্নে! গুপির মতো হতে চেষ্টা করিস্ পানু।' তারপর মেজকাকুকে বললেন, 'আসল কথাই বলতে ভুলে গেলাম! চাঁদুর ঘর সার্চ করা হয়েছে, যদি কোথায় গেল তার কোনো ক্লু পাওয়া যায়। লোহার স্তূপের নিচে থেকে দুটো ভাঙা মোটর গাড়ির নম্বর প্লেট পাওয়া গেছে। দুটোই চোরাই মোটরের নম্বর প্লেট।'

মেজকাকু বললেন, 'সে কি ! কি করে জানলে ?'

'আরে, চাঁদুর মা এমন কান্নাকাটি লাগিয়ে দিয়েছেন যে শেষ পর্যন্ত বুড়ো থানায় গিয়ে ছেলে হারানো ডাইরি করে এলেন। সেখানে সবাই হেসেই কুটোপাটি, হারিয়েছে আবার কি, পেলিয়েছে বলুন ! ঐখানেই তোর বন্ধু নিতাই সামন্তর সঙ্গে দেখা। সে-ই ঘর সার্চ করে নম্বর প্লেট বের করেছে আর ফর্দ মিলিয়ে দেখেছে দুটোই হারানো গাড়ির নম্বর প্লেট। কাজেই চাঁদুর পেছনে এবার হুলিয়া লেগেছে। শুধু যে ঘর পালানো ছেলে তাতো নয়, একেবারে ফেরারি আসামী। ধরা পড়লেই হাতে হাতকড়া।'

শুনে সবাই থ। বাবা একটু হেসে, উঠে গেলেন। তখন আমি বললাম, 'তা হতে পারে না, আমরা চাঁদে যাব বলে ছোটমামা স্পেস্‌-শিপ বানাবেন, তাই পেরেক টেরেক জমা করছেন। ওসব জিনিস উনি নিজের টিপিনের পয়সা দিয়ে সের দরে কেনেন। কোথা থেকে ওগুলো কিনেছেন বের করতে পারলেই গাড়িচোরও বেরিয়ে পড়বে।'

মেজকাকু বললেন, 'তা হলে কোথা থেকে কিনেছে সেটা জানা দরকার। অর্থাৎ ওকে ধরা দরকার। যাই, দেখি নিতাই কি বলে।'

মেজকাকু চলে গেলে বড় মাস্টারমশাই বললেন, 'ও কি পানু, অত মন-মরা কেন ? ঐ ছেলেকে ধরবে নিতাই সামন্তরা ? তাহলেই হয়েছে ! ওদের ও এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচে আসতে পারে। তোমাদের চাঁদে যাওয়ার কোনো অসুবিধাই হবে না। অবিশ্যি চাঁদে যাওয়াটা আমি কোনোদিনই সমর্থন করব না। তাছাড়া পায়ের এক্সারসাইজগুলো করছ তো ? নইলে চাঁদে যাবেই বা কি করে ?' কি বললে তলাপত্র, মুখ তুলে কথা বল না কেন ? তোমাকে তো আর আমি খেয়ে ফেলব না।'

ছোট্ট মাস্টারমশাই ভয়ে ভয়ে বললেন, 'ঐ যে বর্মার গল্পটা—'

'কোনটা ? ঐ ফুঙিদের মাছের গল্পটা ?'

'না, না, ঐ যে যখনি কি হয় তখনি আরেকটা কি হয়—'

বড় মাস্টার খুব হাসলেন, 'ও, সেইটে। বুঝলে পানু, বি-এ পাস করিয়ে, বাবা আমাকে কিছুদিন রেঙ্গুনে রেখেছিলেন। ওখানে আমাদের একটা আপিস ছিল। আপিসটা দেখতে ছোট, একটা এত সরু গলির মধ্যে যে তার ভিতর মোটর গাড়ি ঢুকত না। কিন্তু সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার আমদানি রপ্তানি কারবার হত। লোক গিজ গিজ করত গলিটিতে। একদিনে এত কোটি কোটি টাকার লেনদেন বর্মায় আর কোথাও হত না।

আমাদের থাকার জায়গা ছিল ওপর তলায়। পাশাপাশি দুটি বেশ বড় ঘর, রান্নাঘর, স্নানের ঘর। তা তোমাদের বৌঠান কিছুতেই একা বেরুবে না, সবটাতেই তার বেজায় সন্দেহ। বুঝলাম লোক রাখতেই হবে, এবং যত পুরনো লোক হয় ততই ভালো। দুঃখের বিষয়, লোকরা যেই একটু পুরনো হয়, রাঁধাবাড়ায় হাত পাকায়, অমনি বলা নেই কওয়া নেই কোথায় উধাও হয়। তারপর কিছুদিন ভারি অসুবিধা, লোক পাওয়া যায় না! তোমাদের বৌঠান রাঁধে খাসা, কিন্তু হাটবাজার আমাকে করতে হত। এদিকে কাজের এতটুকু ক্ষতি হলেই, বাবা হয়তো রেগেমেগে ত্যাজ্যপুত্র করে দেবেন।

এবাড়ি ওবাড়ি জিজ্ঞাসা করে টের পেলাম, শুধু আমাদের বাড়িতে নয়, সব বাড়ির ঐ এক অবস্থা। মাস তিনেক ঐ ভাবে চলে, তারপর আস্তে আস্তে আবার লোক পাওয়া যায়। ভাবলাম এদেশের ঐ রকমই ব্যাপার, এরা ছয় মাস কাজ করে তো তিন মাস দেশে বসে খায়।

দু বছর এইভাবে চলল, তারপর সালওয়েন নদীতে মানপু বলে একটা ছোট জায়গায় যেতে হল। একাই গেলাম, পরিবার নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়, বেজায় ডাকাতের উপদ্রব। পৃথিবীতে যেখানেই যাওয়া যাক না কেন, একটা না একটা ঝামেলা থাকে। ঐখানে আমাদের কাঠগুদোম ছিল, বন্দুকধারী পাহারাওয়ালা রাখতে হত, নিজেদেরো যথাসম্ভব সতর্ক থাকতে হত। ডাকাতির ঢেউ আসত। মাস তিনেক খুব ডাকাতি, তারপর ছয়মাস সব চুপচাপ। তারপর আবার ডাকাতি। আমরাও তাই বুঝে কাজ গছিয়ে নিতাম, ঐ ছয়মাসের মধ্যে টাকাকড়ির লেনদেন সেরে ফেলতে চেষ্টা করতাম। রেঙ্গুনের চাকর পালানোর আর মানপুর ডাকাতির কোনো সম্বন্ধ আছে কেউ সন্দেহও করতাম না। বছর পাঁচেক বাদে রেঙ্গুনে একজনদের চাকর হঠাৎ মারা গেলে, তার জিনিসপত্রের মধ্যে এমন সব চোরাইমাল বেরুল যাতে আর কোনো সন্দেহই রইল না যে যারা ছয়মাস ভালোমানুষ সেজে রেঙ্গুনে লোকের বাড়িতে কাজ করত, তারাই মানপতে তিনমাস দুর্ধর্ষ ডাকাতি করত। কাজেই কিসের সঙ্গে কিসের সম্বন্ধ আছে কিছুই বলা যায় না। চল হে তলাপত্র, তোমাকে ভূতের গলিটা পার করে দিয়ে আসি।

ওঁরা চলে যাবার আধঘণ্টা পরে রামকানাই আমার জন্যে হর্লিক্স নিয়ে এল। মুচকি হাসতে হাসতে বলল, 'যত সব বিদ্যে দিগগজ হয়েছেন।'

আমি বললাম, 'কি যে বল, রামকানাই, বড় মাস্টার কত দেশ ঘুরেছেন, কত রকম দেখেছেন।'

রামকানাই বলল, 'মুখে যত বৌয়ের উপর দয়া, আর ওদিকে একবার তাকিয়ে দেখ না। দুমুখো সাপ। আজ আমি কিন্তু রাতে তোমার ঘরে শোব না, যাত্রা দেখতে যাব। ভয় করে তো বুড়ো মাস্টারকে ডাকতে পার।' বড় মাস্টারমশাইকে ভক্তি করি বলে রামকানাইয়ের যত রাগ।

তবু ওঁদের জানলার দিকে তাকিয়ে একটু আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। এত দূর থেকে কথা শোনা যায় না, শুধু ছায়ার মতো দেখা যায়। মনে হল বকবার আঙ্গুল তুলে মাস্টারমশাই বৌকে শাসাচ্ছেন। বড় কষ্ট হল।

সে রাতে আর কিছুতেই ঘুম আসছিল না। বার বার উঠে বসে জানলা দিয়ে দেখছিলাম, বড় মাস্টারমশাইয়ের ঘরে তখনো আলো জ্বলছে আর বড় মাস্টারমশাই ঘরময় অস্থির ভাবে পাইচারি করছেন। একবার তন্দ্রামতো এসেছিল, চমকে জেগে উঠলাম। কে ঠোঁটি চেপে শিস্ দিচ্ছে 'শ্ শ্ ট্-শ্ শ্ ট্'। এ তো গুপির আর আমার গোপন সংকেত। এত রাতে গুপি কি করে এল ? হাতে ভর দিয়ে এক লাফে গাড়িটাতে চড়ে জানলার কাছে গিয়ে দেখি যা ভেবেছি ঠিক তাই। গুপি ছাপাখানার ঘোরানো সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, কাঁধে একটা তক্তা। আমি ইশারা করে ডাকতেই তক্তাটা যথাস্থানে ফেলে স্বচ্ছন্দে ফাঁকটুকু পার হয়ে আমাদের ঘোরানো সিঁড়িতে এসে উঠল। বাবা ! ঐ তিনতলার উপরে সরু তক্তার উপর দিয়ে ওকে হাঁটিতে দেখে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। আমাদের সিঁড়িতে উঠে আবার ঝুঁকে তক্তাটাতে টান দিল। দেখি এ মাথাটা আমাদের রেলিংএর সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে। ঐখানেই তক্তাটা ঝুলতে লাগল।

আমার শোবার ঘরের পাশেই খাবার ঘর, তার বাইরে সরু বারান্দা। কার্নিশ বেয়ে দুই হাত হেঁটে সেই বারান্দায় উঠতে গুপির পাঁচ মিনিটও লাগল না। আমি খাবার ঘরের দরজার নিচু ছিটকিনিটা খুলে দিলাম। গুপি ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রেখে আস্তে আস্তে আমার ঘরে এল। খাবার ঘরের পর বসবার ঘর, তার ওপাশে মা-দের ঘর।

তবু আমার দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম। গুপি বলল, 'বাড়িতে বলে এসেছি তোর এখানে খাব শোব।'

'খাবার কোথায় পাব ? ডুলিতে পাঁউরুটি থাকতে পারে।'

'আরে দূর, ছোটমামার কাছে খেয়ে এলাম এক্ষুণি। পরটা কাবাব ক্ষীরের সন্দেশ।'

এমনি চমকে গেলাম যে জিব কামড়ে ফেললাম। গুপি বলল, 'এসব কথা কাউকে বলবি না। ছাপাখানার ঐ যে ঘোরানো সিঁড়ির মাথায় দরজা দেখছিস, ওটা ছোটমামার ঘর। ছোটমামা ছাপাখানার বদলি নাইট ওয়াচম্যানের চাকরি পেয়েছে।' এই বলে গুপি মুখ চেপে বেজায় হাসতে লাগল। 'সবাই জানে ও আগের পাহারাওয়ালার ছোট ভাই।'

একটু পরেই আমার আরাম কেদারায় কুশন মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ে গুপি বলল, 'দাড়ি পরে কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে সে আর কি বলব। নকল দাড়ির নিচে সত্যি দাড়ি গজাচ্ছে। এই দুদিনেই চমৎকার খোঁচা খোঁচা বেরিয়েছে। কিন্তু ভুলে যাস্ না যে ওর প্রাণ তোর হাতে।' এই বলেই পাশ ফিরে গুপি দিব্যি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

আমারো গায়ের রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল! আমাকেও গুপির আর ছোটমামার উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে। আস্তে আস্তে গা দুটোকে গুটোতে চেষ্টা করতে লাগলাম। আশ্চর্য হয়ে টের পেলাম, অন্য দিন কিছু হয় না, আজ কিন্তু পায়ের গুলিটাকে বেশ শক্ত করতে পারছি।

শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, কাল সকালে গুপিকে দেখে মা কি বলবেন। নিশ্চয় জানতে চাইবেন কোথা দিয়ে এসেছে! ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে উঠে দেখি সাতটা বেজেছে, রামকানাই আমার হর্লিক্স এনেছে, গুপির কোন চিহ্ন নেই। পরে জানলার কাছে গিয়ে দেখি তক্তাটাও নেই! তবে স্বপ্ন যে নয়, তার প্রমাণ গুপি তার ছেঁড়া চটি ফেলে, আমার আস্ত চটি পরে চলে গেছে। যাক্ গে, আমার চটিই বা কি আর জুতোই বা কি! আমি তো দু পায়ে ল্যাংড়া। এ কথা ভেবে বেজায় কান্না পাচ্ছিল। ভাগ্যিস রামকানাই ঠিক সেই সময় গরম গরম তিন-কোণা পরটা আর কাল রাতের বাকি দুটো মাংসের চপ এনে হাজির করল, তাই মনটা আবার ভালো হয়ে গেল।

ছয়

আজকাল ছোট মাস্টার-ও রোজ আসেন। ডাক্তারবাবু বাবাকে

বলেছেন যে আমাকে নানা রকম ভালো হাতের কাজ শেখালে মনটন ভালো থাকবে, তা হলে ঠ্যাং দুটোও তাড়াতাড়ি সারবে। নাকি রোগটা ঠ্যাংএর নয়, মনের। মনের জোর হলেই পায়ের জোর হবে। কিছু বললাম না, কারণ হাতের কাজ শিখতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

আপত্তি তো নেই-ই, বরং আগ্রহ আছে বলা যায়। বড় মাস্টার বাবাকে বললেন, 'তলাপত্র যন্ত্রপাতি গাড়ি ইত্যাদির ছোট ছোট মডেল তৈরি করতে ওস্তাদ। আমাদের নাইটস্কুলের বড় ছেলেদের দিয়ে রেলগাড়ি আর ইঞ্জিনের যে খাসা মডেল করিয়েছে, দেখলে অবাক হয়ে যাবেন।'

বাবাকে দেখাবার জন্যে মডেলটা আনলেনও বড় মাস্টার। দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অবিকল একটা রেলগাড়ি। দরজা, জানলা, স্প্রিং, চাকা, আলো, পাখা, জলের ট্যাঙ্ক্, লাইন, ব্রেক, অ্যালার্ম সিগ্‌নেল, ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের যাবতীয় কিছু, একেবারে হুবহু সত্যিকার গাড়িতে যেমন থাকে। রং টং দিয়ে তৈরি। আমার ঘরের মেঝেতে লাইন বসিয়ে, প্লাগ্ লাগিয়ে সেই গাড়ি চালানো হল। তার বাঁশিটি পর্যন্ত অবিকল। কি বলব, গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

সেদিন রাতে মা-বাবার মুখে ছোট মাস্টারের প্রশংসা আর ধরে না। এত দিন চোর-চোর চেহারা, সোজা তাকায় না কেন, ইত্যাদি কি না বলেছেন সবাই। আজ একেবারে উল্টো কথা। তখনি ঠিক হয়ে গেল ছোট মাস্টার রোজ বিকেলে নাইটস্কুলে যাবার আগে, আমাকে ঘণ্টা দুই হাতের কাজ শেখাবেন। ভালোই হল; ঐ সময়টাই আমার ভালো কাটত না। আগে ঐ সময়টা খেলার মাঠে কাটত। রোজ চারটে থেকে ছটা যদি মডেল তৈরি করা যায়, বিশেষতঃ ছোট মাস্টারের সঙ্গে, তাহলে মন্দ কি। তাছাড়া আমার আরেকটা মৎলবও আছে।

প্রথম দিন ছোট মাস্টার এসে কিছ বলবার আগেই আমি বললাম, 'স্পেস্-শিপের মডেল করা যায় না?'

ছোট মাস্টার একটু হকচকিয়ে গেলেন। 'একেবারে স্পেস্-শিপ দিয়েই শুরু করবে নাকি? আগে ছোটখাটো দুটো একটা জিনিস করলে হয় না?'

আমি বললাম, 'বেশ তো, আগে ছোটখাটো জিনিস দিয়েই না হয় শুরু করা যাবে। ঐ যে সেদিন পাক-খাওয়ার মেশিনের কথা বলছিলেন, তাই দিয়েই আরম্ভ করা যাক। ঐ বইটাতে তার ছবিও আছে।'

অন্য কেউ হলে হয়তো বকাবকি করত। কিন্তু ছোট মাস্টার বললেন, 'আচ্ছা, তাই হবে। তা হলে বইটা থেকে ঐ যন্ত্রটার পার্টগুলোর ছবি আগে এঁকে নিতে হবে। কাগজ পেনসিল রবার সব-ই তো আছে। মাপ নেবার জন্য কম্পাস্ ইত্যাদিও লাগবে। ঐ মাপেই এঁকো।'

তারপর একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সত্যি সত্যি যাবার ইচ্ছা আছে দেখছি। কাগজে দেখলাম আমেরিকানরা সম্ভবতঃ এ বছর-ই চাঁদে মানুষ নামাবে।'

আমি আরেকটু হলে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই উঠছিলাম। পিছনটাকে চেয়ার থেকে খানিকটা বোধ হয় তুলেই ফেলেছিলাম। কিন্তু সে কথা মনে হতেই ধপ করে আবার চেয়ারের উপর পড়ে গেলাম। ছোট মাস্টার সব দেখলেন। বললেন, 'লাগে নি তো? চাঁদে যাবে বলে যে সবার আগে যেতে হবে তার কোনো মানে নেই। তা ছাড়া নিজেদের স্পেস্-শিপে করে যেতে হলে একটু দেরি তো হবেই। বৈজ্ঞানিকরা আগে গিয়ে দেখেই আসুক না সেখানকার অবস্থাটা কি রকম। কি বল? সেই বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। মাটির নিচে উপনিবেশ করতে সময় নেবে।'

আমি বললাম, 'বাবা বলছিলেন, এর মধ্যে রাশিয়ানদের একটা "জণ্ড-পাঁচ" চাঁদের চারদিকে ঘুরে ফিরে এসেছে। আর আগে চাঁদে রকেট নেমেছে বটে, কিন্তু একবার নেমে, আবার উঠে ফিরে আসে নি। বোধ হয় মানুষ না গেলে, সেটা খুব শক্ত হবে। ইস্ পা-দুটোর উপর এমনি রাগ হয়!' এই বলে পা-দুটোকে শক্ত করবার চেষ্টা করলাম। কেমন যেন ঝিঁঝিঁ ধরার মতো মনে হল।

ঠিক সেই সময় একটা ছোট বাণ্ডিল হাতে নিয়ে গুপি এসে উপস্থিত। স্কুলের জন্মদিন বলে সেদিন নাকি একটায় ছুটি হয়ে গেছে। পুঁটলিতে কি?

গুপি একটু লজ্জা পেল। খিদিরপুর ডকের কাছে নাকি সস্তায় খুব দরকারী সব পরনো জিনিস বিক্রি হচ্ছিল। তারি কিছু কিনে এনেছে। খুলে দেখলাম নাইলনের হাওয়া বালিশ, হাওয়া না থাকলে রুমালের মতো ছোট করে ভাঁজ করে ফেলা যায়। নাইলনের জলের বোতল আর খাবার রাখার থলি। হাঁ করে ছোট মাস্টার গুপির দিকে চেয়ে রইলেন। গুপি বলল, 'হ্যাঁ স্যার, আগে থাকতেই বন্দোবস্ত করা ভালো। বেশি দিন তো আর নেই। নিজেদের খাবার-দাবার নিজেরা নিলেই ভালো। শুনলাম পাঁচ দিনের ওয়াস্তা; পাঁচদিন! মানে, খালি রকেট সাত দিনে ফিরতে

পারে বটে, কিন্তু লোকজন জিনিসপত্র থাকলে নিশ্চয় কিছু বেশি সময় লাগবে। হয়তো যেতে আসতে পাঁচ-পাঁচ মোট দশ দিন।'

আমি বললাম, 'চোঙা মতো ওটা কি?'

গুপি হেসে বলল, 'ঐটাই তো আসল জিনিস। চাঁদ দেখার টেলিস্কোপ। কোনো জাহাজের খ্যাপা ক্যাপ্টেন নাকি ওটাকে বন্ধক দিয়ে টাকা নিয়েছিল আর ছাড়াতে আসে নি।'

'টেলিস্কোপ? টেলিস্কোপ দিয়ে কি হবে?'

ছোট মাস্টার লাফিয়ে উঠলেন, 'আকাশ দেখার টেলিস্কোপ নাকি? সে তো অন্য রকম দেখতে হয়।' তারপর টেলিস্কোপটা বের করে বললেন, 'না, আকাশ দেখার নয়। কিন্তু খুব পাওয়ারফুল। সমুদ্রে দূরে দেখার জন্যে ব্যবহার হয়। আকাশে এরোপ্লেন ইত্যাদিও দেখা যায়। দেখবে নাকি, পানু?'

ছোট মাস্টার টেলিস্কোপের লেন্স পরিষ্কার করে দিয়ে, ফোকাস ঠিক করে, আমার হাতে দিলেন। আমি জানলা দিয়ে চারিদিক দেখতে লাগলাম। সব অন্যরকম লাগল। ঠাণ্ডা ঘরটাকে ভালো করে দেখলাম। মনে হল ছাদে কি সব পাইচারি করছে, ছোটোমতো, সাদা কালো। আলো কম বলে ভালো করে বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ একটা সন্দেহ হল, 'গুপি, নিশ্চয় পে—উঃ!'

গুপি আমার হাঁটুর উপরে জোরে চিমটি কাটল। আমি টেলিস্কোপ নামাতেই, ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে কিছু বলতে মানা করল। মুখে বলল, 'চাঁদ উঠেচে, দ্যাখ্ ভালো করে।'

চাঁদের দিকে টেলিস্কোপ ফেরালাম। অদ্ভুত লাগল। অবিশ্যি পাহাড়-পর্বত এটা দিয়ে দেখা গেল না। কিন্তু আরেকটা জিনিস দেখে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। স্পষ্ট দেখলাম, জিনিসপত্রে বোঝাই ডানাওয়ালা একটা নৌকোর মতো কি যেন, চাঁদের মুখের উপর দিয়ে আস্তে আস্তে ভেসে গেল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে তার কুচকুচে কালো আকৃতি পূর্ণিমার চাঁদের সোনালি গায়ের উপর পরিষ্কার ফুটে উঠল। তারপরেই চাঁদ পেরিয়ে এক টুকরো কালচে মেঘের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমার মুখ দেখে ওরা দুজন চ্যাঁচাতে লাগল। 'কি হল? কি হল? শরীর খারাপ হল নাকি?'

আমি বললাম, 'না। চাঁদে যাবার প্রথম নৌকোটাকে বোধ হয়

দেখলাম। লটবহর নিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, গুপি, ছোটমামা কি—'

গুপি বলল, 'চোপ।'

ছোট মাস্টার তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন, 'আচ্ছা, আমি তা হলে আসি। আমি থাকলে তোমাদের কথাবার্তার অসুবিধা হয়। তাছাড়া, নাইট ক্লাসের আর বেশি দেরিও নেই।' বলেই, বোধ হয় একটু রেগে হন্‌হন্‌ করে চলে গেলেন।

খুব খারাপ লাগল। কিন্তু গুপি খুসি হয়ে বলল, 'যাক, বাঁচা গেল, লোকটা ঠিক ছিনেজোঁক, কিছুতেই তোকে ছাড়তে চায় না।'

আমি বললাম, 'না রে গুপি। উনি রবিবার ছাড়া রোজ আমাকে দু-ঘণ্টা করে হাতের কাজ শেখাবেন। প্রথমে আমরা স্পেস্-শিপের মডেল বানাব। তারপর সেটাকে বড় করে বানাতে কতক্ষণ!'

শুনে গুপিরো কি উৎসাহ!

আমি বললাম, 'আচ্ছা, ছোটমামাকে তো আর একদিন-ও দেখতে পেলাম না, গুপি। চাকরি গেল নাকি?'

গুপি বলল, 'আরে, না, না, তাই যায় কখনো! ছোটমামা ভয়ঙ্কর চালাক, প্রেসের ভিতরে আজকাল ওর দিনের বেলায় ডিউটি। বড় সাহেবকে পটিয়েছে। ক্যান্টিন দেখে। তার জন্যে পয়সা নেয় না, কিন্তু দুবেলা খাবার পায়। বড় সাহেবরা যা খায়, ও-ও তাই খায়। চপ, কাটলেট, মুরগির ভিন্দালু, পুডিং।'

দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ করে সে-সব কথা ভাবতে লাগলাম। তারপর গুপি বলল, 'কিন্তু বড় মাস্টারের কি রাগ! ওকে চেনেন না, জানেন না, তবু কেবলি ছোট সাহেবের কান ভাঙাতে চেষ্টা করবেন। স্রেফ্ হিংসে। ছোটমামা খাবে ক্যান্টিনে আর বুড়ো খাবে তেওয়ারির দোকানে, এই আর কি! সমস্তক্ষণ ছোঁকছোঁক করে ছোটমামার পিছনে ঘোরেন, প্রুফ দেখেন না হাতি! একটু যে তদন্ত করবে, ছোটমামার সে জো নেই'!'

আমি বললাম, 'কেন, রাতে তদন্ত করলেই হয়।'

শুনে গুপির কি হাসি, 'তাহলেই হয়েছে! ছোটমামার যা ভূতের ভয়! ও রাতে গলি দিয়ে নামল আর কি!'

আমি অবাক হয়ে গেলাম। 'তবে না নাইট ওয়াচম্যানের বদলির কাজ নিয়েছিল বলেছিলি?

গুপি বলল, 'তাতে কি হয়েছে। সব নাইট ওয়াচম্যানরা ভূতের নামে

জুজু! ছোটমামা সিঁড়ির মাথা থেকেই চৌকিদারি করত। আগের ওয়াচম্যান-ই তাই বলে দিয়েছিল। সে-ও তাই করত। এখানকার সব রাতের পাহারা-ওয়ালারাই তাই করে। আর ভূতে যারা বিশ্বাস করে না, তারা দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমোয়। মোট কথা ঠাণ্ডা ঘরে কি রকম স্পেস্-শিপ তৈরি হচ্ছে আর কারাই বা তৈরি করছে, এ বিষয়ে এতটুকু তদন্ত করার সময় পাচ্ছে না ছোটমামা। তাছাড়া ঐ সরকারি ছাপাখানাটা কি কম পুরনো ভেবেছিস্ নাকি। কোম্পানির আমলে ওটা এদিককার সবচেয়ে বড় গুদোমঘর ছিল। মোটে আশী বছর হল ছাপাখানা হয়েছে। ভূতফুত থাকলে ঐখানেই থাকা কিছু বিচিত্র নয়। ছোটমামা রাতে শুয়ে শুয়ে হাঁচড়পাঁচড় উঁয়া-উঁয়া শব্দ শোনে। কোনদিন না আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যায়।'

আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, 'মানা কর, গুপি, বাড়িতে পা দিয়েছে কি ক্যাঁক্ করে সামন্ত ওকে ধরবে। ওর ঘরে না চোরাই গাড়ির নম্বরপ্লেট পাওয়া গেছে!'

গুপি বলল, 'আরে দূর দূর! সে বিষয়ে ছোটমামাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বলল নাকি বড় রাস্তার ওদিকে পুরনো লোহার ডাঁই আছে, সেখান থেকে কুড়িয়ে এনেছে। গাড়ির নম্বরপ্লেট খুলবে ও! আমাকে দিয়ে নিজের পেনসিল কাটায়, ব্লেড দেখলে ওর গা শির-শির করে। নেংটি ইঁদুর ভয় পায়।'

তারপর হঠাৎ থেমে গুপি বলল, 'ছোট মাস্টারকে কি চোরাই কারবারি মনে হয়?'

ভয়ানক রাগ হল। বললাম, 'আমাদের বাড়িতে যারা আসে যায়, তাদের তোর সন্দেহ বাতিক থেকে বাদ দে। সামন্তর তো ধারণা যে তোর ছোটমামাই চোরাই কারবারের চাঁই!'

গুপি তার জিনিসপত্র গুটিয়ে তুলে চলে গেল। দরজার কাছ থেকে বলে গেল, 'আশা করি এর পরেও ছোটমামার স্পেস্-শিপে জায়গা আশা কর না।'

আমিও চটেমটে বললাম, 'যারা স্পেস-শিপ বানায়, তারা পুরনো লোহার ছ্যাকড়া ঘুড়ি চড়ে না।'

গুপি চলে গেলে মনটা খুব-ই খারাপ হয়ে গেল। স্কুলের সব খবর ওর কাছেই পাই। বলতে গেলে ও-ই আমার একমাত্র বন্ধু। ছোট

মাস্টারের হাতে লেখা চাঁদ বিষয়ক নোট বইটা খুলে বসলাম। তাতে এই সব লেখা ঃ—

(১) চাঁদ পৃথিবী থেকে গড়পড়তা দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে।

(২) তার মধ্যে দুই লক্ষ ষোল হাজার মাইল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির এলাকার মধ্যে। বাকি চব্বিশ হাজার মাইল চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের এলাকায়।

(৩) চাঁদে নামতে হলে প্রথমে মনে রাখতে হবে সেখানে বাতাস নেই। শব্দতরঙ্গ ওঠে না, অর্থাৎ কানে কিছু শোনা যায় না। নিশ্বাস নেবার অক্সিজেন নেই, কাজেই অক্সিজেনের ব্যবস্থা করে নিতে হবে। বায়ু নেই বলে সূর্যের আলোর বেজায় তাপ। আর রাতে বেজায় ঠাণ্ডা।

(৪) চাঁদের একেকটা দিন আর রাত আমাদের চোদ্দ দিনের সমান লম্বা। এক দিন আর এক রাতেই চাঁদের এক মাস কাবার হয়।

(৫) চাঁদ সর্বদা পৃথিবীর দিকে তার একটা পিঠ-ই ফিরিয়ে রাখে। পৃথিবী থেকে অন্য পিঠটা দেখা যায় না, তবে রকেট থেকে তার ছবি তুলে দেখা গেছে যে সে-দিকে পাহাড়-পর্বত কম। নামতে হলে ওদিকেই সুবিধা।

(৬) প্রথম বৈজ্ঞানিকরা চাঁদে গিয়ে, মাটির নিচে উপনিবেশ তৈরি করবে। তা হলে রাতের বড় বেশি ঠাণ্ডা আর দিনের বড় বেশি গরম থেকে বাঁচা যাবে। উপনিবেশটা হবে শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত।

(৭) নিশ্বাস নেবার অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে আর নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে যে কার্বন-ডায়ক্সাইড বেরুবে তাকে দূর করতে, ক্লরেলা বলে এক রকম শ্যাওলার চাষ করা হবে, মাটির নিচের সেই উপনিবেশে। ক্লরেলার অন্য নাম ডাক্-উইড।

এইসব পড়ে আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু তাহলে আমাদের বাতাসের ব্যবসাটা তুলে দিতে হয়। তা হক। ক্লরেলার চাষ করব। তা হলে জমি কিনতে হবে মাটির নিচে।

ভেবে দেখলাম চাঁদের মাটির তলার উপনিবেশে কি কি লাগতে পারে। জোনাকি পোকা সরবরাহ করা যায়। লক্ষ লক্ষ জোনাকি ছাড়লে মাটির তলার গুহা ঘর নিশ্চয় আলো হয়ে থাকবে। তবে হয়তো বিজলিবাতির ব্যবস্থা হবে। তাহলে জোনাকি লাগবে না। এক যদি না বিজলি বাঁচাবার জন্যে স্নানের ঘরেটরে ব্যবহার করা যায়। জোনাকি দিয়ে বোধ

হয় রান্নার উনুন জ্বালানো যাবে না। একবার ধরেছিলাম মুঠো করে পাঁচ সাতটা! একটুও গরম মনে হয় নি।

পরদিন রবিবার। যখন বড় মাস্টার এলেন, চাঁদের সম্বন্ধে না বলে পারলাম না। মিটমিট করে হাসতে লাগলেন। বললেন, 'তার চেয়েও অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক কথা হল যে আমাদের এই ভারতের দক্ষিণ দিকের তীরভূমির কাছাকাছি সমুদ্রের তলা থেকে রাজার ঐশ্বর্য তোলা যায়।'

আমি বললাম, 'মুক্তো?'

বড় মাস্টার হাসতে লাগলেন, 'মুক্তো হবে কেন? মুক্তো আর এমন কি, আজকাল মুক্তোর চাষ হয়, মুক্তোর দিন গেছে।'

'তবে?'

বড় মাস্টার বললেন, 'জাহাজডুবির কথা শুনেছিস্?' ইংরেজরা এদেশের নাম শোনার আগে পর্তুগীজরা ব্যবসা করতে আসত। আবার জলদস্যু বোম্বেটেরাও ছিল। সমুদ্রে লড়াই হত, ঝড় হত, ডুবন্ত পাহাড়ে জাহাজের তলা ফেঁসে যেত, জাহাজ-ডুবি হত। তার অনেক জাহাজ এখনো সমুদ্রের তলায় পড়ে আছে। সোনারূপোর গয়না, হীরে মণি মানিক্য, এত বড় বড় মোহর সমুদ্রের নিচেকার বালির উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে। কত লোকে নিজের চোখে দেখে এসেছে। আমিও।'

আমি অবাক হয়ে বড় মাস্টারের মুখের দিকে তাকালাম। চেয়ারের হাতলে দুহাত চাপড়ে, কেঠো পা মাটিতে ঠুকে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমিও। এবং এই কাঠের পা নিয়েই, আমাকে কি ঐ ফেরারি ছোটমামাটির চেয়ে কম ঠাউরেছিস নাকি?'

চমকে উঠেছিলাম। তবে কি গুপি ভুল বলল, ছোটমামাকে বড় মাস্টারমশাই চিনে ফেলেছেন? তাহলে সামন্তের কানে কথাটা তুলতেই বা কতক্ষণ! হয়ে গেল চাঁদে যাওয়া। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল ছোট মাস্টারের কথা। বড় মাস্টার বললেন, 'হাসছিস্ যে বড়? আমার কথাটা বিশ্বাস হল না বুঝি?'

'না, না, সেজন্যে নয়, ডুবো জাহাজের কথা খুব বিশ্বাস করেছি। কিন্তু কাল টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলাম, জিনিসপত্রে বোঝাই আকাশী নৌকো চাঁদে যাচ্ছে।'

'সে কি! চাঁদে জনমানুষ নেই, জিনিসপত্র যাচ্ছে আবার কি? কেনই বা যাচ্ছে?'

আমি বললাম, 'বাঃ, মাটির তলায় উপনিবেশ হবে যে। শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত উপনিবেশ তৈরি করতে হলে যন্ত্রপাতি, তার, তক্তা, স্ক্রু ইত্যাদি লাগবে না?'

বড় মাস্টার চোখ থেকে চশমা জোড়া খুলে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। তার পর বললেন, 'বুড়ো, ধরার কথা বলেছিলাম কি?'

সাত

আমি বললাম, 'বুড়ো-ধরা আবার কি? সে রকম আছে বলে তো শুনি নি।'

বড় মাস্টার বললেন, 'তা যদি না থাকত তো এতদিনে এই পৃথিবী বুড়োতে ছেয়ে যেত। তোদের আর দাঁড়াবার জায়গা থাকত না।'

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, 'আপনাকে ধরেছিল বুঝি?'

বড় মাস্টার রেগে গেলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, 'আমাকে আবার বুড়ো দেখলি কোথায়? বুড়োরা দিনের মধ্যে দশবার কেঠো পা নিয়ে পাঁচ তলা অবধি ওঠানামা করতে পারে?'

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে বলে ফেললাম, 'গুপির ছোটমামা বলেন আপনি ছাপাখানার লিফ্‌টে চড়ে চারতলায় ওঠেন, তারপর সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে পাঁচতলায় ওঠেন। সেটুকু সব বুড়োরাই পারে?'

মাস্টারমশায়ের মুখটা প্রথমে লাল হয়ে তারপর বেগনি হয়ে গেল। আমি তো ভয়েই মরি, এক্ষুণি না ফেটে যান।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে মাস্টারমশাই বললেন, 'গুপির ছোটমামা মানে সেই কুখ্যাত ফেরারি আসামী চাঁদু তো? সে আমাকে কোথায় দেখল?'

আমি তো মহা মুস্কিলে পড়ে গেলাম। এর আগেই গুপি আমাকে বলেছিল যে ছোটমামার প্রাণ আমার হাতে। আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'ওঁর ভালো নাম নৃপেন্দ্রনারায়ণ।'

'তা হতে পারে, কিন্তু সে আমাকে দেখল কোথায়?' এই বলে বড় মাস্টার আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইলেন।

আমি বললাম, 'না তা নয়, দেখেন নি হয়তো। কিন্তু উনি বলছিলেন যে সরকারি ছাপাখানার লিফ্‌ট তো চারতলায় শেষ। তারপর বোধ হয় তোদের মাস্টারমশাইকে হাঁটতে হয়।'

'কাকে বলছিলেন? তোকে?'

'না, না, আমাকে তো ভালো করে চেনেন না, তাই গুপিকেই বলেছিলেন। গল্পটা বলবেন না?'

বড় মাস্টার ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ওঃ, আমার জন্যে ভেবে ভেবে চাঁদুর বুঝি ঘুম হয় না? গুপিকে বলিস্ ওকে বলে দিতে— ও কি! অমন চমকে উঠলি কেন?'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বুঝেছি। বলবে কি করে? সে এতক্ষণে জলঢাকায় কি সোফিয়ায় কি নাথুলায় কি কোথায় তাই বা কে জানে।'

আমি বললাম, 'তা ছাড়া গুপির সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে, সে এখন আমাদের বাড়িতে আসবে না।'

সঙ্গে সঙ্গে গুপি ঘরে ঢুকে বলল, 'না স্যার, ওর কোনো কথা বিশ্বাস করবেন না, স্যার। ওর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বলে আসব নাই বা কেন, আপনার গল্প শুনব নাই বা কেন, খাব নাই বা কেন?'

এই বলে রামকানাইয়ের হাত থেকে ছোট ছোট মাংসের বড়া আর আলুমটর সিদ্ধর থালাটা নামিয়ে নিয়ে, তিনটে প্লেটে ভাগ করতে লাগল। মাস্টারমশাই একবার ওর দিকে, একবার আমার দিকে তাকাতে তাকাতে, চামচ দিয়ে খেতে লাগলেন। তখন গুপি পকেট থেকে দুটো মলাট-আলগা বই বের করে বলল, 'তা ছাড়া, ওর এসব পড়া দরকার। নইলে চাঁদে যাবার মতো যথেষ্ট জ্ঞান হবে কি করে?'

চোখ বুলিয়ে দেখলাম। একটার নাম, 'চাঁদে উপনিবেশ' অন্যটার নাম, 'চাঁদের আবহাওয়া'। ভেবেছিলাম ওর সঙ্গে কথা বলে কাজ নেই। বই দেখে বললাম, 'কোথায় পেলি রে?'

গুপি বলল, 'ছোট স্যারের কাছ থেকে নিয়েছিলাম।'

মাস্টারমশাই বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমাদের মাথা খেতে আর বড় বেশি বাকি রাখে নি তলাপত্র। ওটা কিসের মডেল?'

আমি খুব খুসি হলাম। বললাম, 'ওটা স্পেস্-শিপের পার্ট। ওর ভিতরে মানুষরা বসে থাকবে, মহাকাশযান পাক খেলেও মানুষগুলো স্থির

হয়ে বসে থাকবে।'

বড় মাস্টার একটুক্ষণ সেদিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'পুনালুর গেছিস্ কখনো ?' আমরা তো অবাক।

পুনালুর আবার কোথায় ? কোনো গ্রহের উপগ্রহট্রহ নয় তো ?'

মাস্টারমশাই হেসে বললেন, 'ঐ যা বলি, চাঁদ চাঁদ করে তোরা ক্ষেপে গেলি, অথচ এই পৃথিবীটার কিছুই দেখলি না। পনালুর শুধু এই পৃথিবীতে নয়, আমাদের নিজেদের দেশে। মাদ্রাজ থেকে ত্রিবান্দ্রাম যেতে হলে প্রায় একটা গোটা দিন লেগে যায়। পথে খাওয়ার খুব ভাল ব্যবস্থা না থাকলেও, যেই না পশ্চিমঘাট ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে আমাদের ট্রেন পুনালুরে থামল, প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ছোট্ট একটা স্টেশন, তার পরেই সমুদ্রের গন্ধ পেলাম। তার পরেই কুইলন বলে একটা জায়গায় নেমে পড়লাম। সঙ্গে সামান্য জিনিসপত্র। কিছু কাপড়-চোপড়, একটা শতরঞ্চি আর হাঁসের সাজ।'

আমি বললাম, 'হাঁসের সাজ আবার কি, মাস্টারমশাই ?'

বড় মাস্টার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। 'হাঁসের সাজ কি তাও জানিস্ না ? এই বিদ্যে নিয়ে চাঁদে যেতে যাস্ ? হাঁসের সাজ না পরলে সমুদ্রের তলায় সরজামিন তদন্ত করব কি করে শুনি ? কেঠো পায়ের উপর আড়াইমণি ডুবুরির পোশাক চাপালেই হয়েছে আর কি !'

গুপি গলা খাঁকরে বলল, 'অবশ্যি জলের নীচে আড়াই মণ আর কিছু আড়াই মণ থাকে না ! বয়েন্সি অর্থাৎ প্লবতা জলের একটা গুণ !'

বড় মাস্টার বিরক্ত হয়ে বললেন—'থাক, আর বিদ্যে জাহির করতে হবে না। এ-ও নিশ্চয় তলাপত্রর কাছে শেখা ?—বেশ, আড়াই মণ না হয় দেড় মণ-ই হয়ে যাবে, তবুও আমার শরীরের আড়াই মণ তার সঙ্গে জুড়তে হবে। কাঠের ঠ্যাং হয়তো ত্রিশ বছর সেই জাহাজের রান্নাঘরের টেবিল ঠেকিয়েছে। তারপর আমার কাছেই আছে ধর এই পঁয়ত্রিশ বছর। আর কত সইবে ?'

গুপি বলল, 'আচ্ছা, এবার বলুন হাঁসের সাজের কথা।'

বড় মাস্টার বললেন, 'আর কিছু নয়, দু পায়ে প্ল্যাস্টিকের তৈরি বড় বড় হাঁসের পা লাগিয়ে, মুখে মুখোস, চোখে বড় বড় গগ্‌লস্ এঁটে, পিঠে অক্সিজেনের থলি বেঁধে, মুখোসের ভিতরে নাকে তার নল গুঁজে, হাতে হার্পুণ নিয়ে তৈরি হয়ে নিতে কতক্ষণ লাগে ! অতিরিক্ত বেশি পয়সা কড়ির

বালাই নেই, সঙ্গে রিটার্ণ টিকিট আর যৎসামান্য খাই-খরচা। তাছাড়া, ছোট্ট বিছানা আর কাপড়-চোপড়। বাদামগাছের মগডালে সেগুলো ঝুলিয়ে রেখে, কুইলনের সমুদ্রের ধারে গিয়ে জেলেদের একটা নৌকো ভাড়া করলাম। তীর থেকে সিকি মাইলটাক গিয়ে নৌকোতে বসে বসেই যেই না হাঁসের সাজ পরেছি, ভয়ের চোটে নৌকোর মাঝি মাঝ-দরিয়ায় নৌকো থেকে নেমে যায় আর কি। অনেক করে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নৌকো থেকে টুপ করে জলে নেমে পড়লাম। নেমেই টের পেলাম ব্যাটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাঙার দিকে পাড়ি দিল। যাক গে, এসব সামান্য জিনিসে আমি ভয় খাই না। মিছিমিছি তো আর বর্মার শ্রেষ্ঠ সাঁতারুর সম্মান পাই নি। মানপত্র, সুবর্ণ পদক, টাকার থলি—যাক গে, নিজের বিষয়ে বেশি বলা আমি পছন্দ করি না।

আস্তে আস্তে ডুব দিলাম। একেবারে সমুদ্রের তলাকার বালির উপর নামলাম। বুঝতেই পারছিস্ সমদ্র সেখানে বেশি গভীর নয়, বিশেষ করে এই গরমের সময়ে। গভীর না হলেও অদ্ভুত। কানে কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু সবুজ আলোতে সব দেখতে পাচ্ছিলাম। অদ্ভুত আকারের মাছ, সমুদ্রের কচ্ছপ, আর কত রকম পলা আর আগাছা।

তলাপত্র তোদের যে এত রকম জ্ঞান দেয়, আশা করি একথা বলতে ভোলে নি যে পৃথিবীর তিন ভাগ যখন জল আর মাত্র এক ভাগ মাটি, তখন মাটিতে যত না ফসল হয়, জলে হতে পারে তার তিন গুণ। দেখলাম সে-সব ফসলের কিছু কিছু একেবারে গিজগিজ করছে, শুঁড় নাড়ছে, দাঁত দেখাচ্ছে, চোখ পাকাচ্ছে। ডাঙায় তুলে রেঁধে খেলেই হল। হাজার বছরের খাদ্য মজুত আছে সমুদ্রের নিচে! চাঁদে জমি কেনার কথা বলিস্ তোরা, সমুদ্রের তলাকার জমি কিনতে পারলে আর কথা নেই।'

এক জায়গায় দেখলাম একেবারে জ্যান্ত ঝিনুকে ছেয়ে আছে। প্রত্যেকটির মধ্যে একটি করে বড় মুক্তো না থাকে তো কি বলেছি!'

গুপি বলল, 'তুললেন না কেন দুচারটে?'

বড় মাস্টার ভুরু কুঁচকে বললেন, 'সামান্য মুক্তো তুলে সময় নষ্ট করব নাকি? আমার সামনে ছিল তার চেয়ে অনেক বড় উদ্দেশ্য। যার জন্যে এই অভিযান। তাছাড়া দুটো চারটে যে তুলি নি তাই বা কি করে জানিস্! দেখিস্ গিয়ে তোদের বৌঠানের কানে। চোখ টেরা হয়ে যাবে।'

একেবারে সমুদ্রের তলাকার বালির উপর নামলাম

বড় মাস্টার পানের ডিবে খুলে রামকানাইয়ের দিকে তাকালেন। রামকানাই রেডি ছিল। পকেট থেকে ভিজে ন্যাকড়ায় জড়ানো গোটা ছয় বড় পান বের করে ডিবে ভরে দিল। আজকাল দেখছি পারলে রামকানাই বড় মাস্টারের গল্প শুনতে ছাড়ে না। পরে অবিশ্যি নানা রকম মন্তব্য করে। ভারি ইয়ে হয়েছে ওর। যাই হোক, মুখে দুটো পান পুরে, দাঁতে চুণের টিপ মুছে, মাস্টারমশাই বলতে লাগলেন।

'একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপরে না উঠলে অক্সিজেনের থলি খালি হবার ভয় থাকে। তাতে অবিশ্যি ডাঙায় ফেরার অসুবিধে হয় না। উপরে উঠে সাঁতরে ফিরলেই হল। কিন্তু তদন্ত করতে হলে, তাড়াতাড়ি কাজ করলে হয় কখনো?

আর একাজ সারতে হবে খুব গোপনে। কেউ টের পেলেই হয়ে গেল। হাঁসের সাজ পরে দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়বে! পাকা খবর না নিয়ে যাই নি। খুব গূঢ় খবর। ঐখানে একটা পুরনো পর্তুগিজ জলদস্যুদের সমুদ্রের জাহাজ বমাল সমেত ডুবে পড়ে আছে। তিনশো বছরের বেশি হয়ে গেছে।

বর্মায় থাকতেই একজন নাবিক আমার বাবার কাছে একটা চিঠি আর এক সমুদ্রের তলার ছেঁড়া ম্যাপ এক টাকা দিয়ে বিক্রি করেছিল।—'

গুপি অবাক হয়ে গিয়ে বলল, 'মোটে এক টাকা দিয়ে?'

বড় মাস্টার বললেন, 'কেন, এক টাকা কি কম নাকি? আমার ঠাকুরদার বাবা এক টাকা দিয়ে একশো মণ ধান কিনতেন। এক টাকা রোজগার করতে পারিস? গল্প শুনবি, না কি?'

গুপি বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারপর?'

'তারপর হঠাৎ পায়ে কি একটা ফুটল। তুলে দেখি একটি মোহর, খাড়া হয়ে বালিতে বিঁধে আছে। চেয়ে দেখি চারদিকে বালিতে ছড়ানো হাজার হাজার মোহর। সামনে একটা পুরনো লোহার সিন্দুক ভেঙে পড়ে আছে। জং ধরে সবুজ হয়ে গেছে। তার গায়ে কত খুদে খুদে সামুদ্রিক প্রাণী বাসা বেঁধেছে।

চোখ তুলে দেখি আরেকটু দূরে মস্ত মরা তিমি মাছের মতো একটা পুরনো জাহাজ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। খোলটা উপর দিকে, তাতে অসংখ্য ছোট বড় ছ্যাঁদা। তার ভিতর দিয়ে শত শত ছোট, বড়, লাল, কালো, হলদে মাছ আসছে, যাচ্ছে। চেয়ে চেয়ে আর কূল পাই না।

তবে বেশিক্ষণ চাইতে হল না। চারদিক থেকে নিঃশব্দে পনেরো কুড়িটা ছায়া নেমে এল। দেখলাম পনেরো কুড়িটা সাহেব। সকালের হাঁসের সাজ, সঙ্গে শুধু হার্পুণ নয়, বন্দুকও। প্ল্যাস্টিকের থলিতে ভরা, যাতে ভিজে না যায়।

তারপর আর কি, দেখতে দেখতে আমাকে ধরে ফেলে তারা ভাঙা নৌকোর কানা তুলে তার ভিতর পুরে দিল। বলি নি এই ঘটনার বিষয়বস্তু হল বুড়ো-ধরা? এবং সত্যিই আমিই সেই হতভাগ্য বুড়ো। তারপর যত পারল সোনা দানা চেঁচেপুঁছে নিয়ে চলে গেল।

আমি প্রথমটা জাহাজের খোলের ভিতরকার গাঢ় অন্ধকার দেখে হকচকিয়ে গেলাম। তারপর আস্তে আস্তে যখন চোখ সয়ে গেল, তখন চেয়ে দেখলাম কত কঙ্কাল চারদিকে ছড়িয়ে আছে। তাছাড়া কত যে গয়নাগাঁটি ছড়ানো, সে আর কি বলব।'

গুপি বলল, 'আনলেন না স্যার, তা হলে এখন কত সুবিধে হত। স্পেস্-শিপের অনেক খরচ।'

বড় মাস্টার বললেন, 'তখন আমি বেরুবার পথ খুঁজতে ব্যস্ত, গয়না তোলার কথা মনেও হয় নি। তাছাড়া কঙ্কালগুলো জলের মধ্যে কেমন নড়ছিল চড়ছিল। শেষ পর্যন্ত হার্পুণ দিয়ে একটা ছ্যাঁদাকে আরেকটু বড় করে নিয়ে, বেরিয়ে পড়লাম। এদিকে অক্সিজেন প্রায় শেষ, কোনো মতে জলের উপরে উঠলাম। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছে। সারা দিন পেটে কিছু পড়ে নি। কোনো রকমে সাঁতরে ডাঙায় উঠলাম। তারপর বাদাম গাছের নিচে গিয়ে দেখি সর্বনাশ, বাঁদররা সব জিনিসপত্র তচনচ করে, চারিদিকে ছড়িয়েছে। অন্য জিনিস প্রায় সব-ই পেলাম। শুধু সেই চিঠিটা আর ম্যাপটা ছাড়া। মাঝে মাঝে কাগজে যখনি দেখি ডুবো জাহাজের সন্ধান পাওয়া গেছে ভারতের উপকূলের কাছে, ভাবি এই আমার সেই জাহাজ।'

গুপি বলল, 'তবে জাহাজটা তো আর সত্যি করে আপনার নয়। অন্যরাই বা নেবে না কেন?'

বড় মাস্টার বললেন, 'আমার নয় মানে? দস্তুরমতো এক টাকা দিয়ে ওর কাগজপত্র কেনা হয় নি বলতে চাস্?'

তারপর বললেন, 'বোধ হয় আমার ঐ নৌকোর মাঝি সাহেবদের গুপ্তচর ছিল। আমাকে নামিয়েই শহরে গিয়ে খবর দিয়ে এসেছিল।

এই রকম করেই সাহেবদের অত টাকা হয়েছিল।—নইলে!' এমনি সময় আমাদের গলিতে সে কি দুপদাপ ক্যাঁও ম্যাও! জানলা দিয়ে দেখি স্রোতের মতো বেড়ালের পাল ছুটে বেরিয়ে আসছে। বড় মাস্টার লাফিয়ে উঠে খটখট করতে করতে দৌড় দিলেন। দেখলাম তাঁর মুখটা অস্বাভাবিক রকমের সাদা। সঙ্গে সঙ্গে গুপিও ছুটল।

আট

আমি তো হাঁ করে বসেই রইলাম। রামকানাই এসে খাবারদাবারগুলো তুলে নেবার তালে ছিল। বারণ করলাম। বললাম, 'থাক, ওদের পুষ্টিকর খাবার দরকার হতে পারে। অস্বাভাবিক রকম দৌড়চ্ছে।' রামকানাই ফোঁস শব্দ করে চলে গেল। আরো অনেকক্ষণ পরে গুপি এসে কোনো কথা না বলে খেতে আরম্ভ করে দিল।

তারপর খানিকটা জল খেয়ে বলল, 'উঃফ্, ভাবা যায় না।'

আমি বললাম, 'নেপোকে দেখলে?'

গুপি মাথা নাড়ল। 'কই, না তো। তবে ঐ শত শত বেড়ালের মধ্যে চোখে না-ও পড়তে পারে।'

আমি চটে গেলাম। 'নেপোকে চোখে না-ও পড়তে পারে মানে? সাধারণ বেড়ালের দেড়া সাইজ ওর, গোঁপগুলো পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, বেঁড়ে ল্যাজ। চোখে পড়তে বাধ্য।'

গুপি বলল, 'তবে ছিল না।'

এমন সময় বড় মাসটারও হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলেন। ময়লা রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'সারা জীবন ধরে কোথায় না গেলাম, কি না দেখলাম। কিন্তু এর সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা হয় না। দশ ফুট চওড়া বেড়ালের নদীর কথা কেউ কখনো শুনেছে? তার উপর বেড়ালের ঢেউ।'

আমি তো অবাক্! 'বেড়ালের ঢেউ আবার কি?'

গুপি বলল, 'তাও বুঝলি না? পেছনের বেড়াল যদি বেশি জোরে দৌড়য়, তাহলে সামনের বেড়ালের পিঠের উপর উঠে পড়বে। অমনি

সেখানে ঢেউ উঠবে।'

বড় মাস্টার চেয়ারে বসে কেবলি মাথা নাড়তে লাগলেন। আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'বলুন না গঙ্গার ধারে কি হল?'

গুপি আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলল, 'বেড়ালের নদীর মাথায় তিনটে লোক দৌড়চ্ছিল। তাদের চুল খাড়া, চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছিল। বেড়ালরা একবার ধরে ফেললেই তো হয়ে গেল।'

বড় মাস্টার বললেন, 'দু জনের মাথায় দুটো মাছের চুপড়ি, একজনের মুখে দাড়ি। প্রাণের ভয়ে চুপড়ি ফেলে প্রথম দু জন দে দৌড়। বেড়ালের স্রোত এতটুকু থামল না।'

গুপি বলল, 'সামনের বেড়ালরা হয়তো থেমেছিল, কিন্তু তাদের মাথার উপর দিয়ে পেছনের বেড়ালরা সমান বেগে ছুটে চলাতে কিছু টের পাওয়া গেল না। ফেরার সময় দেখলাম চুপড়িগুলোর দুটো একটা বাঁশের কুচি পড়ে আছে। আর কিছু নেই।'

আমি উত্তেজনার চোটে চেয়ার থেকে ছয় সাত ইঞ্চি উঠেই পড়েছিলাম। 'আর বেড়ালরা? নেপোকে তো খোঁজা দরকার।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'তাকে আর পেয়েছ! নদীর ধারে পৌঁছে লোক তিনটে আর কোনো উপায় না দেখে, ঝপাঝপ দুটো খালি যাত্রীর নৌকোয় লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রাশি রাশি বেড়াল। তাই দেখে ঘাবড়ে গিয়ে যেখানে যত মাঝি ছিল যে যার নৌকো নিয়ে পাড়ি দিল। আর বেড়ালরাও ঝুপ-ঝাপ করে সে সব নৌকোয় চেপে বসল। পাঁচ মিনিটে গঙ্গার ধার ভোঁ ভাঁ। শুধু যারা হাওয়া খেতে গেছিল তারা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল আর দূর থেকে কানে এল একটা ম্যাও-ম্যাও শব্দ। এরকম যে সত্যি হতে পারে কে ভেবেছিল। আমিও না। অথচ একদিন এই আমি ব্রেজিলের সত্যিকার কাঁকড়ামতী নদী থেকে, প্রাণ হাতে নিয়ে বেঁচে এসেছিলাম। সে এক—'

আমি চেঁচিয়ে বললাম—'না, না, শুনব না। এত বেড়ালের মধ্যে নিশ্চয়-ই নেপো ছিল। কেন তাকে ধরে আনলেন না?'

খুব কান্না পাচ্ছিল। তার মধ্যে গুপি কর্কশ গলায় বলল, 'যদি থেকেও থাকে, তার বাড়ি ফেরার কোনো মতলব নেই।'

মাস্টারমশাইয়ের কি যেন মনে পড়াতে উঠে বললেন, 'যাই, আমার কাজ আছে। দ্যাখ্, পানু, আমাদের বড় সাহেব তোর জন্যে সায়ামিজ

ক্যাটের বাচ্চা দেবে বলেছে। তোর বেড়াল হারানোর দুঃখের কথা শুনে তার বড় কষ্ট হয়েছে। আচ্ছা চলি।'

বড় মাস্টার চলে গেলে গুপি আমার কাছে চেয়ার টেনে বসে বলল, 'ব্যাপারটা কিন্তু খুব ঘোরাল। যতদূর দেখলাম বেড়ালগুলো বেজায় মোটা। আর প্রত্যেকের গলায় ছোট্ট একটা করে সাদা টিকিট বাঁধা। সাধারণ বেড়াল নয় ওরা।'

আমি নাক টানতে লাগলাম। কান্না পেলে আমার সর্দি লাগে। গুপি আবার বলল, 'বেড়াল তাড়া করা দাড়িওয়ালা লোকটা ছোটমামা।'

এমনি চমকে গেলাম, যে সত্যি সত্যি চেয়ার-গাড়ি থেকে পড়ে গেলাম। রামকানাই ছুটে এল। দু জনে মিলে আমাকে টেনে তুলল। পায়ের গোড়ালিতে খুব ব্যথা লাগল। কানে এল ঠাণ্ডাঘর থেকে ঠক—ঠক—ঠক।

গুপি বলল, 'শুনতে পাচ্ছিস্ না? স্পেস্-শিপ তৈরি হচ্ছে। তবু ব্যাপারটা বুঝতে পাচ্ছিস্ না? ঐ বেড়ালরা কে তা টের পাচ্ছিস্ না?'

আমি হাঁ করে চেয়ে রইলাম।

গুপি বলল, 'ওরাই হল প্রথম ভারতীয় চন্দ্রযাত্রী। ট্রেনিং নিচ্ছে। আমি তখুনি সব বুঝতে পেরেছি, কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের সামনে কিছু বলি নি। ভারতীয় মানুষ যাবার আগে ওরাই চাঁদে যাবে। নেপো যদি আমাদের আগে চাঁদে যায়, তাতে তোর গর্ব হওয়া উচিত নয়। ভেবে দ্যাখ্, আমরা পৌঁছালে তার কি আনন্দটাই হবে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু পালিয়ে গেছে যে। চাঁদে যাবে কি করে?'

গুপি বলল, 'মোটেই পালায়নি। যাদের নেয় নি, তারাই পালিয়েছে। হয়তো গলার টিকিটে লেখাই ছিল, অমনোনীত, পড়তে তো আর পারি নি।

আমি বললাম, 'তা হলে কি করা উচিত?'

গুপি বলল, 'এখন মোটে সাতটা। আটটা অবধি বসি। ছোটমামা ঠিক সাঁতরে ফিরে আসবে। দারুণ সাঁতার কাটে জানিস্-ই তো। সেবার সেই-যে সোনার মেডেল পেল। বেড়ালরা কিছু জলে নেমে ওর পেছন পেছন সাঁতার দেবে না।'

সঙ্গে সঙ্গে চুপ্পড় ভিজে ছোটমামার প্রবেশ। দাড়িগুলো ভিজে গালের সঙ্গে লেপটে রয়েছে।

আমাকে বললেন, 'পানু, প্যাণ্ট দে, গামছা দে।' আমার আলনাতেই সব ঝোলানো থাকে। পাশেই স্নানের ঘর। দশ মিনিটের মধ্যে গা মছে, কাপড় বদলে ছোটমামা চেয়ারে বসে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। নাকি গলায় দাড়ি জড়িয়ে গিয়ে সাঁতারের খুব কষ্ট হয়েছে। তা ছাড়া ইলিশ মাছে পায়ের আঙুলে ঠুকরে দিয়েছে। আইডিন দেওয়া দরকার। তাই দেওয়া হল।

রামকানাই একবার উঁকি মেরে বলল, 'ঐ আরেক খোদ্দের এলেন।'

আমি বললাম, 'গরম চা জলখাবার কি আছে এনে দাও।'

রামকানাই গরম চা আর ডিম দিয়ে পাঁউরুটি ভেজে এনে বলল, 'থাকে কখনো ঘরে কিছু? এঁয়ারা যা সব রাক্কস।'

ছোটমামার খাওয়া শেষ হওয়া অবধি আমরা চুপ করে ছিলাম।

তারপর হাত ধুয়েই বড় বড় চোখ করে বললেন, 'বুড়ো চিনেছে নাকি আমাকে? তা হলেই তো বাবার কাছে লাগাবে, অমনি সামন্তর পেয়াদারা এসে ধরে নিয়ে যাবে। তা হলে রহস্য উদ্ঘাটন কে করবে?'

এই সময় ছোট মাস্টার টুক করে ঘরে ঢুকে একটা মোড়ায় বসে লজ্জিতভাবে বললে, 'চুল কাটাচ্ছিলাম পাড়ার সেলুনে। সেখানে বেড়ালের কথা শুনে ছুটে এলাম। ভাবলাম তাহলে হয়তো নেপোকে পাওয়া গেছে। কিন্তু তোমাদের মুখ দেখেই ভুল ভেঙেছে, আর বলতে হবে না।'

ঠক—ঠক—ঠক—ধড়াস্।

ছোট মাস্টার চমকে উঠলেন। 'দিনরাত ঠাণ্ডা ঘরে কাজ হয়, তবু বাড়ি তৈরি শেষ হয় না কেন?'

ছোটমামা আঙুল দিয়ে দাড়ি শুকোতে শুকোতে বললেন,—

'অন্য কাজ হয়। বাড়ি তৈরির কাজ নয়। ঠাণ্ডাঘর যদি হবে তো তার বিজলির ব্যবস্থা কই? সুযোগ পেলেই ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াই। এটুকু বঝেছি যে ওখানে ঠাণ্ডা করার কোনো ব্যবস্থাই হয় না।'

আমরা বললাম, 'তবে কি স্পেস্-শিপের কথাই ঠিক? ঠাণ্ডাঘরটা ছদ্মবেশ?

ছোট মাস্টার বললেন, 'তা স্পেস্-শিপ বানাবে, তার জন্যে অত গোপনীয়তার কি আছে? আমাদের দেশের লোকে মহাকাশযান তৈরি করছে, এতো ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়াবার কথা। লুকিয়ে করবে কেন?'

ছোটমামা বললেন, 'প্রকাশ্যে করলেই হয়েছে! অমনি প্ল্যান চুরি

যাবে, পার্টস্ চুরি যাবে, সরকারি তলব আসবে, স্পেস্-শিপ বানাচ্ছ তার পারমিট কোথায়, ছবিসহ দরখাস্ত কর। আমি জানি না? ফালতু জিনিস দিয়ে ঘরে বসে রেডিও বানিয়েই আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে! করতে হলে লুকিয়েই করতে হবে। আপনি যেন আবার এসব কথা ফাঁস করে দেবেন না।'

ছোট মাস্টার জিব কেটে বললেন, 'না না, কি যে বলেন! কিন্তু হাজার হাজার বেড়াল এল কোত্থেকে! স্পেস্-শিপ করতে কি বেড়াল লাগে? মানে লোম টোমে ইলেকট্রিসিটি—'

নেপোর জন্য বড় ভাবনা হল।

গুপি বলল, 'তাও বুঝলেন না? একেবারে ঝপ করে তো আর চাঁদে মানুষ পাঠানো যায় না। প্রথমে এদের সব পাঠানো হবে।'

'কিন্তু এতগুলো কেন? দুটো একটা পাঠালেই তো হয়। তাই তো সব দেশ থেকেই পাঠায়।'

গুপি বলল, 'মানুষের ওজন সইবে কি না সেটাও তো দেখা দরকার। একটা আড়াইমণি মানুষের সমান ওজন নিতে হলে, কটি দেড়-সেরি বেড়াল লাগবে বলুন তো? একেবারে একশো দেড়শো মানুষ নিরাপদে যাওয়া আসা করতে পারবে কি না, তাও তো দেখা দরকার।'

ছোট মাস্টার তখন জানতে চাইলেন, 'কোথায় রাখা হয়েছিল এত বেড়াল?' আমরা ছোটমামার দিকে চাইলাম।

গুপি বলল, 'ছোট করে বল, ছোটমামা!'

ছোটমামা বললেন, 'আজ অনেকদিন যাবৎ এই গুরু তদন্তের দায়িত্ব একলা—'

গুপি বলল, 'ছোটমামা, ফের!'

ছোটমামা বললেন, 'ঐ নকল ঠাণ্ডাঘরের ওদিকের দেয়ালে, ঠিক গঙ্গার উপরেই দেখলাম একটা বড় চোঙার মুখ। কাঠ দিয়ে এঁটে বন্ধ করা। সামান্য কাঠে আমি ভড়কাই না। দুটো মাছ-ওয়ালা রোজ গলি দিয়ে যায়, তাদের কিছু পয়সা দিয়ে রাজি করিয়ে, হাতুড়ি দিয়ে কাঠটি ভাঙালাম। কাঠ ভেঙে যেই না ওরা মাছের চুবড়ি মাথায় তুলেছে, অমনি চোঙার মধ্যে থেকে সে কি খচমচ খামচা খামচি!'

নয়

ছোটমামা বলতে লাগলেন, 'সে যে কিসের খ্যাঁচম্যাচ সেটা বুঝতে আর বেশি দেরি লাগল না। ঝরণার মতো ঝুপ ঝাপ ধুপ ধাপ করে কেবলি বেড়াল পড়তে লাগল। মাছ-ওয়ালারা একবার তাকিয়েই চুবড়ি তুলে দে দৌড়। আর যাবে কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে বেড়ালের নদীও ছুটল। আমিও কি আর সেখানে থাকি! পাঁইপাঁই লাগালাম। মাছের গন্ধেই বেড়াল বেরিয়েছে। আমি ছোটবেলা থেকে কড লিভার অয়েল খেয়ে মানুষ, আমাতে আর মাছেতে কতটুকু তফাৎ তোরাই বল। ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে কোনোমতে একটা নৌকোতে যদি বা উঠলাম, সঙ্গে সঙ্গে এই কেঁদো কেঁদো গোটা পঁচিশ বেড়াল। জলে নেমে সাঁতরে কোনো রকমে প্রাণটা হাতে করে ফিরেছি। পানু, আরো পান দে। আর সেই খোঁচা গোঁপ ভদ্রলোক কোথায় উঠে গেলেন? কে উনি?'

তাকিয়ে দেখি, তাই তো ছোট মাস্টার কখন হাওয়া হয়ে গেছেন। গুপি বলল, 'ওঁর নাম তলাপত্র, এম্ এ পাশ, বড় মাস্টারের শাকরেদ্।'

ছোটমামা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'কি সর্বনাশ! তবে তো নির্ঘাৎ ওঁর স্পাই! আর আমি কিনা ওঁর সামনে সব কথা ফাঁস করে দিয়েছি! ই—ই—স্!'

গুপি বলল, 'না, না, ছোটমামা তোমার সবতাতেই ইয়ে। উনি তোমার বিষয়ে কিছু জানেন না। তাছাড়া জানলেও কেউ তোমাকে এখন চিনতে পারবে না।'

ছোটমামা খুসি হয়ে দাড়ি চুমরোতে চুমরোতে বললেন, 'চিনতে পারবে না, না? বাব্বা, ক্যায়সা ছদ্মবেশটা ধরেছি তাই বল্! ছোট মাস্টার ছেড়ে দে, সে তো আমাকে আগে কখনো দেখেইনি, আমার নিজের বাবাই চিনতে পারবে না দেখিস্। ভাবছি লোহালক্কড়গুলো কিছু কিছু নিয়ে এসে কাছে রাখি। পানু, তোর খাটের তলায় কিছু রাখলে তোর আপত্তি আছে?'

আমি তো মহা মুস্কিলে পড়লাম। সেই যে নিতাই সামন্ত চোরের কথা বলে গেছিল, সেই ইস্তক রোজ রাতে মা একটা বেঁটে লাঠি দিয়ে

আমার খাটের তলা খুঁচিয়ে দেখেন। অথচ ছোটমামা যদি ভাবেন আমি ওঁকে সাহায্য করতে চাই না, তা হলে চাই কি হয়তো চাঁদের দল থেকে আমার নামটাই ছাঁটাই করে দেবেন। তাই বললাম, 'ইয়ে কি বলব, মানে, ইয়ে—'

গুপি বলল, 'না, না এখানে নিতাই সামন্তর বড় বেশি আনাগোনা। কে ওদের এক টিকটিকি এসেছে দিল্লী থেকে, সে শুঁকে শুঁকে ফেরারি আসামী বের করে দেয়।'

ছোটমামা চটে গেলেন, 'আমি ফেরারি হতে পারি, কিন্তু মোটেই আসামী নই। একটু তাড়াতাড়ি চাইছিলাম কারণ অ্যামেরিকানরা এর মধ্যে তিনটে লোক পাঠিয়ে চাঁদে বেড় দিয়ে এসেছে, এবার নাকি লোক নামাবে। এর পরে আর ওখানে জমিটমি পাওয়াই যাবে না।'

গুপি বলল, 'আমাদের হেডস্যার বলেছেন যে রাশিয়ানরা হয়তো এর আগেই ওখানে ঘাঁটি গেড়ে ফেলেছে—।'

আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, 'হ্যাঁ, আমি তোর দুরবীন দিয়ে স্পষ্ট দেখেছি, জিনিস বোঝাই নৌকো চাঁদে যাচ্ছে।'

গুপি বলল, 'না রে না, দুরবীনের কাঁচে কে একটা ছোট্ট খেলনা আটকে দিয়েছে, তাতে খুদে একটা নৌকো জলের মতো জিনিসে ভাসে, মনে হয় বুঝি সত্যি! কিন্তু অ্যামেরিকানরা চাঁদে নেমে যদি দেখে রাশিয়ানরা আগেই সেখানে ঘর বাড়ি করে ফেলেছে, তাহলে বেশ মজা হয়।'

এমনি সময় ছোট মাস্টার আবার ফিরে এসে মোড়ায় বসেই বললেন, 'চোঙা-টা লোহার ঢাকনি দিয়ে কে বন্ধ করে দিয়েছে। ঐ দিক দিয়ে ঢোকা যাবে না।'

ছোটমামা চমকে উঠে বললেন, 'কেন ঢোকা যাবে না? কিন্তু ঢুকবে কে?'

ছোট মাস্টার ছোটমামার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেন, রোগাপানা সাহসী কেউ ঢুকবে।'

ছোটমামা বললেন, 'খুব বেশি রোগা হওয়া চাই নাকি?'

ছোট মাস্টার কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, 'আমার চেয়ে রোগা কেউ। দাড়ি থাকলে ক্ষতি নেই। বরং চোঙার ভেতরে নরম লাইনিং-এর কাজ করবে।'

ছোটমামা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বাবা দাড়ি রাখা পছন্দ করেন না, ওটা চেঁচে ফেলব ভাবছি।'

ছোট মাস্টার বললেন, 'বাবা তো শুনেছি পড়াশুনো ফেলে লোহা-লক্কড়ের সন্ধানে ঘোরাও পছন্দ করেন না। তবে সাহস না থাকলে কে-ই বা চোঙার মধ্যে ঢুকবে বলুন? কোথায় কি আছে কে জানে।'

ছোটমামা উঠে পড়েছিলেন, আবার বসে পড়ে বললেন, 'কি আবার থাকবে? স্পেস্-শিপের গুপ্ত কারখানা আছে। বাইরের লোক ঢুকলে মাথায় হয়তো স্প্যানার মারবে।

ছোট মাস্টার বললেন, 'কিন্তু বেড়ালরাও ছিল মনে রাখবেন। এ কাজে বেড়ালের চেয়ে মানুষ পেলে অনেক ভালো হয় না কি?'

ভালো করে ওদের কথার মানে বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু দেখলাম ছোটমামার চোখ দুটো হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠল। কি রকম চাপা গলায় বললেন, 'মানুষ! চাঁদে নামার প্রথম মানুষ! ই-স্!' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'কিন্তু লোহার ঢাকনি আঁটা বললেন যে?'

ছোট মাস্টার বললেন, 'আহা, বাইরে থেকে রিভেট করা। ওস্তাদ লোকের পক্ষে সে আর এমন কি। তাছাড়া আমার মনে হয়—'

ছোটমামা বললেন, 'কি মনে হয়?'

'আজ রাতে রিভেট খোলা থাকতেও পারে। যা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।'

ছোটমামা বললেন, 'চলি। এ বেলা ডিউটি আছে।'

কেমন যেন ওঁকে দেখতে অনেক লম্বা অনেক ষণ্ডা অনেক লোমশ মনে হচ্ছিল। আমার শার্ট প্যাণ্ট পরেই চলে গেলেন। উৎসাহের চোটে আমার পায়ে বেজায় ঝিঁঝিঁ ধরে গেল। অথচ দশ দিন আগেও পায়ে কিছু টেরই পেতাম না। শেষটা হয়তো চাঁদে গিয়ে কোনো অসুবিধাই হবে না! এই সময় ছোটমামা ফিরে এসে বললেন, 'একটা কথা বলতে ভুলে গেছিলাম। গুপি, শোবার সময় জানলা একটু খুলে রাখিস্। তেমন তেমন হলে, পায়রা গিয়ে খবর দেবে।' বলেই সুড়ুৎ করে চলে গেলেন। আমরা অবাক হয়ে গুপির দিকে চাইলাম।

গুপি বলল, 'আমরা কয়েকটা পায়রা পুষে আমাদের বাড়ি আর দাদুদের বাড়ির মধ্যে খবর দেওয়া-নেওয়া করি। ছোট্ট ছোট্ট পাহাড়ি পায়রা, দিব্যি পকেটে পুরে রাখা যায়। একটা পায়রা ছোটমামাকে এনে

দিয়েছি। সেটার কথাই বলছেন।'

ছোট মাস্টার এমন কথা কখনো শোনেন নি। বললেন, 'উনি থাকেন কোথায় ?'

গুপি আমার দিকে চেয়ে একটু মাথা নাড়ল। ছোট মাস্টার লজ্জা পেয়ে বললেন, 'জানি অবিশ্যি আপাততঃ ছাপাখানায় চাকরি নিয়ে সেখানেই বসবাস করেন ! ভালো খানদান, কিন্তু সব সময় এত ঘোরাঘুরি করেন যে গায়ে মাংস লাগে না। শুনেছি একতলা থেকে পাঁচতলা অবধি দিনের মধ্যে পঁচিশবার ওঠানামা করেন। বড় স্যার ভারি চটা ওর উপর। তবে উনিই যে গুপির ফেরারি ছোটমামা এটা জানা ছিল না। সাহসী বটে।'

ছোট মাস্টার উঠে দাঁড়াতেই, গুপি ব্যস্ত হয়ে বলল, 'বড় মাস্টারকে ছোটমামার কথাটা বলবেন না কিন্তু স্যার, তাহলে সব ভেস্তে যাবে। শেষটা হয়তো আমাদেরও চাঁদে যাওয়া হবে না।'

ছোট মাস্টার বললেন, 'না, না, কোন কথাটা আমি তাঁকে বলেছি ? তবে চাঁদুকে তাড়াতাড়ি চাঁদে যেতে বল। কারণ সত্যিই এ-বছরেই অ্যামেরিকানরা গিয়ে হয়তো সেখানে ব্যবসা ফাঁদবে। তারপর পারমিট পাওয়াই এক মহা সমস্যা হবে।'

ছোট মাস্টার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল, গুপি বলল, 'নারে পানু, কাজটা খুব ভালো হল না। ছোটমামা চোঙায় ঢুকতে গিয়ে না আবার কোনো ফ্যাসাদে পড়ে। সাহসী হলে কি হবে। মাকড়সা, টিকটিকি, এমন কি ব্যাঙ দেখলেও ওর হাঁটু বেঁকে যায়। শেষটা চোঙায় ঢুকে না আটকে থাকে। তাছাড়া ছোট মাস্টার কি করে ছোটমামার ডাকনাম জানল ? নিশ্চয় তোদের কাছে শুনেছে। তোরা বড্ড কথা বলিস্। এ সব ব্যাপারে ছোট মাস্টারের এত কিসের মাথাব্যথা তা বুঝলাম না।'

গুপি চলে গেলে, অনেকক্ষণ বসে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলাম। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখতে পেলাম বড় মাস্টার হাত নেড়ে বৌকে কি বোঝাচ্ছেন আর বৌ ঘন ঘন মাথা নেড়ে আপত্তি জানাচ্ছে। কিছুদিন আগে বড় মাস্টারের বৌ-পোড়ার লোমহর্ষক কাহিনী শুনেছিলাম। বড় মাস্টার-ই বলেছিলেন। ঠিক যেন পরীদের গল্প। বর্মার ঘন জঙ্গলে বড় মাস্টারের বাবা সেগুন গাছের ইজারা নিয়েছিলেন। সেখানে যত সেগুন গাছ ছিল সব তাঁর কেটে আনার অধিকার ছিল। কিন্তু বনে গিয়ে সে গাছের শোভা দেখে আর কাটতে ইচ্ছা করত না। ভাবলেন

তার চাইতে বড় বড় ডাল কেটেও তো কাজ চালানো যায়।

একবার সারাদিন বনে বনে ঘুরেছেন। সঙ্গের লোকেরা অনেক ছড়িয়ে পড়েছে। চারদিক ছায়াছায়া থমথম করছে। লোকের মুখে শোনা নানারকম ভয়ের গল্প মনে পড়ছে। তারপর ঐ বনে বিখ্যাত ডাকাতের সর্দার রামুর কথাও মাঝে মাঝে কানে আসত। মাস্টারমশাইয়ের বাবা ভাবছিলেন অশরীরীদের চেয়ে বরং ডাকাতের সর্দারই ভালো। এমন সময় করুণ কান্নার শব্দ কানে এল।

মাস্টারমশাইয়ের বাবা চমকে উঠলেন। তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধি থাকলেও, মনটা তাঁর বড় নরম ছিল। কান্না শুনে আর থাকতে না পেরে খোঁজাখুঁজি লাগিয়ে দিলেন। হঠাৎ মনে হল তাঁরি একটা সেগুন গাছের তলা আলো করে কে যেন বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে। কাছে গিয়ে দেখেন সাত আট বছরের একটি ছোট্ট সুন্দর মেয়ে, দুধে আলতা গায়ের রং, আঙুরের থোপার মতো কোঁকড়া চুল। কার মেয়ে কোথায় বাড়ি কিছু বলতে পারে না।

জিজ্ঞাসা করলেই মা-মা বলে কাঁদে।

বাবা তাকে অভয় দিয়ে, সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে এলেন। মাস্টারমশাইয়ের মা ছিলেন না, কিন্তু বুড়ি পিসি ছিলেন। তিনিই অনেক যত্নে ঐ মেয়েটিকে মানুষ করে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। সবাই তখন মানা করেছিল, বলেছিল বন থেকে কুড়িয়ে আনা মেয়ে, কে জানে দৈত্যদানোর ঘরের কি না। কিন্তু পিসিমা কারো কথা শোনেন নি।

তারপর বৌয়ের একটু বয়স হলে রাতে বাড়িতে নানান উপদ্রব হতে লাগল। বাইরে থেকে কারা গোরু ছাগল চুরি করে। কারা যেন ছোরা ছুঁড়ে মারে। শেষটা বৌ একদিন আর থাকতে না পেরে সব ফাঁস করে দিলে। সে আসলে রামু ডাকাতের নাতনি। রামুই ওকে বনের মধ্যে ঐভাবে ফেলে রেখেছিল। যাতে বড় হয়ে মাস্টারমশাইয়ের বাবার বাড়ি থেকে ধনরত্ন নিয়মিত পাচার করতে পারে। এই রকম অনেক ছেলেমেয়েকে রামু এবাড়ি-ওবাড়ি পাচার করে, ফলাও করে ডাকাতি ব্যবসা চালাত। এতে করে মাসে গড়ে হাজার দুই উপায় হত।

কিন্তু মুস্কিল হল যে পিসির উপর মাস্টারমশাইয়ের বৌয়ের বড় টান। কিছু পাচার করা দূরে থাকুক, এতটুকু শব্দ শুনলেই হাঁউমাঁউ করে উঠে। শেষে ওর জন্যেই দলের দু-চারজন ধরাও পড়ল। তখন রামুর দল

ওদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সে অঞ্চল থেকে সরে পড়ল। ঐ আগুনে জিনিসপত্রের অনেক ক্ষতি হয়েছিল বটে, কিন্তু প্রাণে কেউ মরেনি। দুঃখের বিষয় বৌয়ের মুখের একদিকটা ঝলসে গেছিল। সেই অবধি বৌ আর কারো সামনে বেরোয় না। কিন্তু পিসিদের বাঁচাতে গিয়েই বৌয়ের এই দশা, তাই হাজার খিটখিটে হলেও মাস্টারমশাই ওর যত্ন করেন। পিসি তো ওর কোলেই মাথা রেখে নব্বুই বছর বয়সে স্বর্গে গেছেন।

গল্প শুনে গুপির আর আমার খুব দুঃখ হয়েছিল। বৌয়ের জন্যে গুপি কিছু ফুল এনে দিয়েছিল। মাস্টারমশাই খুব খুসি হয়েছিলেন মনে হল।

তবু রোজ রোজ এত কিসের তর্কাতর্কি ভেবে পেলাম না। আগে এমন ছিল না। জানলা দিয়ে শুধু বৌয়ের ঘোমটা পরা মাথাটুকু দেখা যেত। আজকাল মনে হয় বেশ ঘুঁষি পাকিয়ে মাস্টারমশাইকে ভয় দেখাচ্ছে।

তার পর দিন বিকেলে ছোট মাস্টার আমাকে হাতের কাজ শেখাতে এসে বললেন—'চাঁদে যাবার রকেটের এই মডেলটা বানিয়েছি দেখ।'

আমি তো অবাক। সব আছে দেখলাম। লঞ্চিং প্যাড পর্যন্ত। নাকি সত্যি ওড়ানো যায়। তবে খোলা জায়গা দরকার।

আমি বড় মাস্টারের ঘরের সামনে খোলা ছাদের দিকে তাকিয়ে বললাম—'ঐখানে যেতে পারলে বেশ হত।'

ছোট মাস্টার একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন। হঠাৎ বললেন, 'ছোটমামার কাছ থেকে কি কোনো খবর আসে নি?'

আমি বললাম, 'না তো।'

'মানে তিনি আছেন তো?'

আমি আঁৎকে উঠলাম। আছেন তো আবার কি? কত সময় তাঁকে দিনের পর দিন দেখা যায় না। ইচ্ছা করেই উনি গা ঢাকা দিয়ে থাকেন, যাতে পুলিসের নজরে না পড়েন।

ছোট মাস্টার হাত থেকে মডেলটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'কিন্তু চোঙার মুখের ঢাকনিটা কাল রাত থেকেই খোলা।'

আমি চমকে উঠলাম। 'সে কি! তাহলে কি ছোটমামা—। নাঃ, উনি তো রাতে বেরুতে ভয় পান।'

ছোট মাস্টার হাসলেন, 'উচ্চাকাঙ্ক্ষার কাছে ভয়-ডর টেকে না, তাও জান না। ভদ্রলোক কোনোরকম বিপদেটিপদে পড়েন নি তো? এক রকম আমার কথাতেই চোঙায় সেঁদোলেন।—আচ্ছা আজ ঠক-ঠক শব্দটব্দ কিছু শুনেছ কি?'

তাই তো! আজ তো ঠাণ্ডাঘর একেবারে চুপ। তাকিয়ে দেখলাম বড় মাস্টারের নাইটস্কুলের শেডে একটা নোটিস্ লটকানো রয়েছে!

ছোট মাস্টার বললেন, 'আজ স্কুল বন্ধ। বড় স্যারের বাড়িতে নাকি কি গোলমাল হয়েছে। বৌটিকে কিন্তু বড় বদ্‌মেজাজী মনে হয়। যদিও খাসা রাঁধে। ঙাপ্পি খেয়েছ কখনো?'

আমি বললাম, 'ওয়াক্ থুঃ'!

ছোট মাস্টার চটে গেলেন। ও আবার কি হল? যে জিনিস সম্বন্ধে কিচ্ছু জান না, তাকে ওয়াক থুঃ করার কোনো মানে হয় না। খুব ভালো জিনিস। এক থালা ভাতে এক চিমটি মাখলেই অমৃতের মতো লাগে। বড় স্যারের নিজের মুখে শোনা। ছাদের ঘরে ওঁর বৌ ঙাপ্পি বানায়। ফুলের টবের মাটিতে পুঁতে রাখে। একদিন একটু চেয়ে নেব।'

তারপর ছোট মাস্টার যাবার জন্যে তৈরি হয়ে বললেন, 'নাঃ মনটা বড় খুঁৎখুঁৎ করছে। গুপির দূরবীনটা দাও তো একটু দেখি।'

অনেকক্ষণ দেখলেন। সব ভোঁ-ভাঁ। ছাদে সেই ছোট ছোট সাদা কালো জানোয়াররাও চরছে না, তা সেই পেঙ্গুইন্-ই হোক, কি বেড়ালই হোক। শেষটা দূরবীন নামিয়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ছোট মাস্টার চলে গেলেন।

যেই না সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়েছেন, দরজা তখনো ভালো করে বন্ধ হয় নি খাবার ঘরের মধ্যে দিয়ে গুপি এসে হুড়মুড় করে ঢুকে বলল, —'পানু, সর্বনাশ হয়েছে!'

দশ

গুপি পকেট থেকে কিলবিলে গোলাপি রঙের কি একটা বিশ্রী

জানোয়ার আমার কোলের উপর ফেলে দিয়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবলি হাঁপাতে লাগল। আমার তো চক্ষুস্থির। মনে হল নতুন ধরনের ব্যাঙ। আমি আবার ব্যাঙ দেখতে পারি না। তাই বলে যে ভয় পাই তা যেন কেউ মনে না করে। খুদে একটা গোলাপি ব্যাঙ; তাও যদি মস্ত পায়রাখেকো ব্যাঙ হত। ফেলেই দিচ্ছিলাম কোল থেকে, এমন সময় ছোট মাস্টার আবার ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলেন—'ওর পায়ে বাঁধা ওটা কি?'

বলে আমার কোল থেকে ব্যাঙটাকে তুলে নিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলেন। বাঁ পায়ে ছোট্ট একটা এলুমিনিয়মের খাপের মতো। ব্যাঙটা থরথর করে কাঁপছিল। মাঝে মাঝে কালো ঠোঁট দুটো খুলছিল আর বন্ধ করছিল। ভারি অদ্ভুত লাগল। ব্যাঙের আবার ঠোঁট হয় জানতাম না।

গুপি গোল গোল চোখ করে এক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে, বলল, 'ওটা ব্যাঙ নয়, ও আমাদের বার্তাবাহী পায়রা, বিদ্যুৎ।' বল কি! পায়রা কখনো ব্যাঙের মতো হয়? গুপি বলল, 'হয় হয়। সব জানোয়ারের লোম ছাড়ালেই ব্যাঙের মতো। মানুষও। আমার ছোট বোনটা একেবারে ব্যাঙের মতো, শুধু একটু বড়, এই যা।'

ছোট মাস্টার ততক্ষণে পায়ের খাপটা খুলে ছোট একটা চিঠি বের করে ফেলেছেন। চিঠি খুলে চমকে উঠে সেটা গুপিকে দিলেন। গুপিও চিঠি পড়ে দারুণ ব্যস্ত হয়ে উঠে, আমাকে দিল। দেখি ফিকে পেনসিল দিয়ে লেখা—'গুপে চলে আয়। লোমহর্ষক ব্যাপার।' নামটাম নেই।

ছোট মাস্টার বললেন, 'চাঁদুর লেখাই তো?'

গুপি বলল, 'সে আর বলতে হবে না। অমন খারাপ লেখা আর কার হবে?'

ছোট মাস্টার বললেন, 'কিন্তু কোথায় চলে যেতে হবে? একেবারে শত্রুর খপ্পরে পড়ে যাবি না তো? ওরা যদি চিঠির কথা না-ই জানবে তো পায়রার পালক ছাড়াল কে?'

গুপি বলল, 'তাইতো, যে পালক ছাড়িয়েছে, সে খাপটাকেও দেখেছে। আর খাপ দেখেছে যখন তখন কি আর চিঠি খুলে পড়ে নি। পড়ে আবার গুঁজে রেখেছে। যাতে সবাইকে এক সঙ্গে ধরতে পারে। কে জানে ছোটমামা এতক্ষণ বেঁচে—!' গপি থেমে গিয়ে মুখ ঢাকল। হঠাৎ আমি

হেসে উঠলাম। ওরা তো অবাক।

ছোট মাস্টার ভারি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'একটা মানুষের মরণ-বাঁচন সমস্যা আর তোমার কি না হাসি পাচ্ছে!'

খুব লজ্জা পেয়ে বললাম, 'না, না, সেজন্যে নয়, তাছাড়া ছোটমামা যে সহজে মরবে না সেটা ঠিক! আমি হাসছিলাম কারণ নেপো যে বেঁচে আছে সেটা এবার প্রমাণ হল। পাখি ধরতে পারলেই ও তাদের পালক ছাড়ায়। পায়রা যেখান থেকে এসেছে, সেখানে নেপোও আছে।'

গুপি বলল, 'তার মানে সেখানে ছোটমামাও আছে। চলুন, ছোট স্যার তাকে উদ্ধার করতে হবে। বিপদ আপদ দেখলে ছোটমামার দাঁত-কাপাটি লেগে যায়।'

ছোট মাস্টার কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'তাহলে চাঁদে যাবার খুবই উপযুক্ত পাত্র দেখছি। তুমি বরং এগোও, আমি একটু কাজ সেরে আসছি।'

গুপি বলল, 'কার কত সাহস বোঝাই যাচ্ছে।'

ঐ ওর দোষ, অল্পতেই রেগে যায়।

ছোট মাস্টার কিছু মনে করলেন না। তাছাড়া বড় মাস্টারের কাছে তো দিন-রাতই এই ধরনের কথা শোনেন। নরম গলায় বললেন, 'মন্দ বল নি। দুজনে গেলে বেশি কাজে দেবে। তা হলে তোমরা এখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি কাজ দুটো সেরে আসি। ততক্ষণে এই বইটা থেকে চাঁদের বিষয়ে আরো কিছু তথ্য শেখো, কেমন?'

এই বলে ছোট একটা বই আমার হাতে দিয়ে ছোট মাস্টার এক রকম ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

ভারি ভালো বইটা। নাম 'চাঁদের রহস্য'। খুলে দেখলাম লেখা রয়েছে সম্ভবতঃ সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে গ্যাস আর ধুলো এক সঙ্গে জমে চাঁদের সৃষ্টি হয়েছিল, এই রকম মত কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ পোষণ করে থাকেন। অর্থাৎ চাঁদ পৃথিবীর চেয়েও পুরনো। কেউ কেউ আবার বলেন পৃথিবীর টুকরো ছিঁড়ে উড়ে গিয়ে চাঁদ তৈরি হয়েছে।

চাঁদ নিজের অক্ষ-দণ্ডে ২৭$\frac{১}{৩}$ দিনে একবার পাক খায়। পৃথিবীর চারিদিকে ২৯ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট একবার ঘুরে আসে। চাঁদের ব্যাসের মাপ ৩৪৫৬ কিলোমিটার। মাঝে মাঝে চাঁদে রঙের পরিবর্তন দেখা যায়, তার কারণ সম্ভবতঃ নিবে যাওয়া আগ্নেয়গিরির গহ্বর থেকে গ্যাস বেরোয়।

এই অবধি পড়ে গুপি বইটাকে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে, ঘরময়

পাইচারি করতে লাগল। দেখলাম মুখটা লাল। বোধ হয় কান্না চাপছিল। ঠিক সেই সময় হন্ত-দন্ত হয়ে ছোট মাস্টার ফিরে এসে বললেন, 'গুপি, চল।'

তারপর একটা ছোট্ট কার্ডে একটি গোপন টেলিফোন নম্বর লিখে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'যদি দেখ রাত দশটার মধ্যেও আমরা কেউ ফিরে এলাম না, তাহলে এই নম্বরে ফোন করে শুধু বলবে—ফুস্-মন্তর, ব্যস্ আর কিছু নয়। কার্ডটি তখুনি ছিঁড়ে ফেলো আর কখনো কাউকে বল না।' বলিও নি কাউকে, তা ছাড়া এখন ভুলেও গেছি। অবিশ্যি ফোন করার দরকার-ও হয় নি। কার্ডটাকে ছিঁড়েও ফেলেছি।

ওরা চলে গেলে পর আমার নানান কথা মনে হতে লাগল। পা দুটোর উপর এমনি রাগ হতে লাগল যে আর কি বলব। তার উপর রামকানাই এসে ইনিয়ে বিনিয়ে ওর পিসেমশাইয়ের কতবার কি অসুখ হয়েছিল তাই বলতে লাগল। ওকে বললাম, 'জান, নেপো বেঁচে আছে।'

রামকানাই তো অবাক। 'ওকি কথা পানুদা, যারা অনেকদিন সগ্‌গ ভোগ করছে, তাদের বিষয় অমন কথা বলতে হয় না। অবিশ্যি সগ্‌গ কি না সে বিষয়েও ঠিক বলা যায় না।

আমি বললাম, 'না, রামকানাইদা, না। নেপো ছাড়া কে বিদ্যুতের পালক ছাড়িয়েছে বল।' বুক পকেট থেকে বিদ্যুৎকে বের করে দেখালাম। রামকানাই তো হাঁ।

হঠাৎ বড় মাস্টারের জানলার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। ঘরে আলো জ্বলছে না। এই বাড়িতে আমরা চার বছর আছি, কখনো ও ঘর অন্ধকার দেখি নি। যেই না সূর্য ডোবে ও ঘরেও বাতি জ্বলে। একবার অনেকক্ষণ পাড়ার আলো নিবে গেছিল। নেবার সঙ্গে সঙ্গে ও ঘরে মোমবাতির আলো দেখতে পেয়েছিলাম। বৌ বোধ করি অন্ধকারকে ভয় পায়। অথচ একদিন ঐ বৌ-ই বনে বাস করত।

জানলার কাছে গিয়ে দেখলাম ছাপাখানার আর ঠাণ্ডা-ঘরের কোনো আলোই জ্বলছে না। নিচে বড় মাস্টারের নাইটস্কুলের শেডের সামনের বড় আলোও নেবানো। কোথাও একটা লোক দেখা যাচ্ছে না। তবু আমার ঘরে বসেই টের পাচ্ছিলাম যে ঐ দুটো বাড়িতে সাংঘাতিক কিছু একটা পাকিয়ে উঠেছে।

অমনি ওদিকের দরজা খুলে হুড়মুড় করে দাড়িওয়ালা একটা লোক,.........

রামকানাইকে বললাম, 'তুমি একবার যাও না, গুপি আর ছোট মাস্টারের সাহায্য দরকার হতে পারে।'

রামকানাই ফোঁস করে উঠল, 'ও বাবা, সে আমি পারব না। কেউটে সাপের বাসায় নাক গলানো আমার কম্ম নয়। তা ছাড়া আমি গেলে তোমার দেখাশুনো করবে কে! তোমাকে একা ফেলে যাই, আমার চাকরিটাও যাক্ আর কি। যাই, মাংসটা চাপিয়ে এসেছি।' এই বলে রামকানাই সত্যি সত্যি দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

দরজার কাছে পৌঁছে, ফিরে বলল, 'কোনো ভয় নেই, ঐ যে সামন্ত-বাবুও একদল প্যায়দা নিয়ে গলিতে ঢুকল। যাই, মাংস না ধরে যায়। চোর ধরার চেয়ে সে অনেক খারাপ হবে।'

আরো অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। রামকানাই একবার উঁকি মেরে দেখতে এল কি করছি। বললাম, 'সব শুনেও নেপোকে খুঁজতে যাবে না?'

রামকানাই বলল, 'না, আমার গুরুদেব শুনলে দুঃখিত হবেন!' এই বলেই চলে গেল। একটু পরে আবার এসে বলল। 'অত নেপো—নেপো কর কেন? মহা পাজি বেড়াল। অমন ঢের ঢের বেড়াল পাওয়া যায়। চাও তো দুটো একটাকে এনেও দিতে পারি।' চাঁদের বইটা ছুঁড়ে মারলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে কি চিৎকার!! শুনে আমার গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে উঠল। মনে হল কে চ্যাঁচাচ্ছে, 'পানু—পানু—পানু—ওরে পানু—বাঁচা—রে। মি—অ্যাঁ—ও মি—অ্যাঁও।' আর একি মিনিটও অপেক্ষা করলাম না, পাঁই পাঁই গাড়ি চালিয়ে একেবারে পেছনের বারান্দার ঘোরানো সিঁড়ির মুখের কাছে চলে গেলাম। মনে হল ওদিকে ওদের ঘোরানো সিঁড়ির মাথার দরজাটায় কারা যেন আছড়ে পড়ল। 'পানু—পানু—বাঁচা।' আর সে কি ম্যাঁও—ম্যাঁও শব্দ।

'ও রামকানাই দা। ও রামকানাই দা!' বলে চ্যাঁচাতে লাগলাম। উত্তর নেই। হঠাৎ দেখি রঙের মিস্ত্রিদের তক্তাটা আমাদের রেলিং-এর ধারে পড়ে আছে। এক মাথা সিঁড়ির রেলিং-এ বাঁধা। নিশ্চয় গুপির কাজ। হাত বাড়িয়ে সেটাকে তুলে নিলাম। বেশ ভারি। গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ির রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে ঠেলে ঠেলে যেই না ওদের সিঁড়ির সঙ্গে জুড়ে দিলাম, অমনি ওদিকের দরজা খুলে হুড়মুড় করে দাড়িওয়ালা একটা লোক, বেড়াল বগলে তক্তা পেরিয়ে চলে এল। সঙ্গে সঙ্গে গুপি

এসেই তক্তা টেনে নিল। কিন্তু ততক্ষণে আরো গোটা দশেক বেড়াল আমাদের বারান্দায় এসে উঠেছে। উঠেই কার্নিশ বেয়ে হাওয়া।

আমি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম। এবার উঠে গাড়িতে চেপে খাবার ঘরে এলাম। গুপি বারান্দার দরজাটা বন্ধ করে দিল। আমি কেবল বলতে লাগলাম—'ওরে নেপো! আবার ফিরে এসেছিস্!' আর নেপো আমার কোলে উঠে কেবলি আমাকে চাটতে লাগল। নেপোর গলায় দেখলাম একটা সাদা টিকিট ঝুলছে। তাতে লেখা—A।

ছোটমামা আর গুপি আমার বিছানায় বসে বসে খালি হাঁপাতে লাগল। তাদের মুখগুলো কাগজের মত সাদা, হাত পা কাঁপছে।

রামকানাইকে কিছু না বলতেই ওদের জন্যে গরম চা আর নেপোর জন্যে বাটি করে দুধ নিয়ে এল। টানতে টানতে নেপোকে আমার কাছ থেকে নিয়ে দুধের বাটির সামনে বসিয়ে দিল এবং বলা বাহুল্য নেপোও তৎক্ষণাৎ দুধের সদ্ব্যবহার করতে লেগে গেল।

এমন সময় দরজা ঠেলে মেজকাকু ঢুকেই, ওদের দেখে বললেন, 'এই যে তোমরা এখানে। ওটা কে? চাঁদু না? তুই আবার দাড়ি রেখেছিস্ কেন? চেঁচে ফেল, বিশ্রী দেখাচ্ছে, স্রেফ আইনভঙ্গকারী। তোরা এখানে কি কচ্ছিস্? এদিকে পাশের বাড়িতে বিনু তালুকদার যে কেল্লা ফতে করে দিয়েছে তাও জানিস না বুঝি? চাঁদু, এবার বাড়ি ফিরে নিশ্চিন্ত মনে পড়াশুনো করগে যা। বুড়ো বাপকে আর জ্বালাস্ নি।'

গড়গড় করে কি যে বকছেন কাকু আমি ভালো করে বুঝতেই পারছিলাম না। কিন্তু গুপি আর ছোটমামা কোনো কথা না বলে পাশাপাশি আমার খাটের উপর শুয়ে পড়ল। কাকু ব্যস্ত হয়ে রামকানাইকে বললেন, 'হাঁ করে বসে আছিস যে? ও দুটোর দাঁতকপাটি লেগেছে দেখছিস্ না? মাথায় জলের ঝাপটা দে!'

কিন্তু রামকানাইএর-ও এমনি হাত পা কাঁপছিল যে সেও নড়তে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত আমিই তাক থেকে কুঁজো নামিয়ে জলের ঝাপটা দিতে লাগলাম। তাই দেখে কাকু আবার ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, 'এ্যাঁ! তু-তু-ই হাটছিস্!'

তাইতো, দিব্যি হাঁটাহাঁটি করছি, এতক্ষণ তো টের পাই নি। বাবা-ও এসে ঘরে ঢুকে হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। কেন জানি হাঁউ মাউ করে কেঁদে ফেললাম। বাবা-ও নাক টানতে টানতে আমার হাত

ধরে আবার বসিয়ে দিলেন। পকেটে বোধ হয় চিপকে গিয়ে বিদ্যুৎ বক-বক্‌ম করে উঠল। মা এসে কিছু না বলে মহা কান্নাকাটি লাগালেন। এ তো বড় জ্বালা।

অনেক পরে বাবা বললেন, 'ডাক্তারবাবুকে ফোন্ করে দেওয়া হয়েছে, এখুনি আসবেন। বললেন এইরকম একটা উত্তেজনার-ই দরকার। কিন্তু এরা দুজন এখনো ভিজে বালিশে শুয়ে কেন? সদি লাগবে না?'

গুপি আর ছোটমামার দুজনারি সর্দির বড় ভয়। বাবার কথা শুনেই তড়াক করে উঠে বসে আমার তোয়ালে দিয়ে তারা মাথা মুছতে লেগে গেল।

তারপর বাবা মেজকাকুকে বললেন, 'কি ব্যাপার খুলে বল্ দিকি নি।'

কাকু বললেন, 'নিতাই সামন্ত এক্ষুণি এল বলে, এদের স্টেটমেণ্ট নিতে। তার কাছেই সব শুনো। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে গেছে। নিতাই ফোন্ করে বলল তোমার বাড়ি থেকে পাখি যেন না পালায়। তাই এলাম।'

একথা যেই না বলা, ছোটমামা আর গুপি দুজনেই লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। মেজকাকু বললেন, 'ও কি হচ্ছে? ওসব চলবে না। চুপ করে বসে থাক। আমি কথা দিয়েছি সে না আসা অবধি তোমাদের এখানে আটকে রাখব।'

গুপি বলল, 'কি, কি করে জানলেন আমরা এখানে?'

মেজকাকু তো অবাক। কি করে জানলাম? শুধু আমি না, পাড়াসুদ্ধ যত লোক অন্ধকার গলিতে খাপে দাঁড়িয়েছিল, সবাই দেখেছে তক্তা পার হয়ে দুজন আইনভঙ্গকারী এখানে আশ্রয় নিচ্ছে। খবরদার যদি নড়েছ!! আর সামন্ত আসার আগে ঠোঁট ফাঁক করবে না। তোমরাই পুলিসের সব চেয়ে বড় সাক্ষী। ভিতরের ব্যাপার স্ব-চক্ষে দেখে এসেছ। ছোট মাস্টার কোথায়? যাক গে, পুঁটিমাছ বোধ হয় বিনু তালুকদারের জালে পড়েছে।'

এই বলে মেজকাকু বেদম হাসতে লাগলেন। খুব রাগ হল।

তারপর গম্ভীর মুখ করে ছোটমামার দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি সত্যি এর মধ্যে জড়িয়ে আছ দেখে বড় দুঃখিত হলাম। তোমার বাবা এত ভালো লোক, গেলেই কি ভালো তামাক খাওয়ান। তবে নিতাই সামন্ত যেই

তোমার ঘরে চোরাই গাড়ির নম্বর প্লেট পেয়েছিল, তখনি সব আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছিল। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি তুমি দুষ্টুলোকের—'

ছোটমামা হঠাৎ রেগে গেলেন। 'ওসব আমি গোমেস ব্রাদার্স থেকে সের দরে কিনেছি, তার ভাউচার আছে মার হাতবাক্সে, গিয়ে দেখতে পারেন।'

শুনে মেজকাকু অবাক!

বাবা হেসে বললেন, 'ও হো, তোকে বলা হয় নি। চাঁদু যে স্পেস্-শিপ বানিয়ে গুপি আর পানুকে চাঁদে নিয়ে যাবে। সেখানে জমি কিনে ওরা স্পেস্-শিপ সারাবার কারখানা করবে। দ্যাখ্ চাঁদু, মাটির তলার জমি কিনিস্ কিন্তু, ওপরের জমি বাজে। হ্যাঁ কি বলছিলাম, তা চাঁদে যাবার খরচা কম নয়, ওরা পারবে কেন? তাই চাঁদু নিজেই স্পেস্-শিপ বানাবে। তাই নিয়ে এত ভাবতে হয় যে পড়া করার সময় পায় না। ফলে বি-এস্-সিতে সুবিধা করতে পারে না।'

এই অবধি বলে বাবা আর মেজকাকু যে যার নিজের হাতঘড়ি দেখলেন। মেজকাকু জানলার কাছে গিয়ে বললেন, 'দশটা বাজতে দশ মিনিট, আমাদের সকলের জন্যে রাঁধতে দিয়েছ আশা করি, বড়দা?'

রামকানাই দরজার কাছ থেকে বলল, 'খিচুড়ি, মাংস, আলুভাজা, বেগুনভাজা।'

গুপি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। আমি বললাম, 'ছি, মেজকাকু, তোমার শুধু খাওয়ার ভাবনা।'

গুপি আর ছোটমামা একসঙ্গে বলল, 'খাওয়ার ভাবনা খারাপ নাকি? উঃ পেটে চড়া পড়ে গেছে!'

ডাক্তারবাবু এলেন। আমার পা পরীক্ষা করলেন। হাঁটালেন, চলালেন, ওঠ্-বোস করালেন। তারপর ওষুধপত্র মালিশের ব্যবস্থা করে দিয়ে বললেন, 'পানু, এও তোমার এক রকম পরীক্ষা শেষ হল। তুমি খুব ভালো ভাবে পাস করেছ। এক মাস এক্সারসাইজ করবে, বাড়াবাড়ি করবে না। তারপর স্কুলে যেতে পারবে। কেমন, খুসি তো?'

আমার খুব সর্দি এসে গেল, কিছুই বলতে পারলাম না।

এমন সময় নিতাই সামন্ত এসে ঢুকলেন। সবাই চুপ।

মেজকাকু একটু কেশে বললেন, 'এই যে কানু, তোমার সাক্ষী-সাবুদ, অনেক কষ্টে আটকে রাখা গেছে।'

বাবা বললেন, 'তা ছাড়া অবিশ্যি দৌড়-ঝাঁপ করার মতো ওদের ক্ষমতাও নেই।'

ছোটমামা ভাঙা গলায় বললেন, 'দুদিন খাই নি। খাঁচায় বন্ধ করে রেখেছিল।'

নিতাই সামন্ত বললেন, 'তাই নাকি? ভাগ্যিস গুপিরা গেছিল!'

ছোটমামা চিঁচিঁ করে বললেন, 'মোটেই ওরা আমাকে উদ্ধার করে নি। আমিই বরং—'

গুপি বলল, 'ফের।'

ছোটমামা থেমে গিয়ে ঢোক গিলতে লাগলেন।

বাবা আর মেজকাকু একসঙ্গে বললেন, 'এবার তাহলে রহস্য উদ্ঘাটন হোক।'

নিতাই সামন্ত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ধৈর্য ধরুন। বিনু তালুকদার হয় তো রিং লিডারদের নিয়ে এখানে আসবেন, মোকাবিলা করতে। অর্থাৎ সবাইকে মুখোমুখি এনে ব্যাপার খোলসা করতে। তেওয়ারি রাখুর দলও আসবে, কিছু আসবাব সরালে ভালো হয়।'

আমি বললাম, 'আমার ঘরে কেন? তার চেয়ে সবাই মিলে বসবার ঘরে গেলে হয় না?'

সামন্ত বললেন, 'আরো ভালো হয় একদল যদি এখনি খেয়ে নেয়। চাঁদু, গুপি, পানু, এরা খেয়ে নিক। দেখো, আবার পালাবার চেষ্টা করলে হুলিয়া লাগিয়ে ধরিয়ে এনে ফাটকে দেব কিন্তু। আর ভালোমানুষের মতো খেয়ে নিলে, তোমাদের স্টেটমেণ্ট নিয়ে, আমার জিপে করে যার যার বাড়ি পাঠিয়ে দেব! তোমরা কিছু আসামী নাও, তোমরা হলে পুলিসের পক্ষের সাক্ষী।'

দরজার কাছ থেকে রামকানাই বলল, 'কোনো ভয় নেই। খাবার ফেলে ওনারা সগ্গেও যাবেন না। রান্না তৈরি।'

বাবা বললেন, 'চোপ।'

ছোটমামা বললেন, 'খেয়ে এসে সব বলব। কিন্তু আমাকেও গুপিদের ওখানে পাঠাবেন। বাবার কাছে এমনি গেলে, বাবা দাড়ি ছিঁড়ে দেবেন।'

খেয়ে দেয়ে সবে এসেছি অমনি আমাদের সদর দরজার ঘণ্টি তিনবার বেজে উঠল। নিতাই সামন্ত লাফিয়ে উঠলেন, 'ঐ, ঐ বিনু তালুকদারের লোকের সংকেত। আপনারা তিনটে বড় বড় শকের জন্য প্রস্তুত হোন।'

আমার পকেট থেকে বিদ্যুৎ আবার বকম-বকম করতে লাগল। আর নেপো তার পিঠটাকে কুলোর মতো করে, লোম ফুলিয়ে তিনগুণ বড় হয়ে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে অদ্ভুত একটা ট্-স্-ফ্-স্-স্ শব্দ করতে লাগল।

এগারো

শেষ পর্যন্ত সে রাত্রে আর কিছু শোনা হল না। ডাক্তারবাবু নিশ্চয় আমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছিলেন। হঠাৎ কেমন ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে গুপি আমাকে ঠেলে তুলল। রাতে সে বাড়ি যায় নি। আমার ঘরের কৌচে ঘুমিয়েছিল। অথচ আমি সে বিষয় কিছুই জানি না। ছোটমামার দেখা নেই!

চোখ খুলতেই গুপি আমার হাতে হারানো খাতা গুঁজে দিল। দুমড়ানো মুচড়োনো আঁচড়ানো কামড়ানো। এই আমার সেই আদি নেপোর বই। পরে গুপি নিয়ে গিয়ে মোড়ের মাথায় দোকান থেকে বাঁধিয়ে দিয়েছে। এতে আমি সমস্ত ব্যাপারটার যতখানি মনে আছে লিখে রেখেছি। যেমন মলাটে 'নেপোর বই' নাম লেখা ছিল, তেমনি আছে। ভেবেছিলাম কেমন বাড়েটাড়ে বাচ্চা বয়স থেকে সব লিখে রাখব। সে আর নানা কারণে হয়ে ওঠে নি। তাছাড়া সব কথা লেখাও যায় না। মহা পাজি।

খাতা পেয়ে অবাক হয়ে উঠে বসে গুপির দিকে তাকালাম। গুপি বলল, 'কাল বড় মাস্টারের ঘর থেকে ছোটমামা ওটাকে উদ্ধার করেছিল।'

এমনি অবাক হলাম যে পায়ের জোর চলে গেল, খাট থেকে পড়ে গেলাম, নিজেই খচমচ করে উঠে বললাম, 'তা-তার মানে?'

খানিকটা তোতলামি এসে গেল। পা যখম হওয়ার পর থেকে একটু তোত্‌লাই। আজকাল প্রায় সেরে গেছে।

গুপি বলল, 'সে অনেক কথা।'

বলে মুচকি হাসতে গিয়ে ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদতে লাগল।

আমি হাঁ করে চেয়ে রইলাম। তারপর বললাম, 'পোড়া বৌ মরেছে বুঝি?'

গুপি মাথা নেড়ে বলল, 'ঘোড়া নয়। বৌ নয়।'

'তবে ?'

'ওঁর দাদা।'

আমি বললাম, 'দাদা মরেছে তো তুই কাঁদছিস্ কেন ? তাকে তো চিনিস্ও না।'

গুপি বলল, 'মরে নি ! সামন্ত তিনটে শকের কথা বলেছিল। ঐ হল এক নম্বর।'

'তবে কেন কাঁদছিস্ ?'

'উনি বর্মায় যান নি কখনো, জাহাজডুবি হয় নি, বাঁদরদের দ্বীপ থেকে কেউ তাড়ায় নি, ডুবো-জাহাজে নেমে সোনা তোলেন নি, বনের দেউয়ের পাহাড়ে ওঠেন নি। ম্যাও নামে বেড়াল ছিল না। সব বানানো কথা। ঐ হল দু নম্বরের শক্! ওঁর দাদা বলেছে।'

তাই শুনে আমারো কেমন পেট কামড়াতে লাগল। 'তবে কি বৌ রামু ডাকাতের মেয়ে নয় ?'

গুপি বলল, 'না, না, কারো মেয়ে নয়, বৌই নয়, ও-ই দাদা।'

কেমন গোলমাল লাগতে লাগল। 'কার দাদা ?'

'বড় মাস্টারের দাদা। মোটর চুরির ব্যবসা ওঁর। ঠাণ্ডা ঘরের মালিক উনি !'

তারপর আরো খানিকটা কেঁদে বলল, 'স্পেস্-শিপ তৈরি হয় না ওখানে ! চোরাই গাড়ির চেহারা বদলি করা হয়। বিনু তালুকদার সবাইকে ধরেছে। তাই কাল তার আসতে দেরি হল। এসে সব বলে গেল। তুই তখন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লি ! আজ আবার আসবে, তোর জবানি নেবে।'

আমি বললাম, 'আ—আ—আমি কি—কি—কি—কিসের বিষয় জবানি দে-ব ?'

গুপি অবাক হয়ে বলল, 'বেড়ালের।'

'কি বেড়ালের জবানি।'

'নেপো বেড়ালের।'

আমি হাঁ করে তাকিয়েই রইলাম। নেপো ঘরে ঢুকে গুপিকে দেখে রেগে গর—র—র—গ—র—র করতে লাগল। গুপি দুঃখিত হয়ে বলল, 'এক রকম বলতে গেলে আমিই ওকে বাঁচালাম আর আমার উপর রাগ দেখাচ্ছে দেখ !'

'না না, তোর উপরে ঠিক নয়। তুই আমার আলোয়ানের উপর বসেছিস্ কি না, ঐখানে ও বসে।

গুপি সরে বসে বলল, 'মাস্টারের দাদা অবসর সময় হার্মোনিয়ম বানাত। অনেক জায়গায় নাকি তার খুব চাহিদা। অনেক পয়সা কামাত।'

আমি বললাম, 'কি রকম হার্মোনিয়ম ?'

গুপি অবাক হয়ে গেল। 'কেন, বেড়ালের হার্মোনিয়ম নিশ্চয়। নাকি সন্দেশ পড়ে শিখেছিল। খালি ঐ বেড়াল ধরা যা একটা সমস্যা হয়েছিল। সব বেড়ালের সারেগামার সুর ঠিক থাকে না। সুর ঠিক না হলে লোকে কিনবে কেন। বেসুরো গান কে শুনতে চায় ?'

কখন যেন বাবা এসে দাঁড়িয়েছিলেন টের পাই নি। বেজায় আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'বেড়ালের হার্মোনিয়ম আবার কি ?'

আমি বললাম, 'সেই যে সুবিমল রায় সন্দেশে লিখেছিলেন, কে যেন বানিয়েছিল। কাঠের খোপে খোপে বেড়াল বসাতে হয়, তলা দিয়ে ল্যাজ ঝোলে। একেক বেড়ালের একেক সুর হওয়া চাই, সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা। ল্যাজ ধরে টানলেই বেড়াল ঐ সুরে ম্যাও ধরে। দিব্যি গানটান বাজানো যায়।'

বাবা বললেন, 'পাগল নাকি ?'

গুপি একটু চটে গেল। 'না কাকা, পাগল নয়। অনেক বেড়াল জোগাড় করতে হত, তাদের সুর ঠিক চিনে গলায় টিকিট ঝোলানো হত। টিকিট তো সবাই দেখেছে। নেপোর গলাতেও ছিল।'

বড় মাস্টার ওর ল্যাজে পা দিতেই ও একেবারে এক টানে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা আ-আ করে চেঁচিয়ে উঠে দে পিট্টান। বড় মাস্টার বাড়ি গিয়ে দাদার কাছে ঐ কথা বললেন! শুনে অবধি দাদা আর বড় মাস্টারকে ছাড়ান দেয় নি। 'ওটি আমার চাই, ডি লুক্স হার্মোনিয়ম বানাব।' বড় মাস্টার দাদাকে ঘরে আটকে রাখার জন্যে বেড়াল জোগাড় করে দিতেন। নইলে দাদা কোথায় কি করে বসবে তার ঠিক কি। নাকি সতেরো বার জেল খেটেছে, পৃথিবীর নানান্ দেশে, নানান্ নামে। ঐ ছাদে বেড়ালরা চরত। মাছ আসত ওদের-ই জন্যে। কিন্তু বেশি খেলে গলার সুর খোলে না। তাই খাওয়া কমানো হয়েছিল। ঠাণ্ডা ঘরের চোরাই গাড়ির কারখানায় ওরা থাকত। খাওয়া কমানোতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

অমনোনীতরা ছাড়াই থাকত। তেওয়ারি তাদের গলা সাধাত। মহা দৌড়ঝাঁপ করত ওরা। সেদিন ছোটমামা চোঙা খুলতেই ওরাই নদীর স্রোতের মতো বেরিয়ে এসেছিল। চোঙার বাইরে থেকে মাছের গন্ধ একটুখানি নাকে ঢুকতে না ঢুকতেই।'

আমি বললাম, 'আর ছোটমামা?'

গুপি একটু হাসল! 'ছোটমামাই তো চোঙা দিয়ে কারখানায় ঢুকে, বেড়ালদের খাঁচা আবিষ্কার করে, নিজেই একেবারে থ। ছোটমামা একটা হীরো।'

এই বলে গুপি আরো খানিকটা কেঁদে নিল।

আমি বললাম, 'ওরকম করিস্ না। তাহলে আর একটা দামোদর ভ্যালি তৈরি হয়ে যাবে।'

গুপি বলল, 'চাঁদে যাবে না বলছে যে। নাকি বড্ড হাঙ্গামা।'

বেজায় রাগ হল। চেঁচিয়ে বললাম, 'চাঁদে যাবে না তো করবেটা কি শুনি?'

গুপি বলল, 'পুলিসে চাকরি নেবে। ঐ হল তিন নম্বরের শক!'

'পু-পু-লিসে চাকরি নেবে? সে আবার কি?'

'বিনু তালুকদার ওকে হাত করেছে বুঝলি না। ওকে দিয়ে কাজ হাসিল করেছে এখন আর কি ওকে ছাড়ে।'

বাইরের দরজার ঘণ্টি পড়ল। বাবা লাফিয়ে উঠে বললেন, 'ঐ যে মিঃ তালুকদারের দল এলেন বোধ হয়।'

সঙ্গে সঙ্গে মেজকাকু আর নিতাই সামন্ত ঘরে ঢুকে ধপাধপ করে একেকটা চেয়ারে বসে, কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন। মেজকাকু বললেন, 'উঃ, সাধে লোকে ওর নাম দিয়েছিল গোরিলা ঘোষাল! গায়ে কি জোরটা দেখলে? একবার গা ঝাড়া দেয় তো তোমাদের সব চাইতে জোরালো পাঁচ ছয়টা ছিটকে পড়ে! আবার তেজ কত! বুক চাপড়ে বলল,—কি করবি রে তোরা আমার? বৌ সেজে ঘোমটা দিয়ে সাত বছর কাটালাম, এখন আমার ভয় ডর বলে কিছু নেই। দে না পাঁচ বছরের জন্যে জেলে। পায়ের উপর পা দিয়ে তোদের পয়সায় দুবেলা খাব আর আমার হার্মোনিয়মের বইটা এই অবসরে লিখে ফেলব!—চাঁদু এল না; কালকের অত উত্তেজনার ফলে ওর পেটের অসুখ করেছে। গুপিদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। বাড়ি গেলে বুড়ো ওকে মাটিতে

বিছিয়ে দেবে।'

নিতাই সামন্ত বললেন, 'কি জানি শেষ পর্যন্ত গাড়ি চুরির কেসটা টিকবে কি না। ওখানে তো ঐ দুটো ভাঙা গাড়ি ছাড়া কিছু পাওয়া গেল না। নাকি গাড়ি সারাবার কারখানা। ও দুটোকে সের দরে কিনেছে। লাইসেন্স নেই বলে লুকিয়ে কাজ করে। এদিকে বেড়ালের হার্মোনিয়ম তৈরি করা কিছু বে-আইনী নয়। ঐ লাইসেন্স নেই বলেই যা খানিকটা জরিমানা করা যেতে পারে।'

বাবা বললেন, 'সবটা খুলে না বললে ঠিক বুঝতে পারছি না।'

সামন্ত বললেন, 'তাও বুঝলেন না? এর মধ্যে দুটো ব্যাপার জড়িত, এক গাড়ি চুরি, দুই বেড়াল চুরি। চোরের সরদার কিন্তু একজন-ই। ঐ যে বললাম গোরিলা ঘোষাল, বড় মাস্টারের দাদা। ঠাণ্ডা ঘরটা একটা ভাঁওতা। ওটা আসলে মোটরের কারখানা। আমাদের বিশ্বাস চোরাই গাড়ির, কিন্তু তার কোন প্রমাণ পাচ্ছি না। তাছাড়া হার্মোনিয়মের কাঠের খোল তৈরি হয় ওখানে। তারি ঠক ঠক শোনা যায়। এঁয়ারা তাই শুনে ঐ স্পেস-শিপ বানাচ্ছে, বলে আহ্লাদে আটখানা!

দেখলাম চমৎকার ব্যবস্থা। ঠাণ্ডাঘরের ছাদে ওঠার সিঁড়ি আছে ভিতরে। ছাদের কোণা দিয়ে নাইলনের দড়ির মই বেয়ে ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে বড় মাস্টারের ঘরে যাওয়া যায়। আবার সেখান থেকে বড় সিঁড়ি দিয়ে ছাপাখানার ভিতরে নামা যায়। নাইট ওয়াচম্যানের ঘরেও ঢোকা যায়। তাড়া খেয়ে গুপিরা তাই করেছিল। তারপর পানু তক্তা ফেলে দিতেই এবাড়িতে পালিয়ে আসতে পেরেছিল। নইলে গোরিলা ওদের মেরে পাট করে দিত। তার আগে কি হয়েছিল সে-কথা গুপিই ভালো বলতে পারবে। আমি তো তখনো পৌঁছই নি।'

গুপি দেখলাম খুব খুসি। হাসতে হাসতে বলল, 'ছোট স্যারের সঙ্গে গলি দিয়ে ঢুকে ও মাথায় গিয়ে দেখি ঠাণ্ডাঘরের গায়ের ছোট দরজাটা খোলা, হাওয়ায় দুলছে। ঐখানে গিয়ে ঢুকলাম। একটা প্যাসেজ দিয়ে যেতেই কারখানা। লোহালক্কড়, কাঠের ডাঁই, যন্ত্রপাতি! তেলে প্যাচ প্যাচে বিশ্রী জায়গা। একটা নিয়ন বাতি জ্বলছে। কেউ কোথাও নেই। তারপর একটা ফ্যাঁস ফ্যাঁস ফোঁস ফোঁস ম্যাও-ম্যাও মিউ মিউ শুনে দেখি বিরাট এক খাঁচার খোপে খোপে শত শত বেড়াল। এমন সময় কাতর কণ্ঠে কে বলল, "বাঁচাও!" এ ছোটমামা না হয়ে যায় না। দেখি মস্ত

খাঁচার এক ধারে আলাদা খোপে গুঁড়ি মেরে ছোটমামা বসে। ভয়ে আধমরা। চোঙা দিয়ে ওকে নামতে দেখেই কারখানায় যারা কাজ করছিল তারা নাকি ভূ—ত ভূ—ত বলে খিড়কি দোর খুলে দে দৌড়। ছোটমামা ঘরটা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখে ছাদ অবধি সিঁড়ি উঠে গেছে।

সিঁড়ি বেয়ে ঠাণ্ডাঘরের ছাদে গিয়ে দেখে, সামনে নাইলনের মই ঝুলছে। তাই বেয়ে একেবারে বড় মাস্টারের ঘরে, পোড়া বৌয়ের মুখো-মুখি। কিন্তু সে পোড়া বৌ নয়। এক হাত ঘোমটা, ঝোলা গোঁপ, মোটা বেঁটে গোরিলা ঘোষাল হার্মোনিয়ম পালিশ করছে। ওকে দেখে সে হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে উঠল। তারপর এক মিনিটের মধ্যে বগলদাবা করে, স্বচ্ছন্দে দড়ির মই বেয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে ঠাণ্ডা ঘরে। তারপর বেড়ালের খাঁচার অন্য অর্ধেকে পুরে বাইরে থেকে শিকল তুলে, কাষ্ঠ হেসে, কোনো কথা না বলে, আবার সিঁড়ি বেয়ে অদৃশ্য। সেই ইস্তক ছোটমামা ঐখানে বন্ধ, চ্যাঁচাবারো জো নেই। শব্দ করলেই বেড়ালেরা নাকি নখ বার করে। তারপর সামন্ত সাত আট জন পুলিস নিয়ে ঢুকলেন। এসেই আগে খাঁচার দরজা খুলে দিলেন।'

নিতাই সামন্ত খুব হাসতে লাগলেন। 'আর বলেন কেন, দাদা, খাঁচা খুললেও বেরোয় না। টেনে বের করতে হল। তখন আবার কিছুতেই নড়ে না, দ্বিতীয় খাঁচার বেঁড়ে ল্যাজের বেড়ালটা-ই নাকি নেপো। ওকে না নিয়ে নড়বে না। অগত্যা তাদের সবাইকে ছাড়া হল। তারা আবার আমাদের পা ঘেঁষে সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠল। তারপর সে যা হৈ-হৈ! গোরিলা ঘোষাল লাঠি হাতে তেড়ে এল। গুপি আর চাঁদু তখুনি দুদ্দাড় দৌড়। পিছন পিছন গোরিলা ছুটল। পানুই শেষটা ওদের বাঁচাল এ আমি বলতে বাধ্য।'

একটু খুসি না হয়ে পারলাম না। নিতাই সামন্ত বললেন, 'অনেক কষ্টে গোরিলাকে ধরা হল। তারপর তাকে আমাদের ভ্যানে তুলে বড় মাস্টারের খোঁজে ছাপাখানায় গিয়ে দেখি তিনি চোখে ম্যাগ্‌নিফ্রাইং চশমা এঁটে প্রুফ দেখছেন। এত সব কাণ্ড হল, তার কিছুই নাকি টের পান নি! বুঝলেন দাদা, ঐ নাইটস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে বিনু তালুকদারের চর ছিল। দোকানের বুড়ি সেজে ঘুঘু সমাদ্দার খবর সংগ্রহ করে দিত। বিনু তালুকদার একবার ধরলে কাউকে ছাড়ে না। এ সব প্ল্যান তার-ই।'

এই অবধি বলে নিতাই সামন্ত হাত ঘড়ির দিকে তাকালেন।

এর মধ্যে বিনু তালুকদার কোত্থেকে এল বুঝলাম না।

বাবা আবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

'মিঃ তালুকদার তো কই এখনো এলেন না?'

'আসবেন, আসবেন। ঐ বড় মাস্টারটিকে নিয়েই হয়েছে মুস্কিল। সব দেখেশুনে মনে হয় দাদার সঙ্গে হ্যাণ্ড-ইন্-গ্লভ যাকে বলে। অথচ বে-আইনী কিছু করেছেন বলে প্রমাণ খুঁজে পাচ্ছি না। এদিকে কি বলছেন জানেন, ওঁর দাদার নাকি একা জেলে কষ্ট হবে, ওঁকে সাকরেদ বলে ধরতে হবে। তা হলে নাকি বর্মার জঙ্গলে নাম দিয়ে অদ্ভুত স্মৃতি-কথা লেখার সময় পাবেন।'

মেজকাকুও হেসে কুটোপাটি! 'শোন একবার কথা! লোকটা চব্বিশ পরগণার বাইরে কখনো পা দিল না, উনি আবার "বর্মার জঙ্গলে" লিখবেন।'

ভীষণ রাগ হল! আমি কিছু বলার আগেই গুপি চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বলতে লাগল, 'কিচ্ছু দরকার নেই বর্মা যাবার। লিখতে হলে যাবার দরকার করে না, লিখবার ক্ষমতা থাকলেই হল।'

ঠিক এই সময় সুড় সুড় করে ছোট মাস্টার ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখেই গুপি রেগে চতুর্ভুজ হয়ে উঠল। 'কাল আমাকে শত্তুরের গর্তে ঠেলে দিয়ে কোথায় কেটে পড়লেন, স্যার? আমি'—

কানু সামন্ত ছুটে এসে গুপির মুখ চেপে ধরে বলল, 'স্-স্-স্ কাকে কি বলছ! উনিই বিনু তালুকদার, ছোট মাস্টারের ভেক ধরে এমন কি আমার পর্যন্ত চোখে ধুলো দিয়েছিলেন।'

গুপি আমার দিকে তাকাল। আমি গুপির দিকে তাকালাম। তারপর গুপি ছুটে গিয়ে ছোট মাস্টারের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বলল, 'স্যার, আমিও পুলিশে চাকরি করব।'

বিনু তালুকদার ওর পিঠ চাপড়ে, আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'স্পেস্-শিপের মডেলটা'—

আমি বললাম, 'বি-এস-সি পাস করে আমিও পুলিসে ঢুকব। চাঁদে গিয়ে কাজ নেই। যাওয়া হবেও না।'

'হবে না মানে? এই হল বলে। তারপর স্পেস্-শিপেও গুপ্ত গোয়েন্দা রাখা হবে।' ওঃ, বলতেই ভুলে যাচ্ছিলাম, তোমাদের বড় স্যার রবিবারে

এসে তোমাদের গল্প বলবেন। বর্মার সব ভালো ভালো অভিজ্ঞতা মনে পড়েছে, একদিন ফাটকে বসে বসে। এখন স্নান-খাওয়া করতে বাড়ি গেছেন।'

তখন গুপি আর আমি উঠে গিয়ে খাবার ঘরের দিকে চললাম। সঙ্গে সঙ্গে নেপো-ও চলল। বেঁড়ে ল্যাজ খাড়া করে।

সেজমামার চন্দ্রযাত্রা

আমার ছোটকাকা মাঝে মাঝে আমাদের বলেন, 'এই যে তোরা আজকাল চাঁদে যাওয়া নিয়ে তো এতো নাচানাচি করিস, সে কথা শুনলে আমার হাসি পায়। কই, এতো খরচাপাতি, খবরের কাগজে লেখালেখি করেও তো শুনলাম না, কেউ চাঁদে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে! তোরা আবার এটাকে বৈজ্ঞানিক যুগ বলিস, ছোঃ!'

আমরা তখন বলি, 'তার মানে? কী বলতে চাও, খুলে বলো না।'

ছোটকাকা বলেন, 'তার মানেটা খুবই সোজা। চাঁদে যাওয়াটা কিছু একটা তেমন আজকালকার ব্যাপার নয়। পঞ্চাশ বছর আগে আমি নিজেই তো একরকম বলতে গেলে চাঁদে ঘুরে এসেছি।'

আমরা তো অবাক!—'একরকম বলতে গেলে কী? গেছিলে, না যাও নি?'

ছোটকাকা বইয়ের পাতার কোণা মুড়ে রেখে পা গুটিয়ে বসে বললেন, 'তাহলে দেখছি সব কথাই খুলে বলতে হয়। বয়স আমার তখন বারো-তেরো হবে, পুজোর ছুটিতে গেলাম মামার বাড়িতে। সেজমামা অনেক করে লিখেছেন। এমনিতেই আমি কোথাও গেলে সেখানকার লোকেরা খুব যে খুসি হয় বলে মনে হয় না, আর সেজমামা তো নয়ই। তাছাড়া দিদিমা সারাক্ষণই এটা-ওটা দেন, খাওয়া-দাওয়া ভালো, পুকুরে ছিপ ফেললেই এই মোটা মোটা মাছ, গাছে চড়লেই ডাঁসা পেয়ারা। না যাবার কোনো কারণই ছিলো না।'

সেখানে পৌঁছে দেখি, সেজমামা কোত্থেকে একটা লড়ঝড়ে মোটর গাড়ি যোগাড় করে আমাকে নিতে স্টেশনে এসেছেন। আমাকে দেখেই, মাথা থেকে পা অবধি চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'আগের চেয়ে যেন একটু ভারি-ভারি লাগছে। হ্যাঁরে, তোর ওজন কতো রে?'

কিছুদিন আগেই স্কুলে সবাইকে ওজন করেছে। বললাম, 'আটত্রিশ সেরের সামান্য বেশি।'

সেজমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আবার বেশি কেন? সে যাকগে,

ওতেই হবে, এখন গাড়িতে ওঠ, চল্ তোকে একজায়গায় নিয়ে যাই, খুব ভালো খাওয়ায় তারা।'

সেজমামাকে গাড়ি চালাতে দেখে আমি তো অবাক, 'তুমি আবার গাড়ি চালাতে পারো নাকি?'

সেজমামা বেজায় রেগে গেলেন, 'কী যে বলিস! আরে এই সামান্য একটা গাড়িও চালাতে পারবো না? বলে কি না যে আমি—যাক্‌গে, চল্ তো এখন।'

সোজা নিয়ে গেলেন কুণাল মিত্তিরের রহস্যময় বাড়িতে। ও বাড়ির ভেতরে এখানকার কেউ কখনো যায়নি, কুণাল মিত্তিরের নাম সবাই জানে, তবে তাকে কেউ কখনো চোখে দেখেনি। একটা উঁচু টিলার ওপরে অদ্ভুত বাড়ি, বাড়ির চারিদিকে দেড়-মানুষ-উঁচু পাঁচিল, তার ওপরে কাঁটাতারের বেড়া, দেয়াল কেটে লোহার গেট বসানো, সেটা সর্বদাই বন্ধ থাকে। শোনা যায়, কুণাল মিত্তির নাকি নানা রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন, যে-সব সাধারণের জন্য নয়, অতি গোপন ও গুহ্যভাবে করতে হয়।

প্রকাণ্ড টিলাটার গা বেয়ে যদি চড়া যায়, ওপরটা চ্যাপ্টা, সবটা ঘিরে পাঁচিল, আশেপাশে কোনো গাছগাছড়াও নেই যে তাতে চড়ে পাঁচিলের ভিতরে দেখা যাবে কিছু। তার ওপর মাঝে মাঝে ভেতর থেকে বাড়ি-কাঁপানো গর্জন শোনা যায়, লোকে বলে নাকি দু'জোড়া ডালকুত্তা দিনরাত ছাড়া থাকে। মোট কথা, কেউ ওদিকে বড়ো একটা যায় না। চারদিকে দু'-তিন মাইলের মধ্যে কারো বসতিও নেই। ফাঁকা মাঠ, আগাছায় ভরা।

সেইখানে তো গেলেন আমাকে নিয়ে সেজমামা। আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে গাঁ গাঁ করতে করতে গাড়িটা তো টিলার ওপরে চড়লো। তারপর প্যাঁক-প্যাঁক করে হর্ন বাজাতেই লোহার দরজা গেলো খুলে। আমরাও ভেতরে গেলাম। অবাক হয়ে দেখি চমৎকার ফলবাগান, একতলা লম্বা একটি বাড়ি, তার বারান্দায় একটা বড়ো কালো বেড়াল সোজা হয়ে বসে সবুজ চোখ দিয়ে আমাদের দেখছে। একটা উঁচু দাঁড়ে নীল কাকাতুয়াও একদৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। আমাদের বলছি কেন, আসলে আমাকে দেখছে।

অমনি চারিদিক থেকে দলে দলে চাকরবাকর ছুটে এসে মহা খাতির করে আমাদের নামালো। বারান্দা থেকে একজন ভদ্রলোকও এগিয়ে এলেন, ফর্সা কোঁকড়া চুল, বেঁটে মোটা, বয়স বেশি নয়। সেজমামাকে

ফিসফিস করে বললাম, 'ঐ নাকি সেই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কুণাল মিত্তির, যাকে কেউ চোখে দেখেনি।'

শুনতে পেয়ে ভদ্রলোক চটে গেলেন, 'কেউ চোখে দেখেনি কী, আমি বিলক্ষণ দেখেছি। বিশ্রী দেখতে।'

সেজমামা বললেন, 'আহা, বড়ো কথা বলিস। ঐ তোর দোষ। কিছু মনে করো না, মনোহর—উনি কুণাল মিত্তির হতে যাবেন কেন, কুণাল মিত্তির ওঁর বাবা, ওঁর নাম মনোহর মিত্তির, আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়েছি। একদিন উনি ওঁর বাবার চেয়েও অনেক বেশি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হবেন। জানিস তো, মিত্তিররা কী রকম চালাক হয়।'

মনোহরবাবু তাই শুনে ছোটো গোঁফটাকে একটু নেড়ে বললেন, 'আর তুমিও তারচেয়ে খুব বেশি কম বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হবে না।—কী যেন নাম তোমার বললে?'

বললাম, 'আগে বলিনি, এখন বলছি—ইন্দ্র।'

খুসি হয়ে বললেন, 'ইন্দ্র? তা ইন্দ্রই বটে, চাঁদের মাটিতে প্রথম পা দেবার গৌরব হবে যার, সে ইন্দ্রের চেয়ে কোন্ দিক দিয়ে কম বলো দিকিনি।'

চারপাশের লোকজনেরা বলতে লাগলো, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।'

আমার চক্ষু ছানাবড়া। চাঁদে যাবো নাকি আমি?

বললাম, 'সে আমার যেতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু একা যাবো না। তাছাড়া, আবার ফিরে আসবো তো? ডিসেম্বরে আমার ক্রিকেট ম্যাচের টিকিট বলা আছে কিন্তু।'

সেজমামা আর মনোহরবাবু মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। শেষে মনোহরবাবু বললেন, 'তা হ্যাঁ—তা ফিরে আসবে বইকি, যাবে আর আসবে না, সে কি একটা কথা হল নাকি! কিন্তু আর দেরি কিসের জন্য? চলো তো দেখি ইন্দ্র, আমার সঙ্গে।'

গেলাম বাগান পেরিয়ে একটা জায়গায়। তার মাথার ওপর দিয়ে লম্বা একটা কী বেরিয়ে রয়েছে, বিকেলের পড়ন্ত রোদে চিকচিক করছে, আগাটা ক্রমশ ছুঁচলো হয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে।

বেড়ার দরজা চাবি দিয়ে খুলে মনোহরবাবু সরে দাঁড়ালেন, আমিই আগে ঢুকলাম।

গিয়ে যা দেখলাম সে আর কী বলবো। আগাগোড়া অ্যালুমিনিয়মের
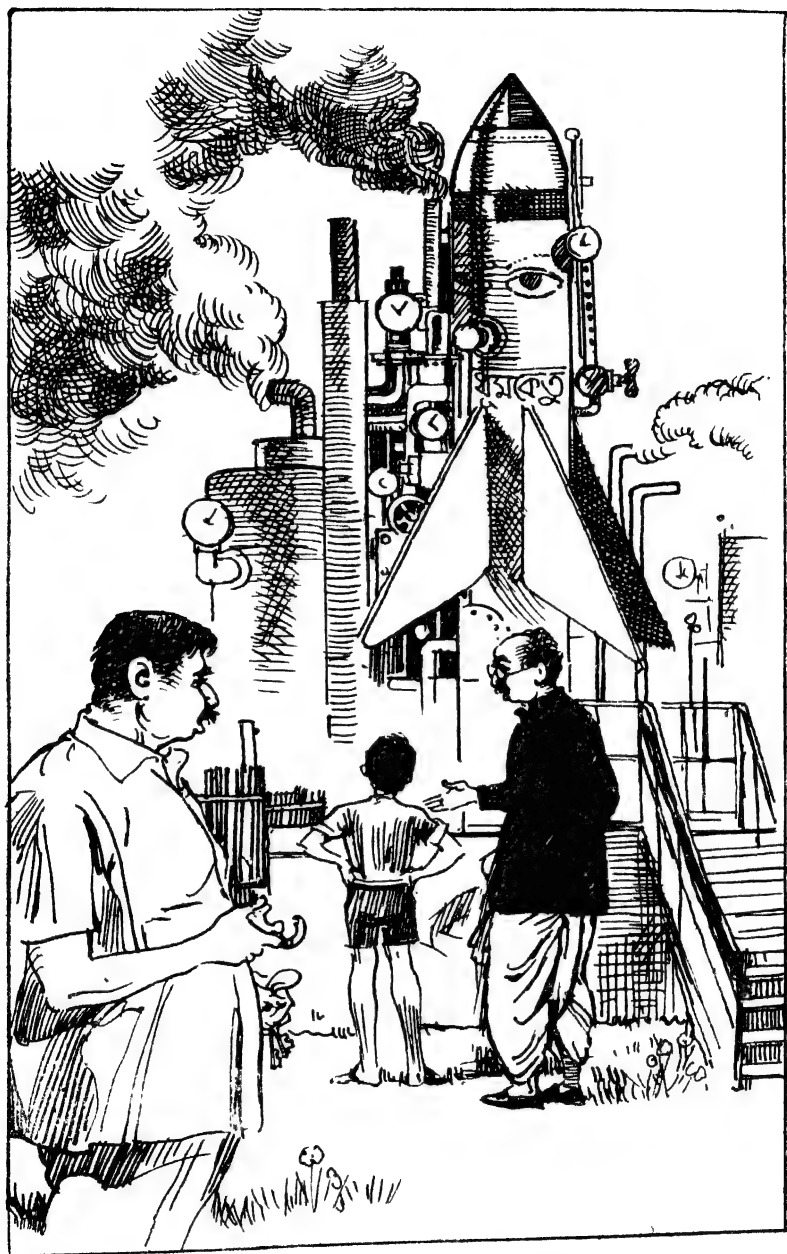
গিয়ে যা দেখলাম সে আর কি বলব।

মত কী ধাতু দিয়ে তৈরি কী একটা বিশাল যন্ত্র, অবিকল উড়ুক্কু মাছের মত দেখতে, তবে ডানাগুলো অনেক ছোটো আর পিছন দিকে বেঁকিয়ে বসানো। দেখলেই বোঝা যায় যে একবার ছেড়ে দিলেই অমনি সুড়ুৎ করে তীরের মত ওপরে উঠে, নীল আকাশের মধ্যে সেঁদিয়ে যাবে। চাঁদে যাওয়া এর পক্ষে সেরকম কিছুই শক্ত হবে না।

নিচে একটা গোল প্ল্যাটফর্ম ওটাকে চারিদিকে ঘিরে আছে, সেটাই প্রায় একতলার সমান উঁচু হবে, তারো নিচে যন্ত্রটার আরো অনেকখানি রয়েছে। রূপোলি গায়ে কালো দিয়ে লেখা 'ধূমকেতু'। আর একজোড়া এই বড়ো বড়ো চোখ আঁকা। আশেপাশে কতো রকম যন্ত্র দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, বোঝা গেলো—একবার সেইগুলো খুলে দিলেই আর দেখতে হবে না।

মনোহরবাবু চোখ ছোটো করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হালকা হওয়া চাই। এই বেদে, দেখ তো ওর পকেটে কী।'

বেদে বলে লোকটা এগিয়ে আসতেই বললাম, 'এই খবরদার, তাহলে কিন্তু চাঁদে যাবো না বলে রাখলাম।'

মনোহরবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'ওরকম করিসনে বাপ, চাঁদে যাবি না কী রে? তুই না গেলে কে যাবে বল দিকিনি? কেউ রাজিও হবে না, তাছাড়া তোর প্যাণ্টের মাপে সব তৈরি! এখন না গেলে যে আমার জীবনের সব কাজ ব্যর্থ হয়ে যাবে! বলছি, আমার শালাকে বলে তোকে মোহনবাগান ক্লাবের লাইফ-মেম্বার করে দেবো।'

ওঁর হাত ধরে বললাম, 'দেবে তো ঠিক? বাবা—সেজমামা কতো চেষ্টা করেও হতে পারেনি। শেষটা কিন্তু অন্যরকম বললে—'

মনোহরবাবু রেগে উঠলেন, 'বলছি করে দেবো, আবার অতো কথা কিসের? ফিরে তো এসো আগে।'

বেদে বললো, 'যদি আসো!'

মনোহরবাবু তাকে ধমক দিলেন, 'তোমাকে অতো কথা বলতে কে বলেছে বাছা? যাও, নিচে গিয়ে পাওয়ার লাগাও দিকিনি, নইলে—'

বেদে অমনি একটা ছোটো সিঁড়ি দিয়ে যন্ত্রের তলায় চলে গেলো।

সেজমামা মনোহরবাবুকে বললেন, 'ফিরে আসার কলকব্জাগুলো ওকে বুঝিয়ে দিও মনোহর।'

মনোহরবাবু বললেন, 'ও কি ওর বাবা-মার একমাত্র সন্তান?'

আমি বললাম, 'আরে না না, আমার দুটো ভাই, দুটো বোন।—আচ্ছা, লাইফ-মেম্বার করে দেবেন তো? কারণ বাবা হয়তো চাঁদা দেবেন না।'

মনোহরবাবু বললেন, 'তাই দেবো। পকেটে কী আছে বের করে এইখানে রাখো তো দেখি।'

মেশিনের তলা থেকে একটা ঘড়ঘড় শব্দ শুরু হল, তারপর কেমন শোঁ-শোঁ করতে লাগলো। মনোহরবাবু একবার নিজের হাতঘড়িটা দেখে নিলেন। আমি পকেট থেকে লাট্টু লেত্তি, ইয়ো-ইয়ো রুমাল, নীল গুলি, রুমেনিয়ার দুটো ডাকটিকিট—মনাদা দিয়েছিলো—আধঠোঙা নরম ঝাল ছোলা ভাজা, টর্চ, আমার বড়ো গুলতিটা আর এক কৌটো শট বের করে রাখলাম। মনোহরবাবু তো অবাক!

'এসব কিচ্ছু নেবার দরকার নেই, শুধু ওজন বাড়ানো। খালি এই নোট বই আর পেনসিলটা নেবে। কী দেখবে, না দেখবে, শরীরে কেমন বোধ করবে, সব টুকে রাখবে। আর এই হাতঘড়িটা নেবে, এতে কখন পৌঁছোলো ইত্যাদি—ও কি হলো, চলে যাচ্ছো যে।'

আমি বললাম, 'গুলতি শট না দিলে আমি যাবো না।'

সেজমামা বললেন, 'থাকগে মনোহর, এখন মনে হচ্ছে, তুমি বরং আর কাউকে দেখো।'

মনোহরবাবু বললেন, 'বেশ, তা হলে আমার হাজার টাকা ফিরিয়ে দাও, আমি এক্ষুণি অন্য লোক দেখছি।'

সেজমামা চুপ। আমি বললাম, 'তাতে কী হয়েছে সেজমামা? আমার গুলতি দিলেই আমি যাবো। অবিশ্যি বড্ড খিদে পেয়েছে, তাই আগে খানিকটা খেয়েও নেবো। আর বলেছি তো—একা যাবো না।'

মনোহরবাবু চটে গেলেন, 'একা যাবো না আবার কী? জানো, ঐ কাকাতুয়াটা আর বেড়ালটা দু'-তিনবার একা গেছে, কিচ্ছু বলেনি।'

বললাম, 'চাঁদ অবধি গেছে?'

মনোহরবাবু বললেন, 'চাঁদ অবধি গেছে কিনা বুঝতে পারা যাচ্ছে না বলেই তো তোমাকে পাঠানো হচ্ছে। নিদেন তোমার খাতা পেনসিলটা ঐ যে ছোটো হাউই-মতন দেখছো, ওটাতে পুরে ফেলে দিতে পারবে তো, নিজে যদি নেহাতই—আচ্ছা সে যাকগে, এখন এই বড়িটা খাও দিকিনি, কেমন পেট ভরে যায়, দেখো।'

বলে আমার মুখে কী একটা হলদে বড়ি পুরে দিলেন, সে যে কী

আশ্চর্য বড়ি আর কি বলবো। খেতেই মনে হলো, আমি লুচি মাংস চপ কাটলেট ভেটকি-ফ্রাই চিংড়িমাছের মালাইকারি রাবড়ি কেক চকোলেট ছাঁচিপান সব খাচ্ছি! একেবারে পেট ভরে গেলো। সেই বড়ির শিশিটা আমার হাতে দিয়ে মনোহরবাবু বললেন, 'এই নাও একমাসের খোরাক। একটার বেশি দুটো বড়ি কোনোদিন খেও না, খেলেই পেটের অসুখ করবে, মোটা হয়ে যাবে, যন্ত্রের ভেতর আঁটবে না। এসো, এই আরাম কেদারাটাতে বসে পড়ো দিকিনি। হাওয়ার কোনো অভাব হবে না, এমন কল করেছি ভেতরে তোমার নিশ্বাসই আবার অক্সিজেন হয়ে যাবে।'

বলে সেই লম্বা চোঙার মতো যন্ত্রটার গায়ে একটা দরজা খুলে, আমাকে একটা চমৎকার হাওয়ার গদি আঁটা-চেয়ারে বসিয়ে দিলেন আর মাথার ওপর দিয়ে একটা অদ্ভুত পোশাক পরিয়ে দিয়ে কোমরে চেয়ারের সঙ্গে বগলেস এঁটে দিলেন। মুখের জায়গাটা বোধহয় অভ্র দিয়ে তৈরি, সব দেখতে পাচ্ছিলাম। নাকের কাছে ছ্যাঁদা, নিশ্বাস নিতে পারছিলাম। তারপর দেখি, সেজমামা তাড়াতাড়ি আমার জিনিসপত্র নিজের পকেটে ভরছেন। চেঁচিয়ে বললাম, 'গুলতি দিলে না? গুলতি না দিলে যাবো না, বলেছি না।'

অভ্রের মুখোশের ভেতর থেকে কথা শোনা গেলো কিনা, জানি না। কিন্তু সেজমামার বোধ হয় একটু মন কেমন করছিলো, কাছে এসে কি যেন বলতে লাগলেন, একবর্ণ শুনতে পেলাম না, যন্ত্রের শোঁ-শোঁ গোঁ গোঁতে কান ঝালাপালা! দারুণ রেগে গিয়ে সেজমামার কাছা আঁকড়ে ধরে চেঁচাতে লাগলাম, 'দাও বলছি, গুলতি না নিয়ে আমি কোথাও যাই না।'

এদিকে মনোহরবাবু বার বার ঘড়ি দেখছেন, যন্ত্রটা কেঁপে কেঁপে দুলে দুলে উঠছে, অথচ আমি এমন করে সেজমামার কাছা আঁকড়েছি যে দরজাটা এঁটে দেওয়া যাচ্ছে না। শেষটা হঠাৎ রেগেমেগে ঠেলে সেজমামাকে সুদ্ধ ভেতরে পুরে দিয়ে মনোহরবাবু দরজা এঁটে দিলেন।

বাব্বা! দিব্যি ফাঁকা ছিলো ভেতরটা, সেজমামা ঢোকাতে একেবারে ঠাসাঠাসি হয়ে গেলো। নড়বার-চড়বার জো রইলো না। দরজা বন্ধ করাতে বাইরের শব্দ আর কানে আসছিলো না, সেজমামা চিৎকার করতে লাগলেন, 'ও মনোহর, ফেরবার কল শিখিয়ে দিলে না যে, ফিরবো কি করে?'

তা কে কার কথা শোনে। ভীষণ জোরে ফুলে উঠে বোঁ করে যন্ত্রটা

আকাশে উড়ে গেলো। একবার মনে হলো, চারদিকে চোখ-ঝলসনো আলো, তারপরেই মনে হলো ঘোর অন্ধকার।

যখন জ্ঞান ফিরে এলো, বুঝলাম চাঁদে পৌঁছে গেছি। যন্ত্রটা আর নড়ছে না চড়ছে না; কাত হয়ে পড়ে আছে, আমি বসে বসেই শুয়ে আছি, সেজমামা আমার তলায় একটু একটু নড়ছেন-চড়ছেন। মুখ তুলে কানের কাছে বললেন, 'আমার ডান পকেটে তোর টর্চটা আছে, দেখ তো নাগাল পাস কিনা?'

বুঝলাম, ওঁর নিজের হাত নাড়বার জায়গা নেই। হাতড়ে হাতড়ে ঠিক পেলাম। ভয়ে ভয়ে জ্বালালাম, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যন্ত্রের ভেতরটা ভালো করে দেখলাম, ভেতরকার কলকব্জা সব ঠিক আছে, যে যার জায়গায় আটকানো। হাত দিয়ে আমার বাঁ পাশের জীপ ফাস্‌নার খুলে মুখোস নামিয়ে ফেললাম!

অমনি এক ঝলকা ঠাণ্ডা বাতাস এসে মুখে লাগলো। আঃ, চাঁদের বাতাসই আলাদা রে, এ পৃথিবীতে সেরকমটি হয় না।

সেজমামা বললেন, 'খাসা উড়ো কল বানিয়েছে তো মনোহর। বলেই-ছিলো যে নামবার সময় এতোটুকু ঝাঁকানি লাগবে না; এতোটুকু ভাঙবে না, টসকাবে না।'

আমি এদিকে টর্চ ঘুরিয়ে দেখি, পড়বার সময় কাত হয়ে যাওয়াতে দরজার বাইরের ছিটকিনি গেছে খুলে, দরজা এখন হাঁ।

বললাম সে কথা সেজমামাকে, কিন্তু আমি না সরলে তাঁর নড়বার উপায় নেই। তখন কোমরের বগলেস খুলে সেজমামার পেটের ওপরে দুই পা রেখে এক লাফে যন্ত্র থেকে বেরিয়ে পড়া আমার কাছে কিছুই নয়। পৃথিবীতে যখন থাকতাম এরচেয়ে কতো উঁচু জায়গা থেকে লাফাতে হয়েছে। সেজমামা শুধু একটু কোঁৎ করে উঠলেন।

বেরিয়ে বুঝলাম, বোঁধ হয় চাঁদের কোনো একটা নিবে যাওয়া আগ্নেয়গিরির মুখের মধ্যে পড়ে গেছি। চারদিকে মনে হলো নরম ঘাস, মাথার ওপর তারাও দেখতে পেলাম, আবার এক কোণা দিয়ে বোধ হয় আমাদের এই পৃথিবীটাকেই একবার একটু দেখতে পেলাম! ঠিক যেন আর একটা চাঁদ। মনে হলো, আফ্রিকাটাকে যেন একটু একটু দেখতে পেলাম। তারপরেই আবার সেটা টুক করে ডুবে গেলো।

তখন কানে এলো যন্ত্রের ভেতর থেকে সেজমামা মহা চেঁচামেচি

লাগিয়েছেন, 'টর্চের আলো দেখা, আমিও নামবো।'

অনেক কষ্টে নেমে আমার পাশে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসেই বললেন, 'খিদেয় পেট জ্বলে গেলো, সেই বড়ি একটা দে-না।'

টের পেলাম, আমারও বেজায় খিদে পেয়েছে, দুজনে দুটো বড়ি খেলাম, তারপর ঘাসের ওপর শুয়ে থেকে থেকে অন্ধকারটা একটু চোখ-সওয়া হয়ে এলো। আমরা যে একটা বেশ বড়ো গর্তের মতো জায়গাতে শুয়ে আছি সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই, ঠিক যেন একটা বিরাট পেয়ালার মধ্যে রয়েছি। একটু ঘুম-ঘুম পাচ্ছিলো।

সেজমামা বললেন, 'কী রে, উঠে একটু দেখবি না?'

বললাম, 'ভোর হোক আগে।'

সেজমামা বললেন, 'আবার ভোর কী রে? এটা যদি চাঁদের উল্টো পিঠ হয়ে থাকে তাহলে তো ভোরই হবে না।'

এবারে উঠলাম। 'তাই-ই নিশ্চয় সেজমামা। এ পিঠটাতে তো সর্বদা আলো থাকে। দিনের বেলাও তাই দেখছি, রাতেও দেখেছি।'

"ফোঁস।"

তিন হাত লাফিয়ে উঠলাম! ফোঁস করলো কী? তবে কি চাঁদে হিংস্র জন্তুও আছে? বুকটা টিপটিপ করতে লাগলো। কিন্তু স্পষ্ট শুনলাম জন্তুটা কচর-মচর করে নরম ঘাসগুলোকে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

সেজমামা বললেন, 'তবে কোনো ভয় নেই। ওরা নিরামিষ খায়।'

আবার শুনলাম জোরে একটা ফোঁস ফোঁস! আমার মোটেই ভালো লাগলো না। সেজমামা কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'কী হবে রে?'

'কী আবার হবে?' এক নিমেষে গুলতিতে শট লাগিয়ে শব্দ লক্ষ্য করে দিলাম ছেড়ে। অমনি সে যে কী চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেলো, সে আর কী বলবো। একটা কেন, মনে হলো এক লাখ জানোয়ার একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে! সেই চেঁচানি শুনে চাঁদের মানুষেরা জেগে উঠে সব বড়ো বড়ো মশাল নিয়ে পেয়ালার একদিকের কানা বেয়ে নামছে, দেখলাম। কী হিংস্র সব চেহারা! কী ষণ্ডা, পৃথিবীর মানুষদের চেয়ে তিনগুণ জোরালো। আর সে কী গর্জন, কান ফেটে যায়।

আর এক মিনিট অপেক্ষা করলাম না। তারা হয়তো ঐ অন্ধকারে আমাদের দেখতে পেলো না। পড়ি-মরি প্রাণপণ ছুটে অন্য ধারের ঘাসে ঢাকা ঢালু দেওয়াল বেয়ে পিঁপড়ের মতো আমরা উঠে গেলাম। শরীরে

আর এতোটুকু ক্লান্তি বোধ করলাম না।

ওপরে উঠেই ছুট লাগালাম। আন্দাজে অন্ধকারের মধ্যে দু-পা না যেতেই চাঁদের পাহাড়ের গা বেয়ে ঝুপ করে খানিকটা পড়েই গড়াতে লাগলাম।

সব সইতে পারি বুঝলি, শুধু ঐ গড়ানিটা আমার সহ্য হয় না। তখুনি মুচ্ছো গেলাম।

আবার যখন জ্ঞান ফিরে এলো, দেখি সেজমামা আমার মুখে-চোখে ঠাণ্ডা জল ছিটোচ্ছেন। আমি নড়ে উঠতেই বললেন, 'বাপ, বেঁচে আছিস তা হলে? দাঁড়া, গাড়িটা আনি, আর এখানে নয়, চল্ একেবারে ভোরের গাড়িটা ধরা যাক।'

সেজমামা গাড়ি আনতে গেলেন, আমি একটা পাথরে ঠেসান দিয়ে বসে ভাবতে লাগলাম। আস্তে আস্তে মাথাটা খানিকটা পরিষ্কার হয়ে এলে বুঝলাম, কুণাল মিত্তিরদের টিলার নিচেই এসে পড়েছি। সেজমামা গাড়ি আনতেই বললাম, 'কী আশ্চর্য, না সেজমামা? যেখান থেকে চাঁদে গেলাম আবার ঠিক সেই একই জায়গায় এসে নামলাম।'

সেজমামা বললেন, 'আশ্চর্য বইকি। আমরা যে বেঁচে আছি সেটা আরো আশ্চর্য!'

তাই তো, যন্ত্রটা চাঁদেই পড়ে আছে। পকেট হাতড়াতে লাগলাম। সেজমামা বললেন, 'আবার কী?'

'কেন, সব লিখে রাখতে হবে না? ওখানে ঠাণ্ডা বাতাস আছে, জন্তু মানুষ সব আছে—।'

সেজমামা বললেন, 'সে আমি মনোহরকে বলে দেব'খন। আর দেখ, এসব কথা খবরদার বাড়িতে বলবি নে।'

বাবা-মা'রা আমাদের দেখে অবাক।—'এ কী, কাল গেলে আজই ফিরে এলে?'

সেজমামা বললেন, 'সেখানে মহামারী লেগেছে। আমাকে আজই ফিরে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে।' এদিকে আমি কাউকে কিছু বলতে পারছি না, পেট ফেঁপে মরি আর কি!

ছোটকাকা থামলে আমরা বললাম, 'তবে কেন বললে, একরকম বলতে গেলে চাঁদে গিছলে?' ছোটকাকা বললেন, 'তার কারণ এই ঘটনার মাস

চারেক বাদে মা হাতে করে সেজমামার একটা চিঠি নিয়ে বাবাকে বললেন, 'শোনো একবার কাণ্ড। ঐ যে আমাদের কুণাল মিত্তিরের ছেলে মনোহর না, সে নাকি এক উড়োজাহাজ বানিয়ে, যেখানে কুণাল মিত্তিরের গবেষণা-গরুগুলো চরছিলো সেখানে নামিয়ে একাকার কাণ্ড করেছে। কুণাল মিত্তির দারুণ রেগে ওকে চাকরি দিয়ে বোম্বাই পাঠিয়েছেন।'

বাবা বললেন, 'গবেষণা-গরু আবার কী জিনিস?'

মা বললেন, 'ওমা, তাও জানো না? কুণাল মিত্তির একরকম বড়ি বানিয়েছেন, তাতে সব রকম পুষ্টিকর জিনিস আছে, সে খেলেই পেট ভরে যায়। ঐ টিলার মাথায় খানিকটা জায়গাকে পুকুরের মতো করে কেটে, অবিশ্যি তাতে জল নেই, সেখানে গরুগুলো ছাড়া থাকতো, ঐ বড়ি খেতো আর মন ভালো করবার জন্য একটু একটু ঘাসও চিবোতো। বাইশ সের দুধ দিতো এক-একটা। ব্যাটা লক্ষ্মীছাড়া মনোহর সেইখানে উড়োজাহাজ নামিয়েছে। ব্যস, আর যাবে কোথা, গরুরা সব দুধ বন্ধ করে দিয়েছে। কুণাল মিত্তির রেগে টং! ছেলেকে বিদেশ পাঠিয়ে, এখন বলে নাকি ছেলের কোনো দোষ নেই, চমৎকার উড়োজাহাজ করেছে, কিন্তু পাড়ার কয়েকটা দুষ্টু লোক মিলেই নাকি ওর মাথাটা খেলো। শুনলে একবার!'

আমি আস্তে আস্তে সেখান থেকে উঠে গিয়ে গুলতিটা বের করে কাগদের মারতে লাগলাম।

'হ্যাঁরে, তোরা এখনো বসে রয়েছিস যে, আমাকে কি বইটা শেষ করতে দিবি না? এই বলে ছোটকাকা আবার পা মেলে দিয়ে বই পড়তে লাগলেন।

পেয়ারা গাছের নিচে

বুড়ো দাদু আর মনুয়া দিনভর পেয়ারা গাছতলায় বসে থাকে। শীত এসে যায়, পেয়ারা গাছের পাতা বড়ো কম, ডালের মাঝখান দিয়ে রোদ এসে ওদের গায়ে পড়ে, ডালপালার আঁকাবাঁকা ছায়া ওদের গায়ে পড়ে। সেই ছায়ার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, ওপর দিকে চেয়ে মনুয়া দেখে আকাশের নীল গায়েও ঐরকম ডালপালা সাদা রং দিয়ে আঁকা।
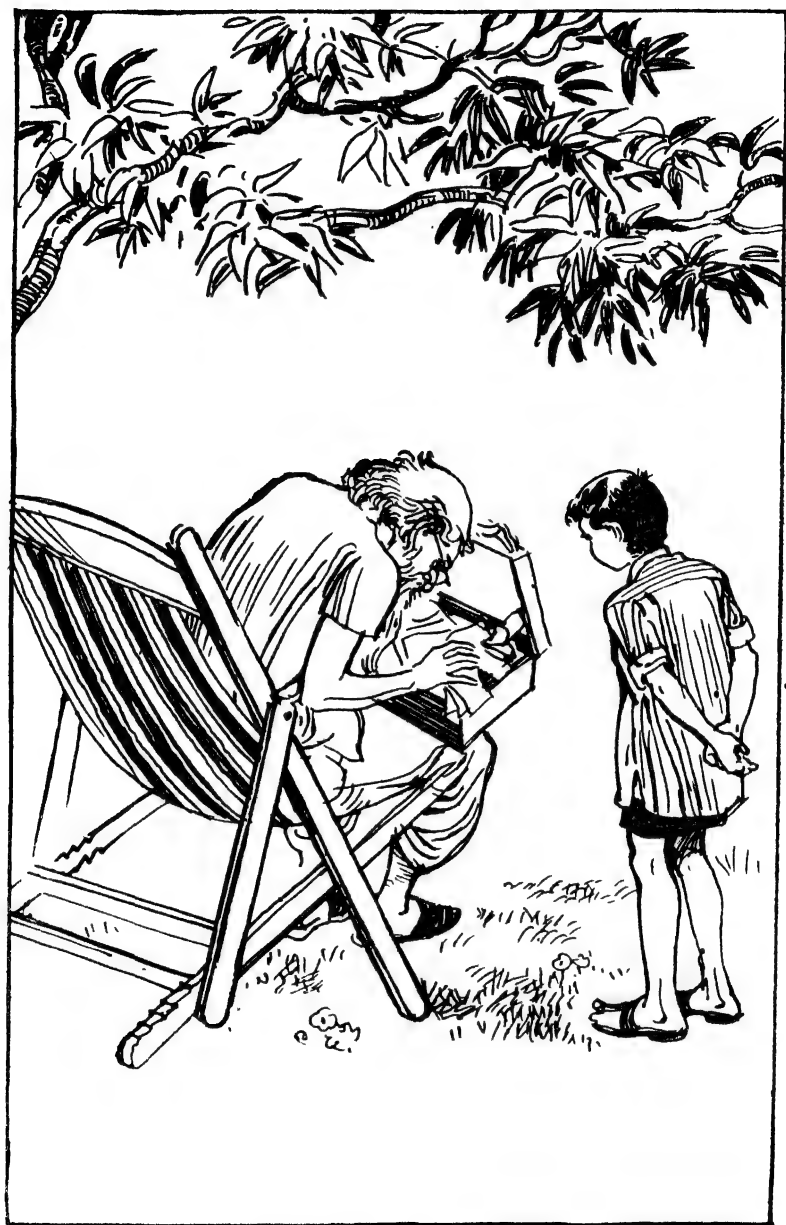
বুড়ো দাদু আরাম কেদারার তলা থেকে ছোট্ট টিনের হাতবাক্স বের করে…

মনুয়া একটা জোরে নিশ্বাস ফেলে বলে, 'বুড়ো দাদু, কাল আমার জন্মদিন, আমার বন্ধু কাঁকরের তাই নেমন্তন্ন।'

বুড়ো দাদু নীল আকাশ যেখানে নীল বনের পেছনে ডুবে গেছে সেদিকে চেয়ে বলেন, 'কাল আমারও জন্মদিন, আমার বন্ধুদেরও নেমন্তন্ন করতে হবে।'

মনুয়া বলে, 'কারা তোমার বন্ধু, বুড়ো দাদু ? তাদের চিঠি দিতে হবে না ? মা কাল কিসমিস দিয়ে পায়েস রাঁধবে।'

বুড়ো দাদু আরাম কেদারার তলা থেকে ছোট্ট টিনের হাতবাক্স বের করে, কাগজপত্র ঘেঁটে বলেন, 'কি জানি, তাদের নাম তো মনে পড়ছে না। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমি যে কোপাই নদীতে চান করতে যেতাম, তাদের না বললে যে তারা মনে দুঃখ পাবে।'

মনুয়া উঠে এসে বলে, 'দাও তো দেখি তোমার হাতবাক্স, আমি খুঁজে দেখি তাদের নাম ঠিকানা পাই কি না।'

কিন্তু বুড়ো দাদু কিছুতেই বাক্স দেবেন না। বলেন, 'নারে মনুয়া, তোর বাবাকে, নাকি তার বাবাকে কাকে যেন একবার দিয়েছিলাম, সে ঘেঁটেঘুঁটে তছ্‌নছ্‌ করে দিয়েছিলো। পরে রসিদ খুঁজে পাওয়া যায় নি। তুই বরং অন্য কোথাও খুঁজে দেখিস।'

'তা হলে মাকে ক'জনার জন্যে পায়েস রাঁধতে বলবো, বুড়ো দাদু ?'

বল্‌ গে পাঁচজনার জন্যে।—নারে, দাঁড়া দাঁড়া, যে আমার নতুন চটি কোপাইয়ের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলো তাকে বলে কাজ নেই। তার নষ্টামির আর শেষ নেই। কি জানি তোদের এসব ফুলগাছটাছ যদি ছিঁড়ে মাড়িয়ে একাকার করে। ওকে বাদ দিলেই ভালো।'

'বেশ, তা হলে বলি চারজন ?'

'না রে দাঁড়া, দাঁড়া। ঐ যার কটা চোখ, সে ভারি ঝগড়ুটি রে মনুয়া। শেষটা যদি তোর বন্ধু কাঁকরের সঙ্গে মারপিট করে ? ওকেও না বলাই ভালো।'

'তবে কি তিনজনকে বলা হবে, বুড়ো দাদু ?'

বুড়ো দাদু অবাক হয়ে বলেন, 'তিনজন আবার কোথায় পেলি মনুয়া ? গয়লাবাড়ির ওপারে যে থাকে, গয়লাদের কাছ থেকে চুরি করে সর মাখন খেয়ে খেয়ে, তার যে শরীরের আর কিছু নেই। অতো পায়েস তার সইবে কেন ? ওর নামটাও কেটে দে।'

মনুয়া বললো, 'তা হলে আমার বন্ধু কাঁকর আর কাঁকরের ছোট ভাই উদো আসবে। আর তোমার বন্ধু দু'জন তো? যাই মাকে বলে আসি গে।'

বুড়ো দাদু তাই শুনে মহা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। 'কি জ্বালা! অতো তাড়াটা তোর কিসের শুনি? ঐ দু'জনের একজনের মুখে সারাক্ষণ মন্দ কথা লেগেই আছে, সে-সব শুনে যদি তোরা শিখে ফেলিস? থাক, ওকে না বলাই ভালো।'

মনুয়া বুড়ো দাদুর কাছ ঘেঁষে এসে বলে, 'তবে কি মোটে একজনকে বলবো?'

বুড়ো দাদু, এদিকে ওদিকে বাগানের চারদিকে, দূরে পাকড়াশিদের বাঁশ ঝাড়ের দিকে আমতালির পথের দিকে চেয়ে বলেন, 'আবার একজন কোথায় পেলি রে মনুয়া? আমাকে সুদ্ধু নিয়ে বলেছিলাম পাঁচজন।'

মনুয়া বুড়ো দাদুর পায়ের কাছে বসে পড়ে বলে, 'তবে কি তোমার বন্ধুরা কেউ আসবে না?'

বুড়ো দাদু শুনে অবাক হন।

'কেউ আসবে না কিরে? ওরা ক'জনাই শুধু আসবে না, আর তো সবাই থাকবে। কাঁকর, কাঁকরের ভাই উদো, তুই, তোর মা, বাবা, কাকা, পিসি, তাদের বাবা ভুলো। ভুলোকে ভুলিস নে যেন, নেড়িকুত্তো হলে কি হবে, কি গায়ের জোর ভুলোর। ও হয় তো একটু বেশিই খাবে। কিন্তু—'

মনুয়া বুড়ো দাদুর পায়ে হাত বুলিয়ে বলে, 'কিন্তু কি বুড়ো দাদু?'

'আমি তোকে কি দেবো? দে তো দেখি আমার হাতবাক্সটা।'

বল কি চাস? গয়না চাস?

'গয়না তুমি কোথায় পাবে বুড়ো দাদু?'

'কেন? আমার ঠাকুরমার কতো গয়না ছিলো! ডাকাতের সর্দার ছিলো আমার ঠাকুমার বাবা। তার ভয়ে এ অঞ্চলে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেতো। সন্ধ্যের পর ভয়ে কেউ পথে বেরোতো না। বেরোলেই তাদের মেরে কেটে, গয়নাগাঁটি যা ছিলো কেড়েকুড়ে—ওকি মনুয়া, মুখ ঢাকছিস কেন? আচ্ছা, আচ্ছা, গয়নাগাঁটি না-ই নিলি। তাছাড়া সে সব নেইও। মোহর নিবি? থোলো থোলো সোনার মোহর? একটাও ডাকাতি করে পাওয়া নয়। রাজা ছিলো রে আমার ঠাকুরদা। ওদের বাড়িতে সবাই দুধে চান করতো, সোনার খাটে বসে রূপোর খাটে পা

রাখতো, তকমা-পরা দাস দাসীরা সোনাবাঁধানো চামর দোলাতো।'

মনুয়া বললো, 'কোথায় পেতো থোলো থোলো সোনার মোহর ওরা?'

বুড়ো দাদু হেসে বললেন, 'ওমা তাও জানিস নে বুঝি? প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা হতো যে, না দিয়ে সব যাবে কোথা। ধান কেটে, ঘর জ্বালিয়ে—'

'ও কি মনুয়া, কাঁদছিস নাকি? আচ্ছা, মোহর না-ই নিলি, সে সব হয়তো খরচও হয়ে গেছে এদ্দিনে। তুই বরং এই মোটা কাচের কাগজ চাপাটা নে।' বুড়ো দাদু মোটা কাচের কাগজ চাপা উঁচু করে তুলে ধরেন। বুড়ো দাদুর পায়ের কাছে মাদুরে শুয়ে মনুয়া সেই কাচের মধ্যে দিয়ে ঘন নীল আকাশ দেখতে পায়। কাচের ওপর রোদ পড়ে; ধার দিয়ে রামধনুর রং ছিটোয়। রামধনুর রং এসে বুড়ো দাদুর গায়ে, মনুয়ার গায়ে বেগুনি, নীল, কমলা, লাল রঙের আঁকিবুঁকি কাটে। পেয়ারা গাছের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ে। পেয়ারা গাছের আঁকাবাঁকা ডালপালার ছায়া ওদের গায়ে এসে পড়ে।

মা এসে বাটি করে ওদের জন্যে গরম দুধ, পাঁউরুটি আর নরম নরম লাল চিনি দিয়ে যান। বলেন, 'ও মনুয়া, কাল তোর জন্মদিনে কাঁকরদের নেমন্তন্ন করে আসিস।'

মনুয়া বলে, 'কাল বুড়ো দাদুরও জন্মদিন। বুড়ো দাদুও কাঁকরদের নেমন্তন্ন করবে।'

নোক্রোসি

সেজদাদু চেয়ারের উপরে পা গুটিয়ে বসে বললেন—'নেই বললেই নেই? যেই তোরা দরজা ভেজিয়ে নিচে চলে যাবি অমনি সে ম্যাও ম্যাও করতে করতে কিছুর পিছন থেকে বেরিয়ে এসে আমার পায়ে গা না ঘষে তো কি বলেছি। ভালো করে খুঁজে দ্যাখ, সে তো আর কর্পূর নয় যে উবে যাবে। বাবা! খায় কম? আমার দেড়া গেলে অথচ দেখতে তো ঐটুকু!

মিনু ফোঁচ ফোঁচ করে খানিকটা কেঁদে নিয়ে বলল—'খালি খালি পুষুমণিকে চোখ দিও না বলছি, খায় তো চাট্টিখানিক পাতকুড়ুনি, শোয়

ছাই-এর গাদায়, ও বেচারির উপরে তোমার অত রাগ কেন শুনি?'

ট্যাঙস বললে—'রাগ নয়, স্রেফ ভয়। বেড়াল দেখলে বুড়োর চুল দাড়ি খাড়া হয়ে ওঠে।'

আমাদের পুরনো চাকর ভজুদা সেজদাদুর সঙ্গে নাকি খেলা করত, সে খাটের তলাটা ঝাঁটা দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে বললে—'ভারি ভীতু, সেজদাদাবাবু।'

সেজদাদু শুনে চটে কাঁই।

'হতে পারি তোদের কাছে ভীতু, কিন্তু যে দিন নোকোসির লুকানো ঐশ্বর্য উদ্ধার করতে নেমেছিলাম সেদিন কেউ আমাকে ভীতু বলেনি। দুনিয়ারি এই দস্তুর, আজ যাকে বীরত্বের জন্যে লাটবাহাদুর সনদ্ দেয়, কাল তাকে নিয়ে নাতিনাতনিরা হাসাহাসি করে—ঈ-ঈ-ক্।'

অমনি আমরা হুড়মুড় করে তাঁকে ঘিরে ফেললাম—'কি হল? কি হল, সেজদাদু? ওরকম করছ কেন, নোকোসির ঐশ্বর্যের কথা বলবে না?'

মিনু নাকি-সুরে বললে—'সব চালাকি। বেড়াল নেই, কিচ্ছু নেই, শুধু গল্প না বলার ফন্দি!'

সেজদাদু ঢোক গিলে চেয়ারের হাতলে চড়ে বসে বললেন—'বেড়াল নেই তো কে আমার কনুইএ সুড়সুড়ি দিল?'

ট্যাঙস বললে—'আমি গো, আমি। ইচ্ছে করে দিইনি, ভালো করে গল্প শুনব বলে এগিয়ে যেতে গিয়ে, ঐখেনে মুণ্ডুটা একটু ঘষে গিয়েছিল।'

ঠিক এমনি সময় ম্যাও!—বলে এক বিকট চিৎকার করে হলদে বিদ্যুতের ঝলকের মতো পুষুমণি বই-এর আলমারির মাথা থেকে এক লাফে নেমেই দে ছুট।

শোঁ-ও-ও করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, চোখের পলক না ফেলতে একতলার উঠোনে ভজুদার বৌ যেখানে মাছ কুটতে বসছে, সেখানে গিয়ে উপস্থিত। ওখান থেকে যে সহজে নড়বে না সেটা জানা কথা।

দরজা ভেজিয়ে সেজদাদুকে ঘিরে বসা হল—'বল শিগ্গির, নইলে আবার ডেকে আনব।' সেজদাদু এবটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন—'ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে পুরনো কমিনোর আপিসে গেছিস্ কখনো? আশ্চর্য সে জায়গা, মিনে করা মেজে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি গালিচে পাতা, একতলা থেকে তিনতলা অবধি পেতলের থাম, তার মাথায় লাল রঙ ছাই রঙ সোনালি রঙ দিয়ে সে যে কি চমৎকার নকসা করা। থামের গায়ে চূণকাম করা বটে কিন্তু হঠাৎ যদি আচমকা কেউ একটা কাগজ চাপা দিয়ে ঠুং করে মারে অমনি মেঝে থেকে ছাদ অবধি ঝনঝন করে বেজে ওঠে। ওটা ছিল এককালে সিরাজউদ্দৌলার নাচঘর। একদিকের দেয়ালে সারি সারি প্রকাণ্ড আয়না ঝুলছে, এককালে সে আয়নাতে নবাব বেগম সাহেব বিবিদের ছায়া পড়ত।'

এই অবধি বলে গল্প থামিয়ে সেজদাদু কেমন যেন শিউরে উঠলেন। আমরা ব্যস্ত হয়ে খাটের তলায়, বই-এর আলমারির কোণায় দেখে নিলাম, কোথাও কিচ্ছু নেই।

ট্যাঙস বললে—'সবটাতে তোমার ইয়ে, বেড়াল নেই তো আবার ভয় টয় কিসের?'

সেজদাদু বললেন—'ভয়? না ঠিক ভয় নয়, তবে পাঁচটার পর আর ঐ হল ঘরটাতে কেউ থাকতে চাইত না। কোনো রকমে কাজকর্ম শেষ করে, গাছের ছায়া লম্বা হয়ে আসবার আগেই সবাই কাগজপত্র গুটিয়ে রেখে কেটে পড়ত। সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটিও কেমন অন্য রকম হয়ে যেত। বাইরের রাস্তার হাজার গাড়ির ঘড়ঘড়ানি আর শোনা যেত না।'

'হলঘরের পিছনে কাঠের সিঁড়ি, সেকালের মেহগিনি কাঠ, পেকে একেবারে লোহার মতো শক্ত হয়ে উঠেছে, তার গায়ে একটি পেরেক ঠোকা দায়। পুজোর ছুটিতে সবাই মিলে দল বেঁধে ঝাড়গ্রাম যাওয়া হবে। পানু—আমার ভাগ্নে পানুকে জানিস তো; সেখানে এখন থেকেই মুর্গি জমা করছে, অথচ কাজ শেষ করে দিতে না পারলে আমার যাবার যো নেই। আমাদের বড় সাহেব তো মানুষ ছিল না, স্রেফ একটি কালো চিতা-বাঘ, তেমনি নিঃশব্দ, তেমনি হাল্কা, তেমনি কালো, তেমনি গনগনে হলুদ চোখ। উঃফ্। নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়ালে গলায় যেই একটু গরম নিঃশ্বাস পড়েছে আর অমনি আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়েছে। 'ট্যাঙস বললে—আহা, আমার তো একটা ম্যাও শুনলেই হাতে পায়ে খিল ধরে।' সেজ-দাদু চটে মটে উঠে যান আর কি? সবাই মিলে গাঁট্টা মেরে ট্যাঙসকে থামানো হল। সেজদাদু বললেন—'তাই রোজই একটু করে দেরি হয়ে যেতে লাগল। সবাই চলে যায়, আমি একে সাধি ওকে সাধি, পান খাওয়াই, পকেটে করে ভেজিটেবল চপ নিয়ে যাই, একটু যদি কেউ থেকে যায়। এমনিতেই আলো জ্বালাবার পর থেকেই গা ছমছম করতে থাকে; এতটুকু শব্দ হতেই ঘরময় প্রতিধ্বনি ওঠে, সে যে কি বিশ্রী ব্যাপার সে তোরা ভাবতে পারিস নে।'

'বড় সাহেবের পেয়ারের কেরানি নোকোসি কোন দিশী লোক তা কেউ জানে না। গায়ের রঙ তামাটে, হলুদ বাঁকা চোখ, খাঁদা নাক, পাতলা গরগরে শরীর, সাদা খাটো সার্ট পেন্টলুন আর সাদা ক্যাম্বিসের জুতো পরে আর অষ্ট-প্রহর ফস্ ফস্ করে বড় সাহেবের ঘরে গিয়ে কান ভাঙানি দেয়। কবে টিপিনের সময় কে কি বলেছে, কে কোথায় কি গোঁজামিল দিয়েছে, সব গিয়ে লাগাব। ফলে এর ছুটি কাটা যায়, ওর প্রমোশন বন্ধ হয়। বুঝতেই তো পাচ্ছিস আপিসসুদ্ধ লোক ওর উপর কি রকম হাড়ে চটা ছিল। আমি বেশি ঘাঁটাতাম না, গড় গড় ইংরিজি বলত, কিন্তু পান খেতে খুব ভালোবাসত। মাঝে মাঝে বড় এক খিলি পান ওর হাতে গুঁজে দিয়ে খুশি রাখবার চেষ্টা করতাম ছুটিছাটার ব্যাপারে ওর যেরকম প্রতাপ।'

'তা ঐ যা বলছিলাম মহালয়ার আগের দিন অবধি ফাইলের গন্ধমাদন নিয়ে পড়েছিলাম, সেদিন যত রাত্তির হক আর যা থাকে কপালে বলে তাল ঠুকে লেগে গেলাম। কোনো দিকে হুঁস নেই, কাজ শেষ করতে রাত দশটা। চৌকিদারকে বলা আছে, সেওকি সহজে ভিতরে আসে, ঠায় বাইরে বসে রইল, আমি বেরুলে বাইরে থেকে তালা দেবে। থামের পিছনে নির্জন

কোণে নিজের জায়গাটিতে কাজ সেরে যেই না উঠে দাঁড়িয়ে গা মোড়ামুড়ি দিতে যাচ্ছি, সামনে তাকিয়ে গায়ের রক্ত হিম। দোতলার উঁচু গ্যালারির কাঠের সিঁড়ি দিয়ে মিশ-কালো কি একটা নেমে আসছে।'

'কি আর বলব তোদের, আঁৎকে উঠে নিজের জিভটাই আরেকটু হলে গিলে ফেলছিলাম। কান বোঁ বোঁ, মাথা ঘোরা, চোখে অন্ধকার দেখা কিছু আর বাকি রইল না। মিশ-কালো চাপা গলায় এক ধমক দিয়ে বলল ওকি হচ্ছে চ্যাটার্জি, পা ল্যাগব্যাগ করছ কেন? এত রাত্রে এখানে কি হচ্ছেটা শুনি?'

'জ্যান্ত মানুষের গলা শুনে ধড়ে আমার প্রাণ ফিরে এল। বললাম, এই এতক্ষণে কাজ শেষ হল, কাল থেকে তেরো দিনের ছুটি শুরু, বাহবা কি মজা। কিন্তু তুমি এত রাত্তিরে কি মনে করে?'

বুঝতেই পাচ্ছিস ততক্ষণে তাকে আমার চিনতে বাকি নেই। সে নোকোসি। নোকোসি কাঠের সিঁড়ির একটা ধুলো ভরা ধাপে বসে পড়ে বললে—আমার সর্বনাশ হতে চলেছে।'

সে এমনি একটা হতাশকণ্ঠে বলল আর চারদিক থেকে তার ফিস ফিস কথার এমনি একটা খসখস মরমর প্রতিধ্বনি উঠতে লাগল যে আমি ভয়ে কাঠ। নোকোসি বললে, বোস চ্যাটার্জি, আমার পাশে এইখানটিতে বস। সত্যি কথা বল, কখনো কি তোমার মনে হয় নি যে আমার মতো একটা লোক তোমাদের মতো সাধারণ লোকদের সঙ্গে এত মাখা-মাখি করি কেন, এই রকম একটা বাজে আপিসের থার্ড ক্লাস বড় সাহেবের দিন রাত খোসামুদি করি কেন?'

বললাম—'সে আশ্চর্যটা কি, মাইনে বাড়াবার জন্যেই ওরকম কর।'

'সেই অন্ধকার ভুতুড়ে ঘরে নোকোসি চাপা গলায় অট্টহাস্য করে উঠল আর চারদিকের অন্ধকার থেকে তার যে বিকট প্রতিধ্বনি উঠতে লাগল সে না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। আমি নিজের অজান্তে ওর কাছ থেকে খানিকটা সরে বসলাম।'

'নোকোসি বজ্রমুর্তিতে আমার হাতের কব্জি ধরে বলল, আজ ভগবান তোমাকে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন আজ আর তোমাকে ছাড়া নয়। কি বলব তোদের হাত-পা আমার পেটের ভেতর সিঁদিয়ে গেল; এর চেয়ে ভূত দেখা দিলে আর কি খারাপ হত? এখুনি হয়ত কোমরবন্ধ থেকে সরু লিকলিকে ছোরা বেরুবে।'

'কিন্তু নোকোসি হঠাৎ আমার হাত ছেড়ে দিয়ে, পকেট থেকে ময়লা একটা কাগজের টুকরো বের করে আমাকে বললে, এই দলিলটা কোথায় বল।'

'দেখলাম তাতে দলিলের নম্বর লেখা রয়েছে এ ৫৫৭/কিউ ১১/সি ডি ৩। বললাম, এ তো খুব শক্ত নয়, ও তো এ সেক্সনের ৫৫৭ সংখ্যার সন্দেহ-জনক বিষয় সংক্রান্ত এগারো নম্বরের কনফিডেন্সেল ডকুমেন্ট তিন নম্বর। আজ কদিন ধরে তো ঐ সেক্সনেরি নম্বর মিলিয়ে আজ এইমাত্র শেষ করলাম। চল, উঠি। চৌকিদার তালা দেবার জন্য অপেক্ষা করছে।'

'নোকোসিকে সাবধান করে দেবার জন্যেই শেষ কথাগুলো বললাম। চৌকিদার অপেক্ষা করছে না হাতি। ছাপর খাটে শুয়ে ঠেসে ঘুম লাগাচ্ছে, ঠ্যাং ধরে না ঝাঁকালে জাগবে না। নোকোসির চোখ দু-টো অস্বাভাবিক রকমের জ্বলজ্বল করে উঠল। পকেট থেকে ভোঁতা একটা রিভলভার বের করে বলল—। 'ওকি ট্যাঙস, পড়ে গেলি যে?'

ট্যাঙস উঠে বলল—'কেমন গা শিরশির কচ্ছিল বলে হাত ফসকে গেল।'

'থামছ কেন, নাও নাও, বল; এই কি থামবার সময় নাকি?' সেজদাদু বলতে লাগলেন—

'দাঁতে দাঁত চেপে নোকোসি বললে, এতে সাইলেন্সার লাগান আছে, একবার ঘোড়া টিপলে বাছাধনকে আর ভাবতে হবে না। একেবারে সঙ্গে সঙ্গে ভবলীলা সাঙ্গ, টু শব্দটি হবে না। শোন, ওই দলিল আমার চাই, আমি এইজন্যেই এত রাত অবধি অপেক্ষা করে আছি, বাড়িতে গিন্নি মাংস ভাত রেঁধে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন, আর মেজাজ খারাপ করছেন, তবু বসে আছি। তার একমাত্র কারণ আমি বড়সাহেবের কাছ থেকে শুনেছি, তুমি এই সেক্সনে কাজ করবে অনেক রাত অবধি, চাবি তোমার কাছে থাকবে আন্দাজ করলাম। ইচ্ছে করলে এক্ষুণি এক থাপ্পড়ে চাবি কেড়ে নিতে পারি, কিন্তু চাবি পেলেও দলিল খুঁজে বের করা আমার কর্ম্ম নয়। ভালোয় ভালোয় দেবে কিনা, বল!'

'বলে নোকোসি খপ করে আমার ঘাড় চেপে ধরল। ঠিক ওইখানেই আমার বাতের ব্যথা, বেজায় লাগল। দারুণ রেগে হাত ঝেড়ে ফেলে বললাম, যদি না দিই, আমাকে গুলি করে মেরে ফেলবে এই তো? তা মার না গুলি, আমি ভয় পাই না!'

'তাই শুনে নোকোসি একেবারে কাঁদো কাঁদো হয়ে আমার পা ধরে বলল, আমাকে ক্ষমা কর ভাই, মনের দুঃখে কাকে কি বলেছি, ঠিক নেই। তোমাকে কি আমি মারতে পারি, তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, তাছাড়া ওটা খেলবার বন্দুক, মারলেও তোমার কিছু হবে না, কিন্তু দলিলটা না পেলে আমাদের সর্বনাশ হবে।'

বললাম—'কেন?'

'নোকোসি বললে, সে আর বল না ভাই, ওতে আমার পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত ধনরত্নের গুপ্তস্থানের রহস্য সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা রয়েছে। নেবও না আমি, শুধু খানিকটা টুকে নেব। এতে তোমার কি আপত্তি থাকতে পারে, ভাই! বাড়িতে মা-বৌ খেতে পাচ্ছে না, ছেলেটার মুখে ওষুধ দিতে পাচ্ছিনা—'

বললাম—'এই না বললে, মাংস-ভাত রেঁধে বসে বসে রাগ-মাগ' কচ্ছেন?'

'সব ধাপ্পা রে ভাই, দুঃখে-কষ্টে কি আর আমার মাথার কিছু ঠিক আছে? এককালে এই বাড়িতেই আমার পূর্বপুরুষরা নেমন্তন্ন খেতে আসতেন, এই ঘরে নাচতেন, এই আয়নায় তাঁদের ছায়া পড়ত, এখনও যেন মাঝে মাঝে দেখতে পাই—ও কি, উঠছ যে, সত্যি দেবে নাকি?'

'একগাল হেসে তড়াক করে নোকোসি লাফিয়ে উঠল। বুঝলি কিনা, ভয়কে আমি কেয়ার করি না। কিন্তু মানুষের দুঃখ কষ্ট সইতে পারি না। একটু টুকে নেবে বইতো নয়।'

'চাবি হাতে সটাং গেলাম ফাইলের তাকের পিছনে লোহার সিন্দুকের কাছে! পায়ে পায়ে নোকোসিও চলেছে, কানের উপর তার গরম নিঃশ্বাস পড়ছে, তার বুকের ধড়াস ধড়াস শুনতে পাচ্ছি, অবিশ্যি সেটা আমার বুকেরো হতে পারে।'

'অন্ধকার নির্জন জায়গাটা, অন্ধকার আলমারির মাঝের গলি। এইতো সেই লকার। এরি মধ্যে না—চাবি সুদ্ধ হাত তুলেছি, এমনি সময় আলমারির মাথায় দু-টো গন্‌গনে চোখ জ্বলে উঠল! আর কি আমার জ্ঞান থাকে, এই বুঝি ম্যাও বলে লাফ দিল! বিকট একটা আকাশ ফাটানো চিৎকার দিয়েই একেবারে হাত পা ছুঁড়ে মুচ্ছো!'

'সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে তাল তাল ফাইল পড়ল। চৌকিদাররা চার পাঁচ জন খইনি খাচ্ছিল, মোটা মোটা লাঠি টর্চ নিয়ে তারা ছুটে এসে নোকোসিকে পাকড়াও করল।'

সেজ দাদু থামলেন। ট্যাঙস বলল—'আঃ! বলনা তারপর কি হল।'

'তারপর আবার কি হবে? নোকোসির চাকরি গেল।'

'বাঃ, জেলে গেল না?'

'জেলে যাবে কেন। কিছু তো নেয় নি বেচারি। আমিও বুদ্ধি করে চেপে গেলাম। বড়সাহেব বললেন অসাধারণ সাহস দেখিয়ে লকার রক্ষা করেছি। নোকোসির পকেটে নাকি কোন বড় মামলার সাক্ষী দলিলের নম্বর টোকা ছিল। আর চৌকিদার বলল—বজ্জাৎ বিল্লি এইখানে লুকিয়েছিল আর আমি খুঁজে খুঁজে হয়রাণ!'

একটু চুপ করে থেকে সেজদাদু বললেন—'সেই আমাকে তোরা আজ কাল ভীতু বলিস—ঈ-ঈ-ক্! ও ট্যাঙস, ও ভেদা, ও ন্যাড়া আমার পায়ে কি ঘষে গেল রে নরম গরম।'

এই বলে সেজদাদু চেয়ারের উপরে পা তুলে নিলেন।

ট্যাঙস তবু বললে—'ওসব রাখো এখন। বল শিগ্‌গির লাটসাহেব তোমাকে কবে সনদ দিল!'

সেজদাদু এক চোখ খাটের নিচে আর এক চোখ আলমারির মাথায় রেখে বললেন—'আহা, আমাকেই দিয়েছিল তো আর বলি নি, তবে ওরকম একটা দুঃসাহসিক কীর্তির পর সনদ দিলেও কিছু আশ্চর্য হবার ছিল না—দরজার পেছনে ওটা কিসের ল্যাজ না?'

গুণুপণ্ডিতের গুণপনা

আমার পিসিমা ভীষণ ভাল হলেও বেজায় ভীতু। সব জিনিসে তাঁর ভয়। যেখানে যা আছে তাতো ভয় আছেই, আবার অনেক জিনিস নেই তাকেও ভয়। বড়দিনের ছুটিতে একবার গেছি তাঁর বাড়িতে। মফঃস্বল শহর। খাবার-দাবারের ভারি সুবিধা। হপ্তায়, হপ্তায় ধোপা আসে,

কুড়ি টাকা মাইনেতে এক্সপার্ট চাকর পাওয়া যায়। বাড়ির সামনে এবং পিছনে নিজেদের বাগান, দু'পাশে পাশের বাড়িগুলোর বাগান; সামনে ডাক্তারের বাড়ি। মোড়ের মাথায় সিনেমা। খেলার মাঠে প্রতি বছর এই সময় গ্রেট সরোজিনী সার্কাসের তাঁবু। তাছাড়া ওখানকার প্যাঁড়া আর ক্ষীরের পান্তয়া বিখ্যাত। আর এন্তার মুর্গি পাওয়া যায়। এমন জায়গা ঝপ্ করে বড় একটা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার আগেই ট্রেন থেকে নেমেছি। শির্‌শির করে গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে হাওয়া বইছে। ঠং ঠং করে কোথায় একটা কাঠঠোকরা গাছ ঠোকরাচ্ছে। লোকের বাড়িতে উনুনের আঁচ পড়ছে। পিসিমার গেটের ওপরে থোকা থোকা ফুল ফুটেছে। সেদিন রাত্রে যখন বড় খাটের পাশে আমার ছোট নেওয়ারের খাটে লেপ মুড়ি দিয়ে শুলাম, তখন খালি মনে হচ্ছিল দশ দিনের বদলে যদি একশো দিন থাকতাম কি মজাটাই না হোত।

কিন্তু সেকেলের কোন এক ঋষি যে কথা ভূর্জপাতার খাতায় খাগের কলমে লিখে গেছেন যে এ পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বলে কিছু হয় না, সেটা ঠিক। পরদিন ভোরে পিসিমার সঙ্গে নিচে নেমেছি। পিছনের বারান্দার জালের দরজার ছিটকিনি খুলে গয়লানীর কাছে আমার জন্যে বেশি করে দুধ নেওয়া হচ্ছে, এমন সময় গয়লানী বললে, 'তালার ব্যবস্থা করুন মা। জালের ফোকর দিয়ে হাত গলিয়ে এ দরজাটা খুলে ফেলতে দুষ্ট লোকের কতটুকু সময় লাগবে।'

পিসিমা বললেন—'কি যে বলিস বাতাসি, শুনলেও হাত-পা কাঁপে।' বাতাসি বললে—'না, বালানগড়ের জেলখানা থেকে গুণুপণ্ডিত পালিয়েছে কিনা তাই বলছিলাম।'

গুণুপণ্ডিতের নাম শুনেই পিসিমার বুক কেঁপে উঠলো তবু জোর করে হেসে বললেন—'হ্যাঁ, তুই ও যেমন, কি আর এমন সোনাদানা আছে আমার ঘরে যে জেলভাঙ্গা ডাকাত ধরা পড়বার ভয় ভুলে, আমার বারান্দার ছিটকিনি নামাবে?'

দুধের ক্যানাস্তারা নামিয়ে সিঁড়ির উপর বসে পড়ল বাতাসি। আমার দিকে তাকিয়ে এতটা গলা নামিয়ে যাতে স্পষ্ট আমি শুনতে পাই, বললে—'আহা সোনাদানা নয়, ওনাদের দল আছে, তারা ছেলেধরা করে নিয়ে যায়। তারপর বেনামি চিঠি দেয় সুঁদরিবনের কালী-মন্দিরের পেছনে

বটতলাতে হাজার টাকা পুঁতে এসো তবে ভাইপো ফিরিয়ে দেব। না দিলে—' এই বলে বাতাসি এমনভাবে চুপ করল যে পিসিমা কেন, আমারি গা শিউরে উঠল।

বারান্দার কোণায় কাঠের টেবিলে বড় স্টোভে পিসিমার বুড়ো চাকর হরিন্দম চায়ের জল ফুটোচ্ছিল, সে এবারে বেরিয়ে এসে বললে—'আর ভয় দেখাবার জায়গা পাসনি বাতাসি? ও ছেলেকে কেউ নিয়ে গেলে ফেরৎ দেবার জন্য পয়সা চাইবে না, বরং পয়সা দিয়ে ফেরৎ দেবে।'

বাবা বলেন, 'হরিন্দম বলে নাম হয়না অরিন্দম হবে।' মনে হতেই বললাম কথাটা। শুনে হরিন্দমের কি রাগ! বললে—'হ্যাঁ, আমার বাবা নাম রাখল হরিন্দম আর ওনার বাবা তার চেয়ে বেশি জানেন! তাও যদি তাকে দাদামশায়ের কাছে কানমলা খেতে না দেখতাম!'

পিসিমা রেগে গেলেন—'ওসব কি শেখাচ্ছ বাপকে অশ্রদ্ধা করতে, হরিন্দম?'

হরিন্দম বললে—'হরি মানে ভগবান, তা ভগবানের নাম এনাদের সব আজকাল ভাল লাগবে কেন? অরিন্দম আবার একটা নাম হল?'

বাতাসি হেসে দুধের ক্যানেস্তারা নিয়ে উঠে পড়ল। যাবার আগে বলল—'দুধ নেবার সময় দারোগাবাবুর মা বললেন, 'গুনুপণ্ডিত এদিক-কার ছেলে নয়, কড়িগাছায় ওদের সাত পুরুষের বাস। সেখানেই পুলিস আগে যাবে গো মা, কাজেই সেদিকে না গিয়ে আগে এদিকেই তার আসা। পরে গোলমাল চুকে গেলে পর এই তিন কোশ পথ পেরিয়ে গুটি গুটি হয়তো মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাবে। এ আমার দারোগাবাবুর মা-র মুখ থেকে শোনা মা, তাই বলে গেলাম।'

বাতাসি গেলে পর রুটি টোস্ট, ডিমভাজা, চিনি দিয়ে কালকের দুধের সর, এই সব আমাকে দিতে দিতে হরিন্দম আমাকে বললে—'বাতাসির যেমন কথা! তালা-চাবিতে গুনুপণ্ডিতের কি করবে! মস্ত বড় পণ্ডিত সে, নানা রকম মন্ত্র জানে, কি একটু পড়ে দেবে, তালা আপনা থেকে খুলে যাবে।'

পিসিমা চটে গিয়ে বললেন—'পণ্ডিত না আরও কিছু, ঠ্যাঙগাড়ে গুণ্ডা বল।'

ঠিক এই সময় পিসেমশাইও নেমে এসে চায়ের টেবিলে বসে বললেন—

এ আমার দারোগাবাবুর মা-র মুখ থেকে শোনা

'কে ঠ্যাঙ্গাড়ে গুন্ডা ?'

পিসিমা তাকে খাবার দিতে দিতে বললেন—'গুণুপণ্ডিত নাকি কয়েদ ভেঙ্গে ফেরারী হয়েছে। বাতাসি বলছিল এমুখো হবার সম্ভাবনা, দারোগার মা নাকি বলেছে।'

ডিম খেলে পিসেমশাইর হেঁচকি ওঠে, তাই সকালে পাঁউরুটি সাদা মাখন দিয়ে জেলি দিয়ে খান। তাতে এই বড় একটা কামড় দিয়ে বললেন—'একেবারে বাঘা ডাকাত ঐ গুণুপণ্ডিত, বুঝলি গুম্নি। প্রাণে এতটুকু ভয়ডর নেই, যা করবে ঠিক করেছে তা করবেই, মেরে-ধরে ঠেঙ্গিয়ে, বোকা বানিয়ে যেমন করে হোক। ভাবতে পারিস সরকারী গুদোম থেকে পাঁচ হাজার মণ ধান একসারি গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে কেটে পড়ল। বলল নাকি দিল্লী থেকে হুকুম হয়েছে গাঁয়ে গাঁয়ে বিলি হবে। সাতদিন বাদে খোঁজ হলো। তাও ধরা পড়ত না, শুধু চৌকিদারটাকে দেরি করে তালা খোলার জন্যে টেনে এক চড় কষিয়েছিল, সেই রেগে মেগে ধরিয়ে দিলে। একটা মুখোস পর্যন্ত পরে আসেনি এমনি সাহস।'

পিসিমা চায়ের পেয়ালায় ছোট একটা চুমুক দিয়ে বললেন—'বাঃ তুমি দেখছি গুণুপণ্ডিতের ভারি ভক্ত হয়ে উঠেছ। তার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ।'

সামনের বাড়ি থেকে ডাক্তারবাবুর ভাই শৈলবাবু মাঝে মাঝে গল্প করতে আসেন। তিনি নাকি ছোটবেলায় একবার খুব বাতে ভুগেছিলেন বলে কাজকর্ম সে-রকম করতে পারেন না, পিসিমা বলেন। শৈলবাবু বললেন—'সাংঘাতিক লোকটা, একটা কিছু করার ঠিক করলে কেউ ঠেকাতে পারে না। সে নাকি অনেক রকম ভেল্কি জানে। কার যেন বন্ধ সিন্দুক থেকে হীরের আংটি বের করে নিয়েছিল সিন্দুক না খুলেই। খুব সাবধানে থাকবেন বৌদি।'

মাছ বিক্রি করতে ঘনশ্যাম এল। সেও বললে—'বাবা! সাবধানের মার নেই, ছেলেপুলে নিয়ে রয়েছেন মা!' পিসিমা বিরক্ত হয়ে বললেন—'পুলিস দারোগা ডিটেক্‌টিভ সবাই লেগেছে, আজ সন্ধ্যের আগেই তাকে ধরে ফেলবে দেখিস। কেন মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছিস বল দিকিনি?'

ঘনশ্যাম বললে—'ধরা কি অতই সহজ মা? থানে থানে নাকি তার আস্তানা আছে। এক এক জায়গায় এক এক নাম, এক এক চেহারা।

তুড়ি মারতেই ভোল বদলে ফেলে, এই একরকম দেখছেন, এই দেখবেন অন্যরূপ! লোকে বলে এমনিতে হয় না, তুক করে।'

বেলা যতই বাড়তে থাকে সবার মুখে ঐ এক কথাই ফেরে—'গুণুপণ্ডিত জেল ভেঙেছে। সে নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে সেই চৌকিদারের ধড় আর মাথা এক জায়গায় থাকতে দেবে না।' মজা হয়েছে যে চৌকিদারটাও চাকরি ছেড়ে কোথায় গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে কেউ জানে না। সবাই বলছে তাকে খুঁজে বের না করে নাকি গুণুপণ্ডিত ছাড়বে না। এদিকেই নাকি সব জায়গায় আঁতিপাঁতি করে খুঁজবে। তাছাড়া সরেজমিনে বমাল সমেত ধরা পড়েছিল, গুণুপণ্ডিতের আপাততঃ কিছু রোজগারপাতির দরকার পড়েছে। কাজেই সবাই সবাইকে সাবধান করে দিতে লাগল।

মাঝখান থেকে আমার ছুটিটাই না মাটি হয়। পিসিমা ঘনশ্যামকে সঙ্গে করে একটু পরেই দারোগা-গিন্নির কাছে খবর সংগ্রহ করতে গেলেন। ফিরলেন সেই বেলা এগারটার পর। তখন আর আমার মাছের চপের সময় রইল না, এমনি ঝোল খেতে হল। পিসিমা দুটো বড় বড় মাছ ভাজাও আমার পাতে দিয়ে বললেন—'একা একা মোটে বেরুবে না, কেমন বাবা? সাংঘাতিক দুর্ধর্ষ ডাকাত, দু-একটা ছোট ছেলেকে নিখোঁজ করে দেওয়া ওর কাছে কিছুই নয়।'

শুনে আমার হয়ে গেছে, কবে থেকে কত আশা করে আছি। বললাম—'তবে কি ঘোষদের পুরনো পুকুরে মাছ ধরতে যাব না?' পিসিমা ভয়ে চিৎকার করে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—'ও বাবা! ও কথা মুখে আনিস নে, তোকে ডুবিয়ে দিয়ে কাদার মধ্যে ছিপ পুঁতে ফেলতে কতক্ষণ! কথা দে, পুকুরে যাবিনে। বিকেলে মাংসের সিঙাড়া করব।'

'ছাপাখানার বটকেষ্টবাবু তাঁর এক গেরুয়া পরা গুরু ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এলেন দুপুরে খাওয়ার আগে। পিসেমশাইয়ের সঙ্গে তার বেজায় ভাব, তাঁদের দেখে পিসেমশাই লাফিয়ে উঠে বললেন—'বাঃ বটকেষ্ট করমবাবা তো আমারো গুরু, ইনি তাহলে আমারো গুরু ভাই।'

বটকেষ্টবাবু ভারি চিন্তিত মুখ করে বললেন—'সেইজন্যই তো বনমালী ভাইজীবনকে তোমার কাছে আনলাম ঘেঁটু, গুরুদেবের কাজ করে বেড়ায়, যেমন যেমন জোটে তাই খেয়ে শরীরের কি হাল হয়েছে দেখছ? তাই

গুরুদেব চিঠি দিয়ে শরীর সারাবার জন্যে ওকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। পোড়াকপাইল্যা এদিকে আমার বাড়ি থেকে জানোই তো দশদিনের আগে তোমার বৌদির বোনেরা নড়বে না।'

আর বলতে হল না। আমার সামনেই গেরুয়া পরা ভদ্রলোকের এ বাড়িতে থাকার সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। দোতলার ভাল ঘরটা তাঁর জন্য ছেড়ে দেওয়া হল। পিসিমা আর আমি নিচে নেমে এলাম। তবে একটা সুবিধেও হয়ে গেল, ভদ্রলোকের নাকি দুধ, ঘি, মুর্গি, ছানা, ডিম এই সব পথ্যি। তারমানেই পিসিমা আমাকে সমান ভাগ দেবেন।

বটকেষ্টবাবু উঠে পড়ে বললেন—'ইয়ে, কি বলে, ঘেঁটু, বনমালী ভাইজীবন আবার একটু নার্ভাস প্রকৃতির, দরজাটরজাগুলো তোমাদের যেন বড় লটখটে মনে হয়, একটু ভেতর থেকে তালার বন্দোবস্ত করে নিলে ভালো হয়—'

আমি বললাম—'ঘনশ্যাম বলেছে তালার কম্ম নয়, সে তুক করে তালা খোলে।'

শুনে বনমালী ভাইজীবন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন—'তুক-তাকে যোগ দেবার যে আমার গুরুদেবের বারণ আছে।'

বটকেষ্টবাবু হেসে উঠলেন—'আহা, তুমিও যেমন, ওসব মুখ্যুদের বাড়ান কথা। তুক না আরও কিছু, গুদোমের তালা সে কি চৌকিদারকে দিয়ে খোলায়নি বলতে চাও? সাবধানে থেকো সবাই; তবে হয়তো দেখবে কালকের মধ্যেই ধরা পড়ে গেছে। এখানে কোন ভয় নেই।'

বনমালীবাবু ভয়ে ভয়ে উঠে পড়ে বললেন—'মানে, ভয় পাই না ঠিক, তবে আমার ছোটবেলা থেকে বুক ধরফড়ের ব্যারাম আছে কিনা।' তাঁকে অনেক আশ্বাস দিয়ে বটকেষ্টবাবু গেলেন। ঠিক হয়ে গেল বনমালীবাবু আর সিঁড়িটিড়ি ভাঙবেন না, খাবার-দাবার স্নানের জল সব দোতলায় পৌঁছে দেওয়া হবে। বাবা! তাঁর ভয় দেখে বাঁচি না, পিসিমাকেও হার মানিয়েছেন!

দুপুরের খাওয়াটা ঠিক সেরকম জমল না। পিসিমারা ওঁকে নিয়েই ব্যস্ত তা আমাকে দেখবেন কি! আর হরিন্দম বললে নাকি বেশি মাছের বড়া খেলে পেট কামড়ায়। এদিকে শীতের দুপুরে চারদিক অন্ধকার করে বেশ মেঘ জমেছে, কন্‌কনে হাওয়া বইছে। এমন দিনে কি ঘরে বসে

থাকা যায় কখনো ? ওদিকে পুরনো পুকুরে মাছ ধরতে পিসিমার বারণ। অবিশ্যি স্টেশনের নতুন পুকুরের কথা তো কিছু বলেন নি। দুপুরে সবাই ঘুমুলে যেন আরো অন্ধকার করে এল, সেই সময় মাছরা সব ঘাঁই মারে। ছিপটা নিয়ে গুটি গুটি পিছনের বারান্দার তারের দরজা খুলে যেই না আতা বাগানে ঢুকেছি, দেখি আতা গাছের তলায় সে দাঁড়িয়ে আছে।

কি আর বলব! আরেকটু হলে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম। চিনিয়ে দেবার দরকার নেই, দেখলেই চেনা যায়, ছ-ফুট লম্বা তাগড়া জোয়ান, এতখানি বুকের ছাতি ইটের মতো শক্ত, পায়ের গুলিতে হাতুড়ির বাড়ি মারলেও কিছু হবে না, লাল টকটক করছে দুচোখ আর একমুখ ঘন দাড়ি, পরণে ঘোর নীল সার্ট আর হাফ প্যাণ্ট। লুকিয়ে থাকবার পক্ষে এর থেকে ভাল সাজ আর কি হতে পারে ?

আমাকে সে আঙুল বেঁকিয়ে ডাকল। বলল—'খিদে পেয়েছে, খাবার আন্!' বললাম -'হরিন্দম ডুলিতে তালা দিয়েছে।'

অমনি পকেট থেকে এক গোছা চাবি ফেলে দিয়ে বললে—'এই নাকি ?'

দেখে আমার গায়ের রক্ত জল! ঢোক গিলে বললাম—'তবে কি হরিন্দম আর নেই ?'

লোকটা তো অবাক! বলল—'কি জ্বালা, বলছি তার পেট ব্যথা হয়ে শুয়ে রয়েছে, আমি তার জ্ঞাতি ভাই, খুব ভাল রাঁধি। এখন যাও দিকিনি, ডুলিতে কি আছে আমার জন্যে বের করে আনো।'

অগত্যা তাই দিলাম, আট-দশটা মাছের বড়া পাঁউরুটি দিয়ে সে দিব্যি খেয়ে ফেলল ; হয়তো সেগুলো আমারি জল খাবারের জন্য তোলা ছিল। খেয়েদেয়ে মুখ চাটতে চাটতে বলল—'কি অমন করে তাকাচ্ছ কেন ? খিদে পেয়েছিল, খেয়েছি তো হয়েছে কি ? যাচ্ছেতাই রান্না হয়েছে বাপু। রাতে এর তিনগুণ ভাল করে রেঁধে দেবো দেখো। হরিন্দমের পেট ব্যথা, ওতো আর পারবে না। তোমার মা-বাবাকে বলে রেখো, হরিন্দমের জ্যাঠতুতো ভাই রাঁধবে।'

বললাম—'মোটেই আমার মা-বাবা নয়, পিসিমা-পিসেমশাই। তাছাড়া এই যে বললে জ্ঞাতি ভাই ?' লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল—'ঐ একই হল, জ্যাঠতুতো ভাইরা বুঝি জ্ঞাতি ভাই নয় ?'।

তবু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না দেখে একবার আমাকে হরিন্দমের ঘর

থেকে ঘুরিয়ে আনল। নাক অবধি কম্বল চাপা হরিন্দম গোঁ-গোঁ করছে। দেখেই আমার হাত-পা পেটে সেঁধিয়েছে। সে হরিন্দমকে বললে—'বল, মাথানেড়ে বল, আমি তোমার জ্ঞাতি ভাই, তোমার পেট ব্যথা হয়েছে তাই আমি রাঁধব।'

হরিন্দমও তার কথা মত মাথা নাড়ল।

পিসিমাকে হরিন্দমের অসুখের কথা বলে সেই ব্যবস্থাই করা গেল। সত্যি খাসা রাঁধে লোকটা, সবাই খেয়ে মহাখুসি। বনমালীবাবুর চেহারা বদলে গেল, দেখতে দেখতে ছাই রঙের মুখটাতে একটু রঙ ধরল। আহা, তাই যেন হয়, হরিন্দমের পেট ব্যথা এ দশদিনে যেন না সারে। আমরা খেয়ে বাঁচি।

লোকটা এখন নাম নিয়েছে সখারাম। দিব্যি লেগে গেল হরিন্দমের বদলে রান্নার কাজে। সেই দশদিন পিসিমার বাড়িতে যে কতরকম পরটা কাবাব কালিয়া ঝালফিরোজি ইত্যাদি চলল আর সে ক্ষীর চমচম, ঘরে তৈরি মালাই যে না খেয়েছে তাকে বলাই বৃথা।

অবিশ্যি আমি ভাল করে কিছু খেতে পারিনি, কারণ আমি জানি সখারাম হল গুণুপণ্ডিত। ভেল্কি দিয়ে রান্না করে। হরিন্দমের মোটেই দশদিন ধরে পেটব্যথা হয়নি, গুণু তার মুখে গ্যাগ্ পরিয়ে, হাত-পা বেঁধে কম্বল চাপিয়ে দিয়ে রেখেছে। সব জানি, কিন্তু বলি কোন্ সাহসে? এক নিমেষে সবাইকে কচুকাটা করে ফেলবে না? ব্যাটার এমনি সাহস যে শেষ দিনে রেঁধে বেড়ে পিসেমশাইয়ের বন্ধুবান্ধবদের পরিবেশন করে খাওয়ালে। কেউ কিছু সন্দেহ করল না, খালি বনমালীবাবু যোগীপুরুষ, হয়তো বা মন্ত্র বলে কিছু বুঝে থাকবেন। বার বার ওর দিকে তাকাচ্ছে দেখলাম। কিন্তু রান্নার সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করলেন উনিই আর রোগা পটকা হলে কি হবে, খেলেনও সবচেয়ে বেশি?

খাওয়ার শেষে সবাইকে জাফ্রাণ দেওয়া ক্ষীরের সন্দেশ দেওয়া হচ্ছে, এমন সময় কথা নেই বার্তা নেই, চার-পাঁচজন পুলিস অফিসার, কনস্টেব্ল্, ইত্যাদি এসে হাজির। তাদের পিছনে হরিন্দমের মুখটা দেখেই আর আমাকে বলে দিতে হল না যে সখারাম রান্নাবান্না নিয়ে আজ মশ্গুল, এই ফাঁকে কেমন করে দড়া-দড়ি খুলে পালিয়ে গিয়ে হরিন্দম পুলিস ডেকে এনেছে! কি ফ্যাকাশে রোগা হয়ে গেছে হরিন্দম। এবার আমাদের পোলাও কালিয়া খাওয়াও তা হলে ঘুচল।

পুলিসেরা ঘরে ঢুকতেই অবাক কাণ্ড! বনমালীবাবু একটা অস্ফুট চিৎকার করে পিছনের দরজা দিয়ে দৌড় মারলেন। কিন্তু সেখানেও লোক ছিল, দেখতে দেখতে তারা তাঁর হাতে হাতকড়া পরাল। আর সখারাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষীর মাখা হাত দিয়েই মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

কারো মুখে প্রথম কথা সরে না। তারপর সম্বিৎ ফিরে এলেই পিসে-মশাই ব্যস্ত হয়ে বললেন—'ওকি হলো দারগাবাবু, বনমালীবাবু আমার গুরু ভাই, আপনি কাকে ধরতে কাকে ধরছেন।'

দারগাবাবু বললেন—'ধরছি ঠিকই, এই রোগাপটকা লোকটিই সেই বিখ্যাত ডাকাত গুণুপণ্ডিত।'

আমি আঙ্গুল দিয়ে সখারামকে দেখিয়ে বললাম—'আর ও তবে কে?'

এতক্ষণ পর বনমালীবাবু অর্থাৎ গুণুপণ্ডিত কথা বললেন—'ও হলো চাল গুদোমের চৌকিদার। ওর বুড়ো আঙ্গুলের কালো আঁচিল দেখেই চিনেছিলাম, তবে এত ভাল রাঁধে বলে কিছু বলিনি। কিন্তু এখন তোকে বলছি শোন্।'

বলতে বলতে আমার চোখের সামনে গুণুপণ্ডিতের রোগাপটকা শরীরটা যেন দু-গুণ বড় হয়ে উঠল, গলার আওয়াজ থেকে বাজের শব্দ শোনা যেতে লাগল। সখারামের মুখ কাগজের মত সাদা, হাত-পা ঠক ঠক। গুণুপণ্ডিত বলতে লাগল—'শোন্ ভালো করে। তিনবছর বাদে আমি জেল থেকে বেরুব। বেরিয়েই যেন দেখি তুই আমার গুরুদেব করম বাবার আশ্রমে রাঁধছিস। এক্ষুণি চলে যাবি সেখানে। ঘেঁটুবাবু, দয়া করে ওর মাইনেটা চুকিয়ে দিন। তিনবছর বাদে ফিরে এসে আমি রিটায়ার করব, বাকী জীবনটা আশ্রমেই কাটাব। তুই যেন হাজির থাকিস, ভালো চাস তো!'

পুলিস অফিসারদের একজন একটু কেশে বললেন—'তিনবছর নয় স্যার, সম্ভবতঃ চার, জেল ভাঙ্গার ফল আছে তো।'

গুণুপণ্ডিত চোখ পাকিয়ে বলল—'ঐ একই, তিনেতে চারেতে তফাৎটা কি হল শুনি? মনে থাকে যেন সখারাম!'

সখারাম একগাল হেসে হাতজোড় করে বললে—'আজ্ঞে আমি এখন থেকেই তেনার শিষ্য বনে গেছি। তবে মাইনের কথাটা তেনাকে একটু বলে দেবেন।'

পাখি

ডান পাটা মাটি থেকে এক বিঘৎ ওঠে, তার বেশি ওঠে না। কুমু তা হলে চলে কি করে?

মাসিরা মাকে বললেন—'কিচ্ছু ভাবিসনে দিদি, রোগ তো সেরেই গেছে, এখন ওকে ঝাড়া তিন মাস সোনাঝুরিতে মা-র কাছে রেখে দে, দেখিস কেমন চাঙ্গা হয়ে উঠবে।'

বাবাও তাই বললেন—'বাঃ, তবে আর ভাবনা কি, কুমু? তা ছাড়া ওখানে ঐ লাটু বলে মজার ছেলেটা আছে, হেসে খেলে তোর দিন কেটে যাবে।'

কিন্তু পড়া? কুমু যে পড়ায় বড় ভালো ছিল। তা তিন মাস গেছে শুয়ে শুয়ে, তিন মাস গেছে পায়ে লোহার ফ্রেম বেঁধে হাঁটিতে শিখে। আরো তিন মাস যদি যায় দিদিমার বাড়িতে, তবে পড়া সব ভুলে যাবে না?

মা বললেন—'আবার পড়ার জন্য অত ভাবনা কিসের, বোকা মেয়ে! লেখাপড়া চিরকালের জিনিস, ওকি কেউ ভোলে নাকি? আমি তো লেখাপড়া ছেড়েছি আজ পনেরো বছর, তবু সব ভুলে গেছি নাকি?'

'কিন্তু—কিন্তু —' কুমুর চোখে জল আসে। মাসিরা যান রেগে।

'ও আবার কি বুড়ো ধাড়ি আট বছরের মেয়ের আবার কথায় কথায় কান্না কি? সোনাঝুরি পাহাড়ে দেশ, লোকে বলে পরীদের বাস, কতবার বলেছি না তোকে? তারপর এই সময়ে সেখানে গাছে গাছে নাসপাতি পাকে, গাছের ডাল ফলের ভারে নুয়ে এসে প্রায় মাটি ছোঁয়। ওখানে যাবার জন্য লোকে তপস্যা করে, তোর আবার চোখে জল কিসের? সবেতে দেখছি তোর বাড়াবাড়ি।'

মা বললেন—'সত্যি পড়ার জন্য অত ভাবনা কিসের মা? লাটুর বাড়ির মাস্টার তোমাকেও পড়াবেন। এই তিন মাস ভালো করে পড়ে তোমাদের ইস্কুলের বড় দিদিমণিকে বললে হয়তো পরীক্ষা করে ওপরের ক্লাসে নিয়ে নিতেও পারেন।'

মাসিরা বললেন —'ন্যাকা! বেঁচে উঠেছিস্ এই যথেষ্ট, তা না হয়

একটা বছর ক্ষতিই হল, তাতে কি এমন অসুবিধেটা হবে শুনি?'

মেজমাসি বললেন—'আরে, বাবা তো আমাদের হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে ঝগড়া করে, আমাদের তিন বোনকেই ইস্কুল ছাড়িয়ে একটি বছর বাড়িতে বসিয়ে রেখেছিলেন, তা আমরা কেঁদে ভাসিয়ে ছিলাম নাকি?'

ছোটমাসি বললেন—'আরে কাঁদব কি। ঐ সোনাঝুরিতেই ছিলাম সে বছরটা—রোজ রোজ পিক্‌নিক্ পড়াশুনোর বালাই নেই, মহানন্দে কেটে ছিল সারা বছর তারপর দাদুর তাড়ায় আবার সব ভর্তি হলাম। সক্কলের একটা করে বছর নষ্ট হল। কেউ কাঁদিনি।'

পরীদের কথাটা সত্যি মিথ্যা কে জানে, কিন্তু সোনামুনি, হাসি, বড়টুনু, রত্না সবাই ওপরের ক্লাশে উঠে যাবে, কুমু পড়ে থাকবে, ভাবলেও কান্না পায়। তার চেয়ে মরে গেলে কেমন হোত? ধাই মা বলত, 'বিষ্টির জলের ফোঁটা যেমন করে পুকুরের জলের সঙ্গে টুপ করে মিশে যায়, মরে গেলে মানুষের আত্মা ঐ রকম করে ভগবানের সঙ্গে মিশে যায়।'

কুমুর বড় বোন সীমা রেগে যেত। বলত—'কি যে বল, সক্কলের আত্মা এক সঙ্গে কখনো মিশতে পারে? ও বাড়ির দুষ্টু জগার সঙ্গে ভগবান কখনো মিশতে পারেন? আমরাই মিশি না; ঝোপের আড়ালে বিড়ি খায়, এমনি দুষ্টু ছেলে!'

তবে, ধাই মা নিশ্চয়ই মিশে গেছে। ধাইমা বড় ভালো ছিল।

কুমুর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

সোনাঝুরিতে দিম্মার বাড়ির দোতলার বড় ঘরে, মস্ত জানলার ধারে আরাম-চেয়ারে বসে বসে চেয়ে দেখে দূরে একটা বিল, সেখানে হাজার হাজার বৃষ্টির জলের ফোঁটা পড়ছে আর অমনি বিলের জলে মিশে যাচ্ছে। মনে হল জলগুলো যেন নাচছে, লাফাচ্ছে, বড় খুসি হচ্ছে। আস্তে আস্তে প্যাটা আবার একটু তুলতে চেষ্টা করে কুমু। এমন সময় লাটু এসে ঘরে ঢুকল।

'ও কি হচ্ছে রে? ঠ্যাং তুলছিস্ কেন? ল্যাংড়ারা বুঝি ঠ্যাং তোলে?'

কুমুর চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল বেরোয়। লাটু বিরক্ত হয়ে বলে—'ছি, ছি, ছি; ছিঁচ কাঁদুনি!' বলে এক দৌড়ে পালায়।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে, বৃষ্টি থেমে গেছে, বিলের জল সাদা চক্‌চক্ করছে। দিম্মা বলছেন ওটা সত্যিকার বিল নয়, এখানকার লোকেদের

শুকনোর সময় বড় জলের কষ্ট, তাই পাথরের ছোট বাঁধ দিয়ে ঝরণার জল ধরে রেখেছে।

আকাশ থেকে হঠাৎ ছায়ার মতো কি বিলের ওপর নেমে এল। কুমু দেখে ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা ফিকে ছাই রঙের বুনো হাঁস ঝুপঝাপ করে জলে নামছে। সন্ধ্যের আগের কম আলোতে মনে হচ্ছে যেন রাশি রাশি শুকনো পদ্মফুল সমস্ত বিলটাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে।

এক ছড়া কি যেন সাদা ফুল হাতে নিয়ে লাটু এসে বললে—'ঐ দ্যাখ্, বুনো হাঁসরা আবার এসেছে। শিকারীদের কি মজা! ইস্, আমার যদি একটা এয়ারগান থাকত! টপটপ্ গুলি করে মেরে, ঠ্যাং ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে আসতাম, তাপ্পর ক্যায়সা খ্যাঁট হোত, ভেবে দ্যাখ্ একবার। ও কি, চোখ বুঁজছিস যে?'

কুমু বললে—'বন্দুক নেই ভালোই হয়েছে। অমন সুন্দর পাখিও মারতে ইচ্ছে করে!'

দিদ্মাও তখন ঘরে এসে বললেন—'হ্যাঁ, ওদের ঐ এক চিন্তা, শুধু খাই আর খাই! ওর বাবাও তাই; পঁচিশ-তিরিশটা করে মেরে আনবে, তারপর ভাজো আর খাও!'

কুমু বললে—'কোত্থেকে এসেছে ওরা?'

'যেই শীত পড়ে অমনি উত্তরের ঠাণ্ডা দেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে, বাঁধের কাছে দু-তিন দিন বিশ্রাম করে, তারপর আবার দক্ষিণ দিকে উড়ে যায়, শোনা যায় নাকি সমুদ্রের ওপর দিয়ে আন্দামান অবধি উড়ে যায় কেউ কেউ।'

লাটু কাছে এসে ফুলটা কুমুর খাটে রেখে বললে—'আবার শীতের শেষে যেই না দখ্নে বাতাস বয়, অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে সব ফিরে আসে, সে কথা তো বললে না ঠকুরমা? দু-বার শিকারীরা পটাপট গুলি চালায়, আর মজা করে কুড়মুড়িয়ে বুনোহাঁস ভাজা খায়।

লাটুর কথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দূরে দুম্ দুম্ করে বন্দুকের গুলির শব্দ হল, আর বুনো হাঁসের ঝাঁক জল ছেড়ে আকাশে উড়ে খুব খানিকটা ডাকাডাকি করে আবার জলে নামল। দু-তিনবার এই রকম হল, তারপরে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল, শিকারীরাও ঘরে ফিরল, পাখির ঝাঁক সেদিনের মত নিশ্চিন্ত হল।

দিদ্মার পুরনো চাকর রঘুয়া কুমু-লাটুর জন্য গরম লুচি, মুর্গির স্টু

আর ঘন দুধ নিয়ে এল। লাটু মহা খুসি ; কিন্তু মুর্গির স্টু আর কুমুর গলা দিয়ে নামে না। বললে—'দিম্মা, পাখিরা এখন কি করছে ?'

লাটু একগাল লুচি মুখে নিয়ে বললে—'করবে আবার কি, ডানার মধ্যে মুণ্ডু গুঁজে মি-মি কচ্ছে, তাও জানিস নে ?'

কুমু ছোটবেলায় ঘুমোনোকে বলত মি-মি কচ্ছে। তাই নিয়ে লাটুর ঠাট্টা হচ্ছে। কি খারাপ লাটুটা !

আরো রাত হ'লে ফুটফুটে চাঁদ উঠল। ঘরের ওপাশে লাটু ছোট একটা নেওয়ারের খাটে শোয়ামাত্র ঘুমে অচেতন, কিন্তু নতুন জায়গায় এসে কুমুর চোখে ঘুম নেই। খালি মনে হয়, জানলার নিচে সরবতি লেবুর গাছে কিসের যেন ডানা ঝট্‌পট্ শুনতে পাচ্ছে। খাটের পাশেই জানলা, কিন্তু যাবার আগে কুমুর ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে দিম্মা জানালা বন্ধ করে, ভারি পর্দা টেনে দিয়ে গেছেন। কুমু বিছানা ছেড়ে উঠে পর্দার পেছনে সেঁধিয়ে গেল।

মস্ত জানলার একটা কাঁচ আবার ছোট্ট একটা জানলার মতো আলাদা করে খোলা যায়, তাই দিয়ে মাথা গলিয়ে কুমু দেখতে চেষ্টা করে। চাঁদের আলোয় গাছের পাতা ঝিক্‌মিক্ করে, দোলে, নড়ে ; কিন্তু কিছু দেখতে পায় না কুমু, শুধু কানে আসে পাখির ডানার ঝট্‌পটানি। কেমন যেন মন কেমন করে, মাকে দেখতে ইচ্ছে করে, আস্তে আস্তে বিছানায় ফিরে এসে বালিশে মুখ গুঁজে কুমু ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে জানলা খুলে, পর্দা টেনে দিম্মা চলে গেলে, কুমু জানলা দিয়ে চেয়ে দেখে সরবতি লেবুগাছের পাতার আড়ালে, ডাল ঘেঁষে কোনোমতে আঁকড়ে-পাকড়ে বসে রয়েছে ছোট একটা ছাই রঙের বুনো হাঁস। সরু লম্বা কালো ঠোঁট দু'টো একটু হাঁ করে রয়েছে, পা দু-টো একসঙ্গে জড়ো করা, বুকের রংটা প্রায় সাদা, চোখ দু-টো একেবারে কুমুর চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে, কালো মখমলের মতো দু-টো চোখ। একদিকের ডানা একটু ঝুলে রয়েছে, খানিকটা রক্ত জমে রয়েছে, সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে।

পাখিটাকে দেখে কুমুর গলার ভেতরে টন টন করতে থাকে ; হাত বাড়িয়ে বলে—'তোমার কোনো ভয় নেই, কোনো ভয় নেই।' পাখিটা চোখ বন্ধ করে, আবার খোলে। আরেকটু ডাল ঘেঁষে বসে।

কানের কাছে লাটু বলে—'ও কি রে, ভোর বেলাতে ল্যাংড়া ঠ্যাং নিয়ে
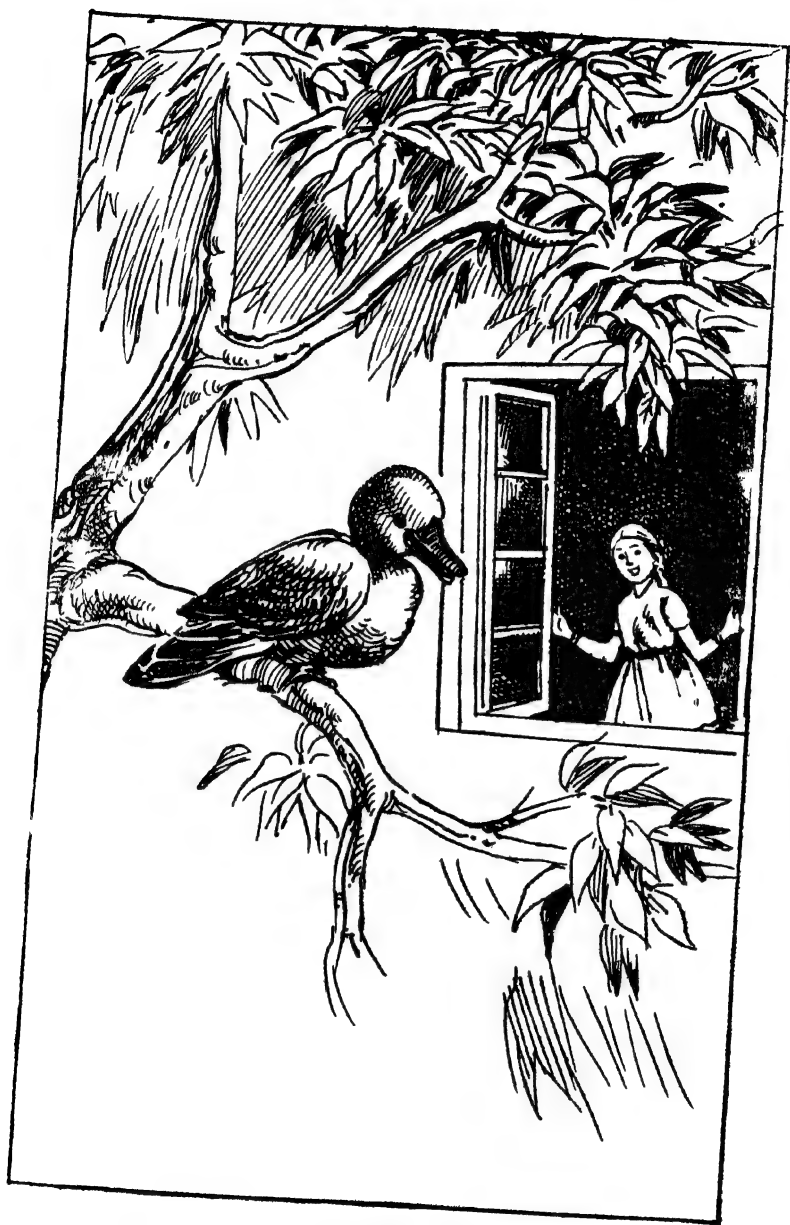
ডাল ঘেঁষে কোনমতে আঁকড়ে-পাকড়ে বসে রয়েছে···

কি হোচ্ছে বল দিকিনি।'

চমকে ফিরে, দু' হাত মেলে জানলাটাকে আড়াল করতে চেষ্টা করে, কুমু হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে—'না, না, ওকে খাবে না।'

লাটু তো অবাক। 'কি আবার খাবে না?' কুমুর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে পাখি দেখতে পায়। 'ইস্! ডানায় গুলি লেগেছে বেচারার! দাঁড়া, গাছে চড়ে ধরি ওটাকে।'

সিংহের মতো জোর আসে কুমুর গায়ে। দু-হাত দিয়ে লাটুকে ঠেলে বলে—'কক্ষণো না, কক্ষণো না। ওকে খেতে দেব না।' বলে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে। লাটু ওর খাটের ওপর বসে পড়ে বোকার মতো চেয়ে থাকে। তারপর বলে—'চূণ হলুদ দিয়ে বেধে দিলে সেরেও যেতে পারে। বলিস্ তো ধরে আনি।'

কুমু বললে—'কিন্তু দিম্মা কি বলবেন?'

'কি আবার বলবেন? বলবেন ছি, ছি, ছি, নোংরা জিনিস ফেলে দে, ওসব কি বাঁচে!'

কুমু জোর গলায় বললে—'নিশ্চয় বাঁচে, চূণ হলুদ দিয়ে ডানা বেঁধে, গরম জায়গায় রাখলে নিশ্চয় বাঁচে।'

লাটু বললে—'কোন গরম জায়গায়?'

'কেন আমার বিছানায়, লেপের মধ্যে।'

'দেখিস, কেউ যেন টের না পায়।'

'কি করে টের পাবে, আমার বিছানা তো আমি নিজে করি। ডাক্তার আমাকে হাত পা চালাতে বলেছে যে। আচ্ছা, ধরতে গেলে উড়ে পালাবে না তো?'

'তোর যেমন বুদ্ধি! এক ডানায় ওড়া যায় নাকি?'

'কি খাবে ও, লাটু?'

লাটু ভেবে পায় না খাটের মধ্যে বিছানার ভিতরে কি খাওয়াবে ওকে। তাহলে কি হবে? না খেয়ে যদি মরে যায়!

'এক কাজ করলে হয় না রে কুমু? তোর খাবারের ঝুড়ি দিয়ে, লেবুগাছের ডালে ওর জন্য একটা বাসা বেঁধে দিই, তাহলে ভাঙা ডানা নিয়ে আর পড়ে যাবে না, নিজেই পোকামাকড় ধরে খাবে।'

নিমেষের মধ্যে ঝুড়ি নিয়ে লাটু জানলা গলে একেবারে লেবু গাছের ডালে। ভয়ের চোটে পাখিটা পড়ে যায় আর কি! লাটু তাকে খপ করে

ধরে ফেলে কিন্তু কি তার ডানা ঝট্‌পটানি, ঠুকরে ঠুকরে লাটুর হাত থেকে রক্ত বের করে দিল। লাটু দড়ি দিয়ে শক্ত করে ঝুড়ি বেঁধে পাখিটাকে আস্তে আস্তে তার মধ্যে বসিয়ে দিল। অমনি পাখিটা আধমরার মতো চোখ বুঁজে ভালো ডানাটার মধ্যে ঠোট গুঁজে দিল।

লাটু সে জায়গাটাতে নিজের পা কাটার সময়কার হলদে মলম লাগিয়ে দিয়ে আবার জানলা গলে ঘরে এল। বললে—'ঠাকুরমার কাছে যেন আবার বলিস্ টলিস না। বড়রা বুনো জানোয়ার দেখলে ভয় পায়। বলবেন হয় তো, ছুঁস না ওটাকে। বলা যায় না তো কখন কি বলেন না বলেন।'

কুমু বালিশের তলা থেকে স্ক্রু দেওয়া নতুন পেনসিলটা লাটুকে দিতে গেল।

লাটু বললে—'ধ্যাৎ! বোকা! ঠ্যাং ল্যাংড়া বলে কি বুদ্ধিও ল্যাংড়া না কি!' বলে এক ছুটে পালিয়ে গেল।

কুমু পা ঝুলিয়ে খাটে গিয়ে বসল।

পাখিটাও ল্যাংড়া। ওর ডানা ল্যাংড়া। কুমু হাঁটতে পারেনা ভালো করে, পাখিটাও উড়তে পারে না। পারলে নিশ্চয় ঐ দূরে বিলে ওর বন্ধুদের কাছে চলে যেত। গাছের ডালে খাবারের ঝুড়িতে ডানায় মুখ গুঁজে চুপ করে পড়ে থাকত না। কুমুর পা ভাল হলে কুমুও এখানে থাকত না। কলকাতায় মার কাছে থাকত, রোজ ইস্কুলে যেত, সন্ধ্যেবেলায় সাঁতার শিখত, পুজোর সময় দৌড় খেলার জন্য রোজ অভ্যাস করত। আর কোনো দিনও হয় তো কুমু দৌড়তে পারবে না। কিছুতেই আর পায়ে জোর পায় না, মাটি থেকে ঐ এক বিঘতের বেশি তুলতে পারে না। মনে হয় অন্য পাটার চেয়ে এটা একটু ছোট হয়ে গেছে।

আরেকবার জানলার কাছে গিয়ে পাখিটাকে দেখে ভালো করে, ও ডানাটাকে যে নাড়া যায় না সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। পাখিটা ঝুড়িতে বসে বসে আস্তে আস্তে কালো ঠোঁট দিয়ে বুকের পালক পরিষ্কার করছে। তারপর কিছুক্ষণ ঠোঁটে ভর দিয়ে চুপ করে চোখ বুঁজে পড়ে থাকল; তারপর আবার চোখ খুলে গাছের ডাল থেকে কি একটা খুঁটে খেল।

কুমু বালিশের তলা থেকে ছোট্ট বিস্কুটের বাক্স থেকে একটুখানি বিস্কুট ছুঁড়ে দিল। পাখিটাও অমনি যেন পাথর হয়ে জমে গেল। বিস্কুটের

দিকে ফিরেও চাইল না। কুমু আবার খাটে এসে বসল, নতুন গল্পের বইটা পড়তে চেষ্টা করল। পনেরো মিনিট বাদে আরেকবার জানলা দিয়ে উঁকি মারল। বুকের পালক পরিষ্কার করতে করতে পাখিটা আবার কি একটা খুঁটে খেল।

কুমু খাটে ফিরে এল। খাটের পাশেই আয়না দেওয়া টেবিল, তার টানা থেকে মেজমাসির দেওয়া নীল রেশমি ফিতেটা বের করে চুল বাঁধল। বাঃ বেশ তো ফিতেটা। একটা বিস্কুট বের করে মুখে দিল, চমৎকার বিস্কুট, কিস্‌মিস্‌ দেওয়া। আরো খানিকটা বাদে যখন একটা বড় খুঞ্চিতে করে রঘুয়া কুমুর দুধ, পাঁউরুটি, নরম নরম ডিম সিদ্ধ নিয়ে এলো, তাতে নুন গোলমরিচ দিয়ে কুমু চেটেপুটে খেয়ে ফেলল। এতটুকু রুটি, একফোঁটা দুধ বাকি থাকল না। রঘুয়া তো মহা খুসি।

'আমি বরাবর বলি বড়মাকে এখানকার হাওয়াই আলাদা। বলে নাকি কুমুদিদির খিদে হয় না, ঐ তো কেমন সব খেয়ে ফেলেছে।

রঘুয়া চলে গেলে পর ঘরটা আবার চুপচাপ হয়ে গেল। লাটু নিচে মাস্টারমশাই-এর কাছে পড়ছে, দিম্মা রান্নাঘরে, লাটু সকাল সকাল ভাত খেয়ে ইস্কুলে যাবে।

খনিক বাদে দিম্মা উপরে এসে ভারি খুসি।

'এই তো দিদিমনি কেমন চুল আঁচড়ে নীল রিবন বেঁধেছে, খুব ভালো দেখাচ্ছে। আবার খিদেও হয়েছে শুনছি। বাড়িতে নাকি কান্নাকাটি করতে, খেতে না? কেমন ভালো জায়গাটা বলতো? তাই লোকে বলে এটা পরীদের দেশ, ঐ বাঁধটাকে বলে পরীতলা।'

গাছের ডালে পাখিটা একটু নড়ছে চড়ছে, একটু-একটু শব্দ হচ্ছে, কুমু ভয়ে কাট, এই বুঝি দিম্মা দেখতে পেয়ে মঙ্গলকে বলেন, 'ফেলে দে ওটাকে বড় নোংরা, ঝুড়ি খুলে আন, ওটা কে বেঁধেছে ওখানে, ভালো ঝুড়ি!'

ঘরের মধ্যে টুকিটাকি দু'একটা কাজ সেরে দিম্মা গেলেন চলে। কুমু জানলা দিয়ে চেয়ে দেখে পাখিটা ডানার মধ্যে মুণ্ডু গুঁজে ঘুমিয়ে আছে। কুমুও বই নিয়ে বিছানায় গিয়ে শুল। হঠাৎ জানলার বাইরে সোরগোল। চমকে উঠে দেখে একটা হলদে বেড়াল গাছের ডালে গিয়ে উঠছে। কুমু ভয়ে কাট; এই বুঝি বেড়াল পাখি খেল। কিন্তু খাবে কি, অত বড় পাখি তার তেজ কত! দিলে ঠুক্‌রে ঠেলে বেড়ালের মুখ থেকে রক্ত বের করে দিয়ে একবারে ভাগিয়ে। দু-টো কাক দূর থেকে মজা দেখল, কাছে

ঘেঁষতে সাহস পেল না।

কুমু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের এমাথা থেকে ওমাথা হেঁটে বেড়াতে লাগল। খোঁড়া তো হয়েছে কি, এইরকম করে হাঁটলেই না পায়ের জোর বাড়বে। দু-বার হেঁটে কুমু এসে যখন খাটে বসল, পা দু-টোতে ব্যথা ধরে গেছে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন ডান পাটা এক বিঘতের চেয়ে একটু বেশিই তোলা যাচ্ছে।

দিম্মা এলে কুমু বললে—'স্নানের ঘরে আমার জামা তোয়ালে তুমি ঠিক করে দিও; আমি নিজেই স্নান করব।'

দিম্মা ব্যস্ত হয়ে বললেন—'আজ অনেক হেঁটেছ, আজ থাক, দু'দিন বাদে কোরো, কেমন?'

এমনি করে দিন যায়, বুনো হাঁসের ডানা আস্তে আস্তে সারতে থাকে। দু-দিন পরে পাখির ঝাঁক বিল থেকে দক্ষিণ দিকে উড়ে গেল। গাছের ডালে বসে পাখিটা একটা ডানা ঝাপটাতে লাগল। উড়বার জন্য কি যে তার চেষ্টা! কিন্তু ভাঙগা ডানা ভর সইবে কেন, হাঁসটা ঝুড়ি থেকে পিছলে পড়ে নিচের ডালের ফাঁকে আটকে থাকলো। লাটু তখনো ইস্কুল থেকে ফেরেনি, কুমু করে কি! জানলার ধারে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকলো, পাখিটা অনেকক্ষণ অসাড় হয়ে ঝুলে থাকার পর আঁচরে পাঁচরে নিজেই সেই ডালটার উপর চড়ে বসল। লাটু ফিরে এসে আবার ওকে তুলে ঝুড়িতে বসিয়ে দিল। ঠোকরালও একটু সে, তবে তেমন কিছু নয়, ডানায় আবার ঔষুধ লাগিয়ে দিল লাটু।

পরদিন কুমু লাটুর সঙ্গে মাস্টারমশাই-এর কাছে পড়তে বসল। মাস্টারমশাই উপরে এলেন—কি ভালো উনি, কুমুকে বেশি করে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। বললেন, এমনি মন দিয়ে পড়লে উনি কুমুকে এই তিন মাসে এমন করে তৈরি করে দেবেন যে বছরের শেষে পরীক্ষা দিয়ে কুমু দিব্যি উপরের ক্লাশে উঠে যেতে পারবে।

এমনি করে দিন যায়, রোজ পাখি একটু করে সেরে ওঠে, ঝুড়ি থেকে ডালে নামে। আর আনন্দের চোটে কুমুও ঘরময় হেঁটে বেড়ায়, নিজের বিছানা নিজে পাতে, নিজে স্নান করে, জামা কাচে। দুপুর বেলা এক ঘুম দিয়ে উঠে নিজে বসে অঙ্ক কষে। বাড়িতে চিঠি লেখে—"মা বাবা, তোমরা ভেবোনা, আমি রোজ রোজ সেরে উঠছি, আমার নতুন ফ্রকগুলো পাঠিয়ে দিও, রত্নাদের বলো আমি পরীক্ষা দেব, আমি আরেকটু

ভালো হলে নিজে নিচে নামব, এখন রঘুয়া আমাকে রোজ বিকালে কোলে করে বাগানে নামায়, সরবতি লেবুগাছের তলায় বেতের চেয়ারে বসিয়ে দেয়। রাতে আমি নিচে সবার সঙ্গে খাই।"

আরো লিখছিল—"সরবতি লেবুগাছে একটা বুনো হাঁস থাকে, তার ডানা ভেঙ্গে গেছিল, এখন সেরে যাচ্ছে।" কিন্তু সেটা আবার কেটে দিল, জানতে পেরে যদি দিম্মা পাখিটাকে তাড়িয়ে দেন।

এমনি করে এক মাস কাটল। তার মধ্যে একদিন খুব বৃষ্টি হয়েছিল, পাখিটাতো ভিজে চুপ্পুড়। ঝুড়ি ছেড়ে ঝুড়ির তলার গাছের ডালের আড়ালে গিয়ে সেঁধুল। তারপর বৃষ্টি থেমে আবার যখন রোদ উঠলো, দিব্যি ডানা মেলে পালক শুকোল। কুমু অবাক হয়ে দেখল ডানা সেরে গেছে।

তার দু-দিন পরে পাখিটা উড়ে গেল। দুপুরে শুকনো ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, মাথার অনেক ওপর দিয়ে মস্ত এক ঝাঁক বুনো হাঁস তীরের মত নক্সা করে উড়ে গেল। কুমুর পাখিও হঠাৎ কি মনে করে ডাল ছেড়ে অনেকখানি উঁচুতে উড়ে গেল, কিন্তু তখুনি আবার নেবে এসে মগডালে বসল। হাঁসরা গিয়ে পরীতলায় নামল। পাখি সেই দিকেই চেয়ে থাকল।

সারা রাত বুনো হাঁসরা বিশ্রাম করে পর দিন সকালে যখন দল বেঁধে আকাশে উড়ল, কুমুর পাখিও তাদের সঙ্গ নিল। দল থেকে অনেকটা পেছিয়ে থাকল বটে, কিন্তু ক্রমাগত যে রকম উড়তে লাগল, কুমু লাটুর মনে কোনো সন্দেহ রইলো না, এখুনি ওদের ধরে ফেলবে।

সে বিকেলে কুমু নিজে হেঁটে নিচে নামল, ডান পাটা যেন একটু ছোটই মনে হল।

কুমু বলল—'দিম্মা, পাটা একটু ছোট হলেও কিছু হবে না, আমি বেশ ভালো চলতে পারি। বুনো হাঁসটারও একটা ডানা একটু ছোট হয়ে গেছে।'

শুনে দিম্মা তো অবাক! তখন লাটু আর কুমু দু-জনে মিলে দিম্মাকে পাখির গল্প বললে। দিম্মা কুমুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—'ওমা, বলিস্‌নি কেন, আমিও যে পাখি দেখতে ভালোবাসি!'

ম্যাজিক

ছোট বেলায় প্রায়ই আমাদের চাকর বলত পাশের বাড়ির বড় বাবুর্চি নাকি জাদু জানে ; নাকি সাহেবের খানার জন্য এই মোটা মোটা মুর্গি এল, তা সে সাহেব তো চোখে দেখল ছাই. বাবুর্চির হল পেট পুজো ! কিন্তু ওমা ! খাবার সময় ঠিক থালা ভরা ভুরভুর গন্ধ লাল্‌চে ভাজা মোগলাই মুর্গি ! বাবুর্চির মাইনেও বাড়তে থাকে উত্তরোত্তর ! তাই দেখে আমাদের চাকরটার সে কি হিংসে ! সেও নাকি পাহাড়ের উপরে দেওতাস্থানে গিয়ে সাদা মুর্গি বলি দিয়ে জাদুমন্ত্র শিখে আসবে, তা'হলে সে ইচ্ছে মতো বেড়াল হতে পারবে, বাঘ হতে পারবে, পেট ভরে খেতে পারবে, কারো বাড়িতে কাজ করতে হবে না, হেনা-তেনা কত কি !

তাই শুনে আমাদের বুড়ি ঝি বলতো, 'ওমা, এ আবার কি ! আমার দাদামশাই মুখের মধ্যে প্যাঁচার চোখের মণি পুরে, বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যেত, আর তাকে চোখে দেখা যেত না, যেখানে খুসি আসত, যেত, কেউ টেরও পেত না।'

আমরা বলতাম, 'কোথায় সে এখন, আমরা অদৃশ্য হওয়া শিখবো !' বুড়ি বলত, 'ওমা, এরা আবার কি বলে ! বলি, সে কবে না খেতে পেয়ে পটল তুলেছে, তার কাছে আবার শিখবে কি !'

আমাদের পাশের বাড়ির মাসিমারা একবার রাঁচি গিয়ে সাধুদের দেখেছিলেন, গনগনে আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে, পায়ে একটু ফোস্কা পর্যন্ত পড়ে না। তা সে নাকি জাদু নয়। বারবার স্নান করে করে শরীরটাকে আগুন-সই করে নেয় ওরা। কিন্তু ঐ মাসিমাই নাকি ছোটবেলায় জাদুকর দেখেছিলেন, তারা চোখের সামনে আমের আঁটি থেকে গাছ বের করে, গাছ বড় করে, তাতে বোল ধরিয়ে, ফল পাকিয়ে, সকলকে পেট ভরে খাইয়ে দিয়েছিল।

ছোটবেলা থেকে এমনি সব ম্যাজিকের গল্প শুনতাম আমরা। সেকালের সাহেবদের বইতে প্রায়ই আরেকটা এদিশি ম্যাজিকের কথা পড়া যেত, সেও ভারি অদ্ভুত। জাদুকর মোটা একগাছি দড়ি মাটিতে ফেলে, সাপ খেলাবার বাঁশি বাজাতে সুরু করে অমনি দড়ি গাছাও সাপের মতো

কিলবিলিয়ে ফণা ধরে ওঠে। তারপর সোজা হয়ে আকাশে উঠতে থাকে; শেষ পর্যন্ত দড়ি খাড়া হয়ে স্থির হয়ে যায়। উপরটায় একটু মেঘের মতো জমা হয়ে থাকে, তার উপরে আর দেখা যায় না।

তখন একটা লোক ছুটে এসে দড়ি বেয়ে উপরে উঠে মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। আর অমনি আর একটা লোকও তলোয়ার হাতে তাকে তাড়া করে দড়ি বেয়ে উঠে পড়ে সেও অদৃশ্য হয়ে যায়। শূন্যের উপরে খুব খানিকটা মারামারির শব্দ হয়, উপর থেকে এটা ওটা, পাগড়ি, নাগরাই ইত্যাদি নিচে পড়তে থাকে। শেষ অবধি জাদুকর আবার বাঁশির সুর বদলে দড়ি গুটিয়ে আনে। যেই বাঁশি থামে, দড়িগাছিও ভালো মানুষের মতো দড়িগাছি হয়ে মাটিতে শুয়ে থাকে।

আর সেই লোক দু-টো? তারাও খানিকবাদে ঘাম মুছতে মুছতে অন্যদিক থেকে এসে যে যার পাগড়ি চটি পরে নেয়।

এই ম্যাজিক দেখবার জন্যে সেকালের সায়েবরা ছিল পাগল। অথচ এখন কেউ এর নামও করে না।

বড়রা বলতেন, 'ম্যাজিক ফ্যাজিক কিছু নয়, সব বুজরুকি, হাতসাফাইয়ের ব্যাপার—যাকে বলে চোখে ধুলো দেওয়া, সে ছাড়া আর কিছু নয়।'

একবার ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড় পরা একটা লোক এল। এসে বলল সে এক টাকাকে দু'টাকা করে দেবার বিদ্যে জানে। এমনকি নমুনা দেখাবার জন্যে দিলেও একটা দশ টাকার নোটকে দু-টো দশ টাকার নোট ক'রে। কিন্তু এই জাদু দেখাবার জন্য তাকে পাঁচ টাকা বখশিস দিতে হবে।

আমাদের জাদু দেখবার খুবই ইচ্ছে ছিল। তা ছাড়া, যার যা টাকা কড়ি আছে, সব দু-গুণ হয়ে যায় তো মন্দ কি! কিন্তু বড়দের জন্যে আর কিছুই করা গেল না। তাঁরা বললেন, 'এক টাকাকে যদি দু-টাকাই করতে পারে তো আবার পাঁচ টাকা চায় কেন? নিজের টাকাগুলোকে দুগুণ, চারগুণ, আটগুণ করে নিলেই তো পারে।' এই বলে দিলেন লোকটাকে ভাগিয়ে। ইস্, আমাদের সে যে কি কষ্টই হয়েছিল!

আরো কতরকম ম্যাজিক দেখেছি, হতে পারে হাত সাফাই, কিন্তু অমন হাত সাফাই যার তার করার সাধ্য নেই। একজন ধুতি পাঞ্জাবী পরা লোক, দেশলাই কাঠি নাচাত। নিজে দশ হাত দূরে বসতো, দর্শকদের কাছ থেকে এক বাক্স দেশলাই চেয়ে, সেটাকে খুলে মাটিতে ফেলে রাখত। তারপর ঐ অতদূরে বসে সে যা বলত, দেশলাই কাটিরা তাই করত।

লাইন করে বাক্স থেকে বেরিয়ে মার্চ করত, লাফাত, শুয়ে পড়ত, রাইট অ্যাবাউট্‌ টার্ণ করে আবার গিয়ে বাক্সে ঢুকে পড়ত। করুক তো কেউ এইরকম বুজরুকি! তাকেই আমরা জাদুকর বলতে রাজী আছি।

তবে সবচেয়ে আশ্চর্য ম্যাজিক দেখেছিলাম বত্রিশ বছর আগে শ্রীনিকেতনের কাছে লাভপুরের রাস্তায়। পুজো সেবার খুব দেরিতে পড়েছিল। পুজোর ছুটির পর যখন আবার ইস্কুল খুলল, তখন বেশ শীত পড়ে গেছে। একদিন আগে এসে পৌঁছে শুনি নাকি শ্রীনিকেতনের কাছে জাদুকরের তাঁবু পড়েছে, সে অদ্ভুত ম্যাজিক দেখাচ্ছে।

গেলাম সবাই দল বেঁধে। তখন সাইক্ল রিক্সা, বাস ইত্যাদির বালাই ছিল না, সন্ধ্যা বেলায় সব হেঁটে মেরে দিলাম। পৌঁছে দেখি এ কেমন জাদুকর, পয়সা কড়ি নেই, তাঁবুর মাথায় এত বড় বড় ছ্যাঁদা। জাদুকরদের ছেঁড়া, ময়লা কাপড় পরণে।

সার্কাসের তাঁবুর মতো ব্যবস্থা, মাঝখানটা ফাঁকা, চারদিকে গোল করে গ্যালারি বানিয়েছে। একটি মাত্র পেট্রোম্যাক্স বাতিতে সবটা আলো হয়ে রয়েছে।

জাদুকররা ছিল তিনজন। কিন্তু আমরা সবাই গোল হয়ে বসামাত্র, সবচাইতে ছোট যে তাকে বড়রা দু-জন চেপে ধরে বলল, 'এ লোকটা ভারি দুষ্টু। একে পুঁতে রাখাই উচিত, নইলে খেল্‌ দেখাতে দেবে না।'

এই বলে কথা নেই বার্তা নেই, ঐ খানেই একটা গর্ত খোঁড়াও ছিল, তার মধ্যে ওকে পুরে দিব্যি মাটি চাপা দিয়ে খেল্‌ শুরু করে দিল। সে রকম আশ্চর্য খেল্‌ আর আমি জন্মে দেখিনি, বোধ হয় দেখবও না।

বড় জাদুকর প্রথমে একলা জঘন্য ময়লা রুমাল বের করে, সকলকে সেটা পরীক্ষা করতে বলল। এমনি নোংরা সেটা যে কারো হাতে ছুঁতে ইচ্ছা করল না, কিন্তু খুব কাছে এনে, টর্চ জ্বেলে, ভালো করে সবাই দেখলাম, একটা সাধারণ অতি ময়লা রুমাল ছাড়া আর কিছু নয়। সেজ জাদুকর তারপর আরো ময়লা একটা রুমাল বের করে ঐ রকম ভাবে সবাইকে দেখিয়ে নিল। সাধারণ একটা রুমাল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তারপর তারা করল কি, পাঁচটা করে গিঁট দিয়ে, রুমালগুলোকে ন্যাকড়ার পুতুলের মত বানিয়ে নিল। মুণ্ডু, হাত, পা, সব হল। সবাইকে ভাল করে দেখিয়েও নিল।

বড় জাদুকর এবার ন্যাকড়ার পুতুল দুটো·

বড় জাদুকর এবার ন্যাকড়ার পুতুল দু-টোকে নিজের হাতের তেলোয় শুইয়ে বলল, 'উট্ দেখি, খেল্ দেখা'! এই বলে যেই না তাদের গায়ে ফুঁ দিল, অমনি পুতুল দু'টো জ্যান্ত হয়ে তড়বড়িয়ে উঠে, ওর হাত থেকে এক লাফে মাটিতে নেমে পড়লো।

জাদুকর তখন তাদের নিয়ে কি খেল্‌টাই দেখাল, সে আর কি বলব। তারা নাচল, কুঁদল, কুস্তি করল, ডন্-বৈঠক করল, মার্চ করল, হ্যাণ্ড-সেক করল। জাদুকর যা বলে, বলবার সঙ্গে-সঙ্গে তাই করে। দেখে দেখে আমরা সবাই হাঁ!

শেষটা মেজ জাদুকর অসাবধানতা বশতঃ ওদের দিল মাড়িয়ে। বড় জাদুকর হাঁ হাঁ করে ছুটে আসতেই, ভারি অপ্রস্তুত হয়ে মেজ পা উঠিয়ে নিল। কিন্তু পুতুল দুটির রাগ দেখে কে! ঘুষি বাগিয়ে তারা মেজ জাদুকরকে আক্রমণ করে সমানে কিল, চড়, লাথি, ঘুষি মেরে যেতে লাগল। কিছুতেই বড় জাদুকরের মানা শুনল না।

সেও তখন রেগে গিয়ে ওদের হাতে তুলে নিল। তা তারা হাতে থাকবে কেন, থপ থপ করে লাফিয়ে নেমে আবার তেড়ে যেতে চায়! আমাদেরি কি রকম ভয় ভয় করতে লাগল। শেষ অবধি বাধ্য হয়ে বড় জাদুকর ওদের ধরে, আবার যেই গায়ে ফুঁ দিল, অমনি তারা শুয়ে পড়ে আবার রুমালে গিঁট দেওয়া ন্যাকড়ার পুতুল হয়ে গেল। বড় জাদুকর গিঁট খুলে, রুমাল ঝেড়ে আবার আমাদের দেখিয়ে গেল।

খেলও ভেঙ্গে যাচ্ছে, এমন সময় বড় জাদুকরের হঠাৎ মনে পড়াতে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে ছোটটাকে বের করে আনল। সেও ঘণ্টা-খানেকের বেশি মাটিতে পোঁতা থাকাতে দেখলাম খুব চটেছে। মুখ লাল করে কাপড় থেকে ধুলো মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে, গজ্‌গজ্ করতে করতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল!

আমাদের কারো মুখে আর কথা সরে না। ভাবলাম একেও যদি হাত-সাফাই বলে, তাহলে জাদুবিদ্যা আবার কি? তবে একটা কথা মাঝে মাঝে মনে হয়, 'এত জাদুই যদি জানে লোকগুলো তাহলে একটা বাঁকা টিনে করে সকলের কাছে থেকে দু-আনা করে পয়সা নিচ্ছিল কেন?'

ডাইরি

মিথ্যা কথা বলা যে এমন কিছু অন্যায় এ আমি বিশ্বাস করি না, এমন কি মাঝে মাঝে মিথ্যা কথা বলার দরকার হয়। আমি ত প্রায়ই মিথ্যা কথা বলি। আরও কত কি করি! বড়দের পিছনে থেকে ভ্যাংচাই, কলা দেখাই, বক দেখাই। মাস্টারমশাইদের কথা শুনি না, মখোমুখি জবাব দিই, পড়া ভাল করে তৈরি করি না। এরজন্য যদি কেউ আমার নিন্দা করে ত আমি থোড়াই কেয়ার করি।

ভাল ছেলেদের ত আমি ভীতু মনে করি, খোসামুদে মনে করি। পাছে বকুনি খায় তাই তারা ভয়েই আধ-মরা, বড়দের কোনরকমে খুসি করতে পারলেই আহ্লাদে আটখানা! এঃ রাম, ছিঃ! আমাকে দেখ। দিব্যি আছি, খাই দাই, ঘুরে বেড়াই, যা খুসি তাই বলি, যা ইচ্ছে করি, কে আমার কি করতে পারে? বড়দের কথা আমার ঢের ঢের জানা আছে। তারা নিজেরাই যথেষ্ট দোষ করে; আবার আমাদের বলতে আসে। ওসব চালাকি আমার কাছে চলবে না।

বেশ আছি, খাসা আছি, দিদিমার কাছে থাকি, দিদিমা আমাকে সোনামণি বলে ডাকেন, ভাবেন আমার মত চাঁদের টুকরো আর হয় না; কেউ কিছু বললেও বিশ্বাস করেন না। এর থেকেই ত বড়দের বুদ্ধির দৌড় বোঝা যাচ্ছে। যাই হোক্ বেশ ছিলাম, এমন সময় সেই বাঁদরের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলাম। চোখ বুজলেই বাঁদর। হাড়-জ্বালাতন হয়ে গেলাম। ঘুমোতে যেতে ইচ্ছে করত না। হয় বাঁদরটা ফল চুরি করে যাচ্ছে, নয় ত কাগজপত্র ছিঁড়ে একাকার করছে, নয় কাউকে আঁচড়াচ্ছে কামড়াচ্ছে খিমচোচ্ছে, নয় ভেংচি কাটছে, দাঁত খিচোচ্ছে। মোট কথা, এমন পাজী বাঁদর আমি জন্মে দেখিনি। অথচ রোজ রাত্রে চোখ বুঁজেছি কি বাঁদর এসে হাজির। কাউকে বলতেও বাধ-বাধ ঠেকতে লাগল। মা-বাবাকে চিঠি লিখে কি আর এসব বলা যায়? দিদিমা ত শুনলে অবাক হয়ে যাবেন হয়ত, ফলে আমাকে জোলাপ খেতে হবে?

তারপর বাঁদরটা ভীষণ বাড়াবাড়ি শুরু করে দিল। জাগা অবস্থাতেও এসে হাজির হত। ইস্কুল থেকে ফিরছি, বইগুলো শূন্যে ছুঁড়ছি আবার

ধরছি, মাঝে মাঝে পারছি না—পড়ে যাচ্ছে, মলাট খুলে যাচ্ছে। চীনা-বাদাম কিনলাম, পান কিনলাম, পা দিয়ে খুব খানিকটা ধুলো উড়োলাম। ও পাড়ার গোবিন্দবাবু সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, ভারী বিরক্ত হলেন। আমিও তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্য কানের কাছে এইসা সিটি দিলাম যে ভদ্রলোকের পিলে চমকে উঠলো।

হঠাৎ দেখি, আম বাগানের তলায় বাঁদরটা আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে, নিজেই পিঠ চাপড়াচ্ছে, হাততালি দিচ্ছে, নিজের ল্যাজ ধরে নিজেই নাচছে কুঁদছে। ভাবখানা যেন ওর সঙ্গে আমার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। গোবিন্দবাবুও তাই দেখে হেসে বললেন, 'বা, বাঃ, তোর মাসতুতো ভাইও এসে হাজির হয়েছে যে।'

মনটা এত খারাপ হয়ে গেল যে তাকে কিছুই বললাম না, ভাবতে পার?

বাড়ি এসে দেখি আমার পিসিমা এসেছেন, তাঁর ননীর পুতুল মেয়ে ময়নাকে নিয়ে। মেয়েটি নরম, কচি, হাঁদার একশেষ। প্রথমটা একটু মাকড়সা-টাকড়সা দিয়ে ভয় দেখিয়েছিলাম, তা সে আবার দাদা দাদা করে আমাকেই জাপটে ধরল। কী আর করি, শেষটায় মাকড়সাটাকে তাড়িয়ে দিতে হলো। মেরেই ফেলতাম, কিন্তু ময়নাটা মাকড়সা মরে যাবে শুনে কেঁদেই সারা, অগত্যা জলের ছিটে দিয়ে তাড়ালাম। মাসিমাটি আমার আবার বেশ আছেন। ঘরে এসেই দেয়ালে জল ঢালার জন্য চেঁচামেচি লাগিয়েছেন। ময়না তখন বলল, 'না মা, দাদাকে ব'ক না, ও মাকড়সা তাড়িয়েছে।'

রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম বাঁদরটা একজন মোটা পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে কুস্তি লড়ছে, পারছেনা, আমাকে ডাকছে। আঁতকে জেগে গেলাম।

পরদিন ছুটি ছিল, ময়নাকে কয়েকটা আম-টাম পেড়ে দিয়েছিলাম, অবিশ্যি হেডমাস্টারমশাই-এর বাগান থেকে চুরি করে। রাত্রে চোখ বুঁজতে না বুঁজতে বাঁদর আর পাদ্রী দু-জনে এসে উপস্থিত। দেখলাম পাশাপাশি হাঁটছে, এ ওর দিকে আড় চোখে তাকাচ্ছে।

আমার শরীর খারাপ হয়ে যেতে লাগল, যখন তখন বাঁদর দেখতে লাগলাম, যেখানে সেখানে পাদ্রী সাহেব মনে হতে লাগল। ইস্কুলে আমার দস্তুরমত নাম খারাপ হয়ে গেল। এক সপ্তাহ কোন ক্লাসে কোনও গোলমাল করলাম না, অবিশ্যি পড়াশুনোও করলাম না। বাঁদরটারও যেন কেমন মন খারাপ মনে হতে লাগল। একদিন বাড়ি ফেরবার পথে দেখলাম

হঠাৎ দেখি, আম বাগানের তলায়

আমগাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে হাঁড়িপানা মুখটি করে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম, একজন পাদ্রীসাহেব হাসি-হাসি মুখ করে যাচ্ছেন। কি যেন মনে হল, একটা ঢিল তুলে পাদ্রী সাহেবের দিকে ছুড়ে মারলাম। অমনি বাদরটা ফিক করে হেসে ফেলল।

সেদিন অনেকগুলো অন্যায় করে ফেললাম, সবগুলো অবিশ্যি ঠিক আমার দোষ নয়। পেয়ালা ভাঙলাম, মিছিমিছি বললাম ময়না ভেঙেছে, ময়নার টিকি টেনে, তাকে বক দেখিয়ে, কাঁদিয়ে-টাদিয়ে, কলা দেখিয়ে, বেরিয়ে গেলাম।

পাড়ার কতকগুলো ছেলের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় হৈ-চৈ করে বেড়ালাম ; কত লোকের জানলার কাচ ভাঙলাম, কুকুর তাড়া করলাম, গোবিন্দবাবুর টিয়া পাখিটা ছেড়ে দিলাম, আরও কত কি যে করলাম তার ঠিক নেই। রাত্রে ফিরলাম দেরি করে, খেতে বসে গোলমাল করলাম—এ খাবনা ও খাবনা। দিদিমা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ; মাসিমা বললেন—'দুটো কষে চড় লাগালে ছেলে সিধে হয়ে যাবে।' বললাম—'তোমার ছেলেকে চড় লাগিও, খবরদার আমার কাছে এসো না।' বলে উঠে দে দৌড় ! সিঁড়িতে মনে হল সারি সারি বাঁদর দাঁড়িয়ে আছে। বাগানে বেরিয়ে গেলাম। গেটের পাশে আমার বন্ধু ন'টে দাঁড়িয়ে।

'কেন রে ? কী হয়েছে ?'

'বটু তুই টিয়া পাখি ছেড়ে দিলি, আর গোবিন্দবাবু হেডমাস্টারমশাই-এর কাছে নালিশ করেছেন যে, আমি ছেড়ে দিয়েছি। বাবা শুনলে ত আমার ছাল ছাড়িয়ে নেবেন।'

বললাম—'চল, হেডমাস্টারমশাই-এর বাড়ি।'

পথে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলাম—'ন'টে পেছন দিকে তাকিয়ে দেখত' কেউ ফলো করছে কিনা।'

ন'টে বললে—'না ত'।'

'একজন পাদ্রীসাহেব কি একটা বাঁদর নেই বলতে চাস ?'

ন'টে বললে—'কই না ত।' তবে ঐ গাছটাতে বাঁদর থাকতেও পারে। কেনরে ?'

কিছু বললাম না, হেডমাস্টারমশাই-এর বাড়ি এসে গেলাম। তারপর তাকে বল রে, গোবিন্দবাবুকে ডাকরে, অপমানের একশেষ, জরিমানা ইত্যাদি—সে আর বলে কাজ নেই।

রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম পাদ্রী সাহেব আর বাঁদর কোলাকুলি করছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, বাঁদরটা কোলাকুলি করছে বটে, কিন্তু, হাত বাড়িয়ে পাদ্রী সাহেবের পিছনে চিমটি কাটতে চেষ্টা করছে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। তারপরই জ্বর-টর হয়ে মা বাবার কাছে চলে গিয়েছিলাম, আর পাদ্রী সাহেবকে বা বাঁদরটাকে দেখিনি। মাঝে মাঝে খটকা লাগে।

ইচ্ছেগাই

মহালয়ার দিন বাড়ি এসেই বোকোমামা পকেট থেকে একটা কাঁচের তৈরি রাগী গরুর মূর্তি বের করে বলল—'এটাকে একটা সাধারণ জিনিস মনে করিস না যেন, এর পেছনে একটা বিরাট ইতিহাস আছে।' টিংটিঙে রোগা ছোট্ট একটা গরু হাতের তেলোয় ধরে যায়, চার ঠ্যাং এক জায়গায় করে ভুরু কুঁচকে চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনের পায়ে কালো রং দিয়ে ছোট্ট একটা 'ন' লেখা।

আমরা বললাম—'ওমা, এমন সুন্দর কাঁচের গরু কোথায় পেলে, বোকোমামা!'

বোকোমামা যেন আকাশ থেকে পড়ল। দু-চোখ কপালে তুলে বলল—'কাঁচ? হ্যাঁরে ইডিয়ট, তোরা কি স্ফটিকও চিনিস না? এটার গায়ে এক টুকরো রেশম জড়িয়ে আগুন লাগিয়ে দেখিস, রেশম পুড়বে না। কাঁচ না আরো কিছু!

তাই শুনে নগা কোত্থেকে এক বাক্স দেশলাই বের করে, বোকো-মামার রেশমি রুমাল ধরে টানাটানি করতে লাগল আর আমরা বাকিরা সবাই গোল হয়ে ওদের ঘিরে দাঁড়ালাম। বোকোমামা বিরক্ত হয়ে রুমালটি পকেটে পুরে, গরুটিকে দরজার ওপরের তাকে তুলে রেখে বলল—'জ্যাঠামোই করবি, নাকি গল্পটি শুনবি, তাই বল?'

নগা বললে—'ওমা, গল্প নাকি? এই যে বললে বিরাট ইতিহাস?'

'ঐ, ঐ একই হল, গল্প মানে সত্যি গল্প। তবে শোন্।'

নগা বললে—'আগে বল, কোথায় পেলে ওটাকে ?'

'পাব আবার কোথায় ? ওসব জিনিস কি আর কোথাও তৈরি হয় যে পাব ? দেখেছিস কখনো ওরকম আরেকটা ? উত্তরাধিকারসূত্রে ওটাকে পেয়েছি। আমার ঠাকুরদার বাড়ির চিলেকোঠায় পুরনো জিনিসের সঙ্গে ছিল।'

আমি বললাম—'আর ইতিহাসটাকে জানলে কি করে ? কাল তো মা বলেছিলেন যে—আচ্ছা, আচ্ছা, এই থামলাম, তুমি বল।'

বোকোমামা বলতে শুরু করল—'আমার ঠাকুরদার অবস্থা ভালো ছিল না। তিন ভাই একসঙ্গে থাকেন বলে চলে যেত ; তার ওপর ঠাকুরমার যা মেজাজ, বাড়ির চালে কাক-চিল পর্যন্ত বসতে ভয় পায়। ঠাকুরদা বেচারি তাঁর ভয়ে জুজু। একদিন পাড়ার পাশার আড্ডায় বড্ড রাত করে ফেলেছেন, তার ওপর খাজনার টাকা জমা দেবার কথা ছিল, ভুলে তো গেছেনই, উপরন্তু টাকাগুলোকেও বাজিতে হেরেছেন।'

আমার মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল—'কোত্থেকে জানলে এত কথা ?'

বোকোমামা আমার দিকে ফিরে বললে—'আমাদের বংশপরিচয়ে লেখা আছে। হল তো ? তারপর শোন। হয়তো মাঝরাতও পেরিয়ে গেছে, একটু আগেই খুব বৃষ্টি পড়েছে, তারার আলোতে খুব সাবধানে গুটি গুটি এগুচ্ছেন, এমন সময় কানে এল—গাঁ—ক্! বাঘ মনে করে আরেকটু হলেই ঠাকুরদা পগারের মধ্যে পড়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় চোখে পড়ল পগারের কিনারায়, এক হাঁটু চটচটে কাদায় ডুবে একটা হাড়-জিরজিরে গরু কাতর চোখে ওঁর দিকে তাকিয়ে আছে। ঠাকুরদার মনটা ছিল বড়ই দয়ালু, শরীরেও ছিল অসুরের মতো শক্তি, কাজকর্ম কিছু করতেন না তো, কাজেই সে শক্তির একটুও খরচ হয়নি। এবার নিমেষের মধ্যে মালকোঁচা মেরে, হাতের চেটোয় দু-পোঁচ থুথু মেখে নিয়ে, গরুর পেছন দিকে এমনি এক ঠেলা মারলেন যে, চু—ক্ একটা শব্দ করে গরুটা কাদা থেকে উঠে এসে রাস্তার মাঝখানে ছিটকে পড়ল। শীতে বেচারি ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, চোখে জল চিক্‌চিক্ করছে।'

'কি আর করবেন ঠাকুরদা, ওটাকে অমনভাবে ফেলে যেতে মন সরল না ; তাই আঁজলা আঁজলা পগারের জল তুলে যথাসাধ্য গায়ের কাদা ধুয়ে ফেলে, নিজের এণ্ডির চাদরটা দিয়ে ভালো করে সর্বাঙ্গ মুছে

দিলেন। এটা যে কত অসমসাহসিকতার কাজ, যারা আমার ঠাকুরদার ঠাকুমাকে চেনে না, তারা বুঝবে না।

'যাই হক, তারপর দু-মুঠো দুব্বো ঘাস ছিঁড়ে গরুটাকে খেতে দিয়ে ভয়ে ভয়ে ঠাকুরদা আবার বাড়িমুখো হলেন। ততক্ষণে মাথার ওপরকার তারাগুলো পশ্চিম দিকে বেশ খানিকটা ঢলে পড়েছে। আজ রাতে কপালে কি আছে কে জানে। অন্ধকার আমগাছের ছায়া দিয়ে আরো গজ পঞ্চাশেক এগিয়েছেন এমন সময় পেছনে শোনেন খপ্ খপ্ খপ্ খপ্! আঁৎকে উঠে ফিরে দেখেন—গরুটা করুণমুখে কাদা ভেঙেগ ভেঙেগ সঙেগ চলেছে। ঠেলা দিলেন, তাড়া দিলেন, এমন কি একটা কাঠি দিয়ে সপাসপ্ দু ঘা লাগিয়েও দিলেন, কিন্তু গরু গেল না। খালি দু চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল।'

'শেষটা ঠাকুরদা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—'নেহাৎই যাবি না যখন চল্ তাহলে, ছেলেপুলেগুলো একটু দুধ খেয়ে বাঁচুক। গরু এনেছি দেখে গিন্নীর রাগও খানিকটা পড়তে পারে। আ, আ, আ, তু, তু, তু,।'

'বাড়ি পেঁৗছে, সামনের দিক দিয়ে না ঢুকে ঠাকুরদা বাড়ির পেছনে রান্নার চালাঘরের দিকে গেলেন। সামনের ঘর দুটোতে তাঁর দাদা, মেজদা শুয়ে থাকেন, তাঁদের না চটানোই ভালো মনে হল। চালা ঘরের দরজার হুড়কোটাকে এক একটা লম্বা মানুষ ওপরের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে খুলে ফেলতে পারে, এটা ঠাকুরদা জানতেন। আজ রাতের মতো সেখানেই না হয় আশ্রয় নেওয়া যাবে। বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে, ভাবছেন —আহা যদি একগোছা টাকা আর একজোড়া একশো ভরির রুপোর তাগা গিন্নীর পায়ের কাছে ফেলে দিতে পারতাম, তা হলে গিন্নী আমাকে কত আদর করত! ওরে গরু এটা যদি করে দিতে পারতিস, তা হলে আমার কোনো ভাবনাই ছিল না। নইলে আজ এই খালি পেটে মাটিতে শোয়াই আমার কপালে আছে। এই অবধি বলেই তো ঠাকুরদার চক্ষু স্থির! ভাঁড়ার ঘরের দেওয়ালে ইয়া বড় সিঁদকাটা! তার মানে চোর ঢুকে কাঁঠাল কাঠের সিন্দুক থেকে তিন পুরুষের জমানো ভারি ভারি খাগড়াই কাসার বাসনগুলো পাচার করেছে। হায়! হায়! দামী জিনিসের মধ্যে ছিলতো শুধু ঐ! এবার তাও গেল।'

'এমন সময় গরুটার ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শুনে ফিরে দেখেন, উঠোনের
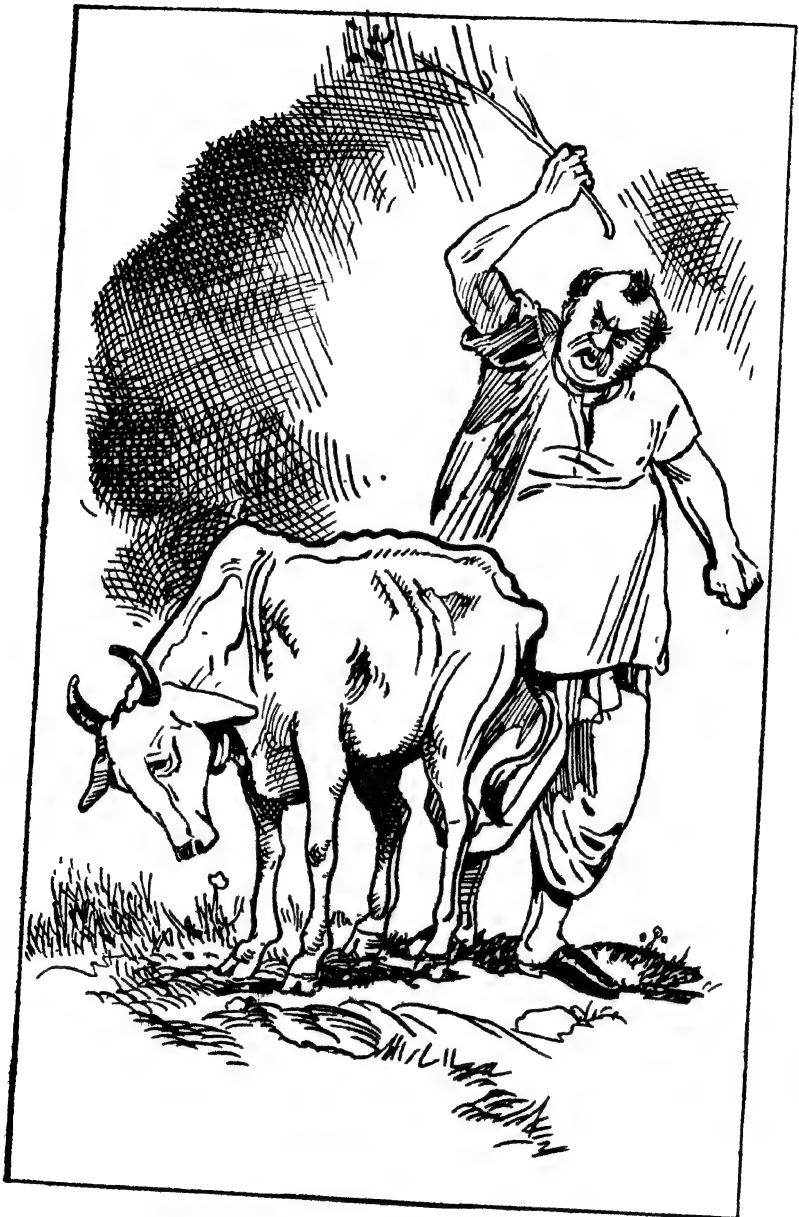
একটা কাঠি দিয়ে সপাসপ দু-ঘা লাগিয়েও দিলেন

কোনায় ভাতের ফেন ঝাড়বার গামলার আড়ালে মিটমিট করে একটা তেলের পিদিম জ্বলছে, তার সামনে মাটির ওপর পড়ে আছে এক তোড়া টাকা আর এক জোড়া রুপোর তাগা। চোররাই যে অন্য কোথাও থেকে এগুলো সরিয়ে এনে এখানে রেখে কাঁঠাল কাঠের সিন্দুক নিয়ে ব্যস্ত আছে, সে বিষয়ে ঠাকুরদার মনে কোনো সন্দেহই রইল না।'

'নিমেষের মধ্যে সেগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে, চালাঘরের সামনে দাঁড়িয়েই এমন বিকট চিৎকার জুড়ে দিলেন যে, প্রথমটা নিজের কানে যেতে নিজেরই পিলে চমকে উঠেছিল। তারপরেই বুঝলেন, প্রভুভক্ত গরুটাও সঙ্গে সঙ্গে চ্যাঁচাচ্ছে বলে ওরকম বীভৎস শোনাচ্ছে। আর যাবে কোথা, দেখতে দেখতে দা কুড়ুল নিয়ে বড়দা মেজদা তো বেরিয়ে এলেনই, লাঠি সোঁটা কাস্তে হাতে পাড়ার লোকেরাও এসে জুটল। তারি ফাঁকে তেলমাখা রোগা রোগা তিনটে লোক পাঁই পাঁই ছুট লাগাল। দু-একজন ধরতে চেষ্টা করল বটে কিন্তু চোরদের তেল চুকচুকে গা হাতের মধ্যে থেকে সুড়ৎ করে পিছলিয়ে বেরিয়ে গেল।'

'মোট কথা, চোর ধরা গেল না বটে কিন্তু শুধু যে নিজেদের বাসনের গোছা বেঁচে গেল তা নয়, সেই সঙ্গে রাশি রাশি চোরদের জিনিসও পাওয়া গেল, রুপোর পিলসুজ, পঞ্চপ্রদীপ এইসব। কে জানে কোত্থেকে এনেছে। দাদা মেজদারা অবিশ্যি তখুনি বলতে লাগলেন—ইস্, দেখেছ, বাবার পুজোর জিনিসগুলোও নিচ্ছিল, এত বড় আস্পর্ধা! এই বলে তাড়াতাড়ি সব কিছু সিন্দুকে তুলে ফেললেন, কিন্তু পাড়ার লোকের আর জানতে বাকি ছিল না যে, গত পঁচিশ বছর ধরে সিন্দুকের মধ্যে একটা ভাঙা লক্ষ্মীর ঝাঁপি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ঝাঁপিটাতে খালি একটা সিঁন্দুর মাখানো ফুটো পয়সা ছাড়া আর কিচ্ছু ছিল না। কিন্তু টাকার তোড়া আর তাগা কারো চোখে পড়েনি। ভাসুরদের সামনে একগলা ঘোমটা দিয়ে ঠাকুমা দাঁড়িয়ে ছিলেন। কোন সুযোগে তাঁর হাতে টাকা আর গয়না গুঁজে দিতেই নিঃশব্দে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরে সবাই চলে গেলে গরুটাকে রান্নাঘরে বন্ধ করে রেখে, ঘরে গিয়ে ঠাকুরদা দেখেন—আসন পেতে, ভাত বেড়ে, পাখা হাতে ঠাকুমা বসে আছেন। ঠাকুরদা ভাবলেন, এতদিন বাদে বোধ হয় তাঁর কপাল ফিরেছে।'

'পরদিন চোখে মুখে রোদ পড়াতে যখন ঘুম ভাঙল তখন কিন্তু ঠাকুমার অন্য চেহারা।—কোত্থেকে এই মড়াখেকো গরুটাকে জোটালে

বল দিকিনি ? হতচ্ছাড়ি রাতারাতি রান্নাঘরের খড়ের চালের আধখানা খেয়ে শেষ করেছে। ঐরকম একটা হাড়-জিরজিরে জানোয়ার পোষে কেউ ? ওর মালিক ওকে নিশ্চয় খেদিয়ে দিয়েছে পাছে বাড়িতে মরে, একটা অকল্যাণ ডেকে আনে। আর তুমি কিনা খাজনার টাকা দিয়ে তাই কিনে নিয়ে এলে ঘরে! পেছনের পায়ে আবার দেখছি একটা 'ন' লেখা রয়েছে, এবার দারোগা এসে হাতে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাক আর কি!'

'ঠাকুরদা অবিশ্যি শেষ কথাগুলো আর শোনেননি, তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সোজা রান্নাঘরে। কাল থেকেই কেমন সন্দেহ হচ্ছিল, তার ওপর পায়ে 'ন' লেখা শুনে একেবারে আঁৎকে উঠলেন। মুখ না ধুয়ে, জলখাবার না খেয়েই গরু নিয়ে নদীর ধারের আমবনে চলে গেলেন। সেখানে নির্জনে গরুটাকে আদর করে বললেন—'নন্দিনী, মা-রে, আমাকে একটা বড় দেখে ডিম ভরা ইলিশ মাছ পাইয়ে দে দিকিনি।' অমনি বলা নেই কওয়া নেই, মাঝ নদী থেকে দামু হাক দিল—'ও ছোটবাবু, ইলিশ মাছ নেবেন ? আজ বড় জোর জাল ফেলেছি, তাই এটাকে বামুনকে দেব বলে মনে ভেবেছি।' পাড়ে নেমে মাছটি দিয়ে দামু বললে—'কি ছিরির গোরু গো, কিনলেন নাকি ট্যাঁকের পয়সা খরচ করে ?' ঠাকুরদা হেসে বললেন—'দূর পাগল, এ গরু কি কেনে নাকি কেউ!' দামু বললে—'তা দানের জিনিসের দোষ ধরতে নেই। বেশ গরু।'

'দামু চলে গেলে গরুটার চারটে খুরে গড় করে, নিজের হাতে কচি কচি দুব্বোঘাস তুলে এনে খাওয়াতে লাগলেন ঠাকুরদা। তবে নিরবিচ্ছিন্ন সুখ বলে কিছু হয় না দুনিয়াতে। হিংসুটে পাড়ার লোকগুলো 'পিলসুজ পঞ্চপ্রদীপের কথা গিয়ে থানার দারোগার কাছে লাগাল, এমন কি পাশের গাঁয়ের জমিদারবাবুর গোমস্তা দারোগাকে সঙ্গে করে এনে তাঁদের কুলপুরোহিতকে দিয়ে পিলসুজ পঞ্চপ্রদীপ চিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। ব্যাপারটা আরো অনেক দূরে গড়াত নিশ্চয়ই যদি না অতগুলো সাক্ষী থাকত। তা ছাড়া তাগা পেয়ে চুপ করে থাকা দূরে থাকুক, গিন্নী অষ্টপ্রহর বায়না ধরলেন ঐরকম ডিজাইনের হাঁসুলিও চাই। ইলিশ মাছটা খেয়ে বাড়িসুদ্ধ সকলের পেটের অসুখ করল।'

'তবু গিন্নীর তাগাদায় অতিষ্ঠ হয়ে ঠাকুরদা পরদিন আমবনে গিয়ে

হাঁসুলি চেয়ে বসলেন। তোলা হাঁড়ির মতো মুখ করে গরুটা একবার তাকাল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর কাগের বাসায় খচ্‌মচ্‌ ঝটপট। ওপরে তাকিয়ে দেখেন, বাসার ধার দিয়ে হাঁসুলি একটুখানি ঝুলে রয়েছে। অগত্যা গাছে চড়ে সেটি উদ্ধার করতে হল। নামতে গিয়ে ডালসুদ্ধ ভেঙে পড়ে ডান হাতের কব্জিটা গেল মটকে, সর্বাঙ্গে ব্যথা। ট্যাকের মধ্যে হাঁসুলি আর বাঁ হাতে গরুর দড়ি নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ি আসবার সময় ঠাকুরদা ভাবলেন—সাধে কি নন্দিনীটাকে স্বর্গ থেকে তাড়িয়েছে! ইচ্ছে পূর্ণ করে বটে, মা, কিন্তু সঙ্গে একটা করে লেজুড় জোড়ে কেন? সে যে বড় বালাই!'

তবু মানতে হচ্ছে, গরু পেয়ে কপাল ওদের ফিরে গেছিল। আসল ব্যাপার কাউকে না বলে, ঠাকুরদা ঠাকুমাকে শুধু বলেছিলেন—'গরুটা বড় পয়, নিজেই ওটার যত্ন করব।' ঠাকুরদা গরুর নাওয়া খাওয়া দেখতে লাগলেন, কিন্তু যে হাড়-জিরজিরে সেই হাড়-জিরজিরে অথচ বকরাক্ষসের মতো খিদে। যা দেওয়া যায় চিবিয়ে গিলে বসে থাকে। বালিশ বিছানা শীতের কাপড়, কোনো বাছবিচার নেই। ঠাকুরদা অবিশ্যি আবার সবই নতুন চেয়ে নেয়, কিন্তু সঙ্গে থাকে একটা করে ল্যাজ। নতুন বিছানা এল শিষ্যবাড়ি থেকে, কিন্তু বালিশে একটা কাঁটা ছিল, সেটা বড়দার মাথায় ফুটে যায়-যায় অবস্থা। নতুন র‍্যাপার পাওয়া গেল লটারি জিতে, কিন্তু হিংসা করে ফটিকবাবু দু-বাড়ির মাঝখানে বেড়ার দরমাটা বন্ধ করে দিলেন। এখন হাটে যেতে সদর ঘুরে যেতে হয়। ফটিকবাবুর সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ!

'তারপর বড়মেয়ের ভালো বিয়ে ঠিক করে দিল গোরুটা। আজকাল আর পয়সাকড়ির ভাবনা নেই, ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল, গাঁশুদ্ধ সবাই ধন্য-ধন্য করল, খাসা বর, ভালো ঘর। খোস-মেজাজে ঠাকুরদা তাঁর নিজের বিয়েতে যৌতুক পাওয়া সোনারপুরের খামারটি জামাইকে দান করে দিলেন। এই খামার কিনবার জন্যে ঐ ফটিকবাবুই কি কম ধরাধরি করেছে। তার মুখের ওপর বলে দিয়েছিলেন ঠাকুরদা যে, বিলিয়ে দেবেন তবু ওকে দেবেন না। বিয়ের পরদিন জানতে পারলেন—বরটি আর কেউ নয়, ঐ ফটিকেরই ভাগ্নে এবং ফটিকই তার গার্জেন! অর্থাৎ তাকে দেওয়া মানেই ফটিককে দেওয়া।'

'একটা ছেলে ছিল ঠাকুরদার, তার বৌটি বড় লক্ষ্মী, কিন্তু ছেলেটা

একটা লক্ষ্মীছাড়া, কাজকর্ম করে না, সারাদিন আড্ডা। গরুর পায়ে ফুলচন্দন দিয়ে ঠাকুরদা ছেলের মতিগতি ফিরিয়ে একটা চাকরি পাইয়ে দিলেন। অমনি ছেলে গেল শুধরে, কিন্তু বৌয়ের রোয়াবের চোটে বাড়িতে কেউ টিকতে পারে না। গিন্নী পর্যন্ত তার সঙ্গে পেরে ওঠেন না।'

'অগত্যা গরুকে বলে ছেলেকে তমলুকে বদলি করালেন ঠাকুরদা। অমনি নিজে পড়লেন ম্যালেরিয়ায়, জমিজমা কে দেখে তার ঠিক নেই; বলা বাহুল্য, এর আগেই গরুর সাহায্যে ভাইদের কাছ থেকে আলাদা হয়েছেন। এদিকে পয়সাকড়ি যত বাড়ে সঙ্গে সঙ্গে ঝামেলাও বাড়ে পাঁচগুণো। তিনতলা বাড়ি হল বটে, কিন্তু চোরের ভয়ে তার সব জানলায় শিক দেওয়া, বড় ফটকে পাহারাওয়ালা, বাগানে চৌকিদার, বাড়ি থেকে একটু বেরোবার জো নেই। তাছাড়া বড়লোকদের সঙ্গে এখন মেলামেশা, অথচ জামা গায়ে দিলেই ঠাকুরদার গা কুটকুট করে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হল, পাড়ার পাশার আড্ডাটি ছাড়তে হয়েছে। এমন কি সে পাড়া থেকেই উঠে নতুন রেল স্টেশনের কাছে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ির পাশে জমি কিনে বাড়ি করতে হয়েছে! পয়মন্ত গরুটির জন্যে পাকা গোয়াল হয়েছে, কিন্তু তার হাড়-জিরজিরে চেহারাটি বদলায়নি, উপরন্তু বন-বাদাড় পুকুর পগারের অভাবে আর সম্ভবতঃ নিত্যি ফরমায়েস শুনে শুনে মেজাজটি হয়ে উঠেছে খিটখিটে। বুদ্ধি করে তার সেবাযত্নের ভার ঠাকুরদা বরাবর নিজের হাতেই রেখেছেন; তাঁর কান কামড়ে, পা মাড়িয়ে, গুঁতো মেরে, তাঁর ওপর রোজ সে রাগ ঝাড়ে। আজকাল তার কাছে কিছু চাইতেই ভয় করে। চাইলেই পাওয়া যায় কিন্তু ফ্যাকড়া সুদ্ধু নিতে হয়। এমন কি মাঝে মাঝে ঠাকুরদার মনে হয়, গরুটাকে তার আদি বাসস্থান অর্থাৎ স্বর্গে পাঠাবার কোনো ব্যবস্থা করা যায় না? মানে জ্যান্ত অবস্থায়। তাই বলে তো আর—যাকগে সে কথা।'

'এত দুঃখের ওপর ফটিকবাবুকে বেয়াই বলে ডাকতে হচ্ছে, তাঁকে চা জলখাবার দিতে হচ্ছে, গিন্নীর কাছে তাঁর বেজায় খাতির, এ বাড়ির সব ব্যবস্থা একরকম তাঁর কথামতোই হয়।'

'একদিন সন্ধ্যেবেলায় পাশার আড্ডার বন্ধুদের জন্যে আর সেখানকার ধামাভরা গরম মুড়ির সঙ্গে তেলেভাজার জন্যে প্রাণটা যখন আঁকুপাঁকু করছে, ঠিক সেই সময় হতভাগ্য ফটিক এসে বললে, 'সুখবর আছে,

বেয়াই। একজালে নিজেই কত পঞ্চায়েতের তাড়া খেয়েছি, কিন্তু এখন তোমার মতো একজন গণ্যমান্য লোক গ্রামের পঞ্চায়েতে না বসলে কি ভালো দেখায়? তাই সেই ব্যবস্থাই করে এলাম। কি বলেন, বেয়ান?'

'অমনি ঠাকুরমাও এক গাল হেসে বললেন—'বা, বেশ হয়েছে, সারাটা সন্ধ্যেই বাবু সেখানে আটকা থাকবেন তো? এই সুযোগে ওঁকে দিয়ে গ্রামের তাসপাশার আড্ডাগুলোও তুলিয়ে দিতে হবে।'

'এই অবধি শুনে ঠাকুরদা সটাং গোয়ালঘরে গিয়ে নন্দিনীর কান মলে, ল্যাজ মুচড়ে বললেন, আর তো সহ্য হয় না মা। এক্ষুণি তুই ফটিকের হ।' তাই শুনে রেগেমেগে যেই না গরুটা অ্যাটাক করবার জন্যে চার পা এক জায়গায় জড়ো করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ভু—স্ করে নন্দিনী ডিস্যাপিয়ার্ড। তার বদলে ঠাকুরদা দেখেন, হাতের মুঠোর মধ্যে অবিকল সেই গরু, মায় পেছনে 'ন' লেখাটাসুদ্ধু। এই নে, বিশ্বাস না হয়, দেখতে পারিস।'

গল্প শেষ করে বোকোমামা রেশমি রুমালটা দিয়ে মুখ হাত ঝাড়তে লাগল। গরু হাতে নিয়ে নগা বললে—'তা গোরুর অত রাগ কিসের শুনি?'

বোকোমামা হাসল—'কি আশ্চর্য, রাগ হবে না? ঠাকুরদা চাইলেন গোরুটা ফটিকবাবুর হক—হয়ে তাঁকেও খুব জ্বালাক। আর নন্দিনী বুঝল—তাকে স্ফটিকের তৈরি হতে হবে, কচি দুব্বো খাওয়া ঘুচবে! রাগ হবে না, বলিস কি?'

ঠিক সেই সময় ছোটমাসি ছুটে এসে নগার হাত থেকে গরু ছিনিয়ে গালে ঠাস-ঠাস করে গোটা দুই চড় কষিয়ে বললে—'ফের আমার জিনিসে হাত দিয়েছিস কি দেখবি মজা। কতকালের গরু, ঠাকুমা নিজের হাতে আমাকে দিয়েছিলেন, কলেজ স্ট্রীট থেকে কত কষ্ট করে আমার নাম নন্দিনীর ন লেখালুম, আর সেই গরুকে কিনা হতচ্ছাড়া এক্ষুণি হাত থেকে ফেলে নয়-ছয় করে দেবে!'

নন্দিনীর 'ন' শুনে আমরা সবাই থ। ওদিকে চড় খেয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে নগা বললে—'চাই না তোমার পচা গরু! যাক ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে, আমি খুব খুসি হই।'

এই না বলে ছোটমাসির হাতের গরুকে যেই না সামান্য একটু ঠেলে দিয়েছে, অমনি হাত ফসকে শানের মেঝেতে গরু পড়ে খান-খান! আর

নগার পিঠেও বেদম জোরে গুমগুম !

কাষ্ঠ হেসে বোকোমামা বললে—'হলতো ? বলিনি পেছনে ফ্যাকড়া থাকে।'

পরীদের দেশে

দাদু ডেকে বললেন—'ওরে টুনু মিনু নেপো ধেপো ইলু বিলু শোন্। পরীদের দেশে গেছিস্ কখনো ?'

শুনে তারা তো হেসেই খুন ! পরীদের দেশ আবার হয় নাকি ? ও তো ঠাকুমাদের বানানো গল্প !

দাদু বিরক্ত হয়ে বললেন—'তবে কি আমার ঠাকুরদার বাড়ির চিলেকোঠার মস্ত সিন্দুকটাও ঠাকুমাদের বানানো গল্প বলতে চাস্ ? যাঃ ! তোদের আর কোনো গল্পই বলব না !'

ওরা অমনি তাঁকে ঘিরে ধরল।

'না, দাদু, না ! বলতেই হবে তোমার ঠাকুরদার বাড়ির সেই চিলেকোঠার সিন্দুকের কথা !'

দাদু তো তাই চান। বললেন—'শোন্ তবে।'

'ঠাকুরদার বাড়ির ছাদের ওপর চিলেকোঠার ঘরে ছিল কবেকার কার তৈরি করানো সিন্দুক—কে জানে ! এক-মানুষ উঁচু, আলমারির মতো দাঁড় করানো, কাঁঠালকাঠের তৈরি এক সিন্দুক। তার দরজার ওপর লাল রং দিয়ে লক্ষ্মীঠাকরুণের প্যাঁচা আঁকা, তার নিচে সোনালী রং দিয়ে ছোট একটি দরজা আঁকা, তার মাঝখানে আবার ছোট্ট একটা চাবির ছ্যাঁদাও আঁকা ছিল।'

'যখন ছোট ছিলাম, রোজ অবাক হয়ে দেখতাম আর ভাবতাম আঁকা চাবির ছ্যাঁদার চারদিকে চাবি ঘুরানোর দাগ কেন ?'

'সত্যিকার চাবির ছ্যাঁদায় চাবি ঢুকিয়েও ও সিন্দুক কেউ খোলে না, তবে আবার আঁকা ছ্যাঁদায় চাবির দাগ পড়ে কি করে ?'

'ঠাকুমা বলতেন, ষাট ষাট, চুপ চুপ, ও কথা মুখেও আনিস নে ! তোর ঠাকুরদার বাবার মানত করা সিন্দুক, ওতে চাবি লাগাতে নেই !

মাথা ঠেকিয়ে নমঃ কর এক্ষুণি !'

'আমিও তাই করতাম, আর আড়চোখে চেয়ে দেখতাম, আঁকা ছ্যাঁদার চারদিকে চাবির দাগ !'

সন্ধ্যেবেলায় পণ্ডিতমশাই সংস্কৃত পড়াতে আসতেন। তেলের লম্পের আলোতে অং-বং পড়া, সে যে কি কষ্ট তা আর তোরা কি বুঝবি ! আবার শব্দরূপ মুখস্থ না হলে— বাপ্‌রে, সে কি কান প্যাঁচানোর ধুম !'

'একদিন পড়া তৈরি করতে ভুলে গেছি। সন্ধ্যেবেলায় যেই না দূর থেকে সদরের উঠোনে পণ্ডিতমশাইয়ের খড়মের শব্দ শুনেছি অমনি দৌড়ে সিঁড়ি ডিঙিয়ে একেবারে চিলেকোঠায় !'

'ঢুকেই দরজাটাকে ভেতর থেকে খিল তুলে দিয়ে, ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে, হাঁপাতে লেগেছি। চারদিক থমথম করছে, চুপচাপ, শুধু নিজের বুকের ধুক্‌পুক্ শুনতে পাচ্ছি, আর দূরে কোথায় একটা খোঁজ-খোঁজ ধর-ধর শব্দ !'

'যদি এখানে এসে দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে ? তবেই তো পুরনো দরজার খিল খসে পড়বে ! ইদিক-উদিক চাইতেই হঠাৎ দেখি—কালো সিন্দুকের আঁকা দরজায় ছোট্ট একটা সোনালী চাবি ঝুলছে !'

'আমি তো অবাক ! আঁকা দরজার ছ্যাঁদায় কে আবার চাবি এঁকে দিল ! এ ঘরে তো আমি ছাড়া বড় একটা কেউ আসেই না ! আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে হাত দিতেই চমকে উঠলাম। আঁকা তো নয়, সত্যিকার চাবি—ঘোরাতেই অমনি খুট্ করে খুলে গেল। আমি তো প্রায় মূর্চ্ছো যাই আর কি !'

'তারি মধ্যে কানে এল ঘরের বাইরে সিঁড়ি দিয়ে ধুপধাপ করে কারা ওপরে উঠে আসছে। আর কথাটি না বলে চাবি ধরে টেনে আঁকা দরজাটি খুলে ফেলে, ভেতরে সেঁদিয়ে গেলাম।'

'কি রে টুনু মিনু নেলো ধেলো ইলু বিলু, হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছিস্ যে বড় ? বলছি না, আঁকা দরজাটা টেনে খুলে ফেলে, ভেতরে ঢুকে, দরজাটা আবার বন্ধ করে, ঐ সোনালী চাবিটা দিয়েই ভেতর থেকে এঁটে দিলাম।'

'সেখানে ফুটফুট করছে আলো। সেই আলোতে চেয়ে দেখি হাতের চাবিটা কেমন যেন চেনা চেনা। মাথার ওপর ছোট্ট একটা হাতী বসানো, শুঁড়টা একটু বাঁকা, এইতো আমার মা-র মিনে করা

হাতে করে নিয়ে এল কত ছাতা, টর্চ, পেনসিল·

গয়নার বাক্সর সেই হারানো চাবিটা। সেই যেটাকে কোথায় রেখেছিলাম ভুলে গেছলাম, এই তো দিব্যি এখানে আঁকা দরজায় লাগানো ছিল! অথচ মা পয়সা খরচ করে নতুন চাবি করিয়ে রেখেছেন।'

'অমনি চারদিক থেকে দলে দলে সব ছেলেমেয়েরা এসে হাজির। কোন কালে কার সঙ্গে খেলা করেছি, কার সঙ্গে পড়েছি, তাদের নাম পর্যন্ত ভুলে গেছি। তারাই এখন আমাকে দেখে ছুটতে ছুটতে এল। খুসিতে কেমন সবাই ডগমগ!'

'হাতে করে নিয়ে এল কত ছাতা, টর্চ, পেনসিল, বই, পেনসিল-কাটা-কল, একটা ইস্কুলের ব্যাগ অবধি! সব আমার হাতে গুঁজে দিতে চায়! আমি তো লজ্জায় মরি। এত জিনিস কারো কাছ থেকে নেওয়া যায় কখনো! ওরা বলে কি না—না না এ সব তোমারি জিনিস, এখানে ওখানে ভুলে ফেলে এসেছ, দেখ, চিনতে পার কি না, এই দেখ তোমার নাম লেখা!'

'তখন চারদিকে চেয়ে দেখি জায়গাটাও তো আমার চেনা জায়গা। এই তো এখানে ন্যাসপাতি গাছের তলায় ছোটবেলায় কত খেলা করেছি। এই তো গাছের গায়ে ছোট্ট কোটর থেকে সেই আমাদের চেনা কাঠবেড়াল মুখ বাড়াচ্ছে। সব ভুলে গেছলাম।

এ কোথায় এলাম, এ যে সবই চেনা, এ সবই যে আমার ছিল! কানের কাছে কে বললে—'চেরতা খেতে ভুলে গেলে চলবে কেন, এই নাও ধর।'

'চেয়ে দেখি সেই আমার ধাই মা! আরে, ধাইমার মুখটাও যে ভুলে গেছলাম। ধাইমার পায়ে পায়ে আমার ছোটবেলাকার উনুনমুখো সাদা বেড়াল ছানাও এসে উপস্থিত। ধাইমা তাকে সরিয়ে দিয়ে বললে—'ওসব এখন নয়, এখন বস, পড়া করতে ভুলে গেছ না? এই নাও ধর বই, সমস্কৃত শব্দ মুখস্থ করতে হবে না? ভুলে যেও না, এটা পরীদের দেশ, এখানে ওসব চালাকি চলবে না! আমি তো অবাক! পরীদের দেশ? এই নাকি সেই পরীদের দেশ, যেখানে যত রাজ্যের ভুলে-যাওয়া জিনিস সব পাওয়া যায়?'

'আহা ঐ তো আমার হারানো মার্বেলের ঢিবি, ন্যাসপাতি গাছের নিচে ছোট একটি পাহাড় হয়ে আছে! ঐ তো আমার খেলার বন্দুকটি, ঐ

যে আমার বনাত-মোড়া জলের বোতল ; ও দুটিকে ক-বছর আগে চড়িভাতি করতে গিয়ে কাদের বাগান-বাড়িতে যেন ফেলে এসেছিলাম, তার ঠিকানাও ভুলে গেছি !'

'এই তবে পরীদের দেশ ? আহা, কি ভালো ! আর যে এ সব দেখতে পাব তা ভাবি নি ! ঐ তো আমার বুড়ি দিদিমারা তিনজনই এখানে। যখন পড়তে শিখিনি, কত পরীর গল্পই না বলেছেন আমাকে ! আহা, অমন মানুষদেরো ভুলে গেছলাম ! এরা যে ডানাওয়ালা পরীদের চেয়েও অনেক ভালো, অনেক ভালো। দু-হাত বাড়িয়ে সবাইকে একসঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করতে লাগলাম।'

দাদু এই অবধি বলে উঠে পড়লেন।—'আহা, অমন দেশ ছেড়েও লোকে ফিরে আসে ! ওরে টুনু মিনু নেপো ধেপো ইলু বিলু—তোরা তো নিত্যি সব ভুলে যাস ; চল্ চল্, আমার সাথে পরীর দেশে চল্ ! দেখবি, সেখানে তোদের জন্যে আলাদিনের ভাঁড়ার ঘর অপেক্ষা করে রয়েছে !'

'আর দ্যাখ্, সঙ্গে কিছু টিপিন নিয়ে নিস্। ওখানে বড় খিদে পায়। খাবারের তো কোনোই ব্যবস্থা দেখলাম না সেখানে। থাকবে কোত্থেকে ? খেতে যে কেউ ভোলেনা ভুলে-যাওয়ার দেশে, খাবার কোথা পাবে গো ! তাই তো সেবার তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। চল্ চল্ —টিপিন নিয়ে চল্ রে—।'

সাগরপারে

ছোটবেলায় একবার পুরীতে গিয়ে একেবারে সমুদ্রের ধারে একটা ছোট বাড়িতে ছিলাম। সারারাত ঘুমোয় কার সাধ্য। গুম-গুম্ করে বিরাট ঢেউগুলি অনবরত বালির ওপর আচড়ে ভাঙছে, আবার শোঁ শোঁ শব্দ করে জল সরে যাচ্ছে।

জানলা দিয়ে চেয়ে দেখতাম, ভাঁটার সময় জলের ধারে ধারে ফসফরাস কেমন চিকচিক করছে, বালির ওপর লম্বা ঠ্যাং সাদা কাঁকড়াগুলো দৌড়োদৌড়ি করছে, ওদের ওপর জলের ছিঁটে পড়ছে, আর ওদের গা-ও চিকচিক করে উঠছে। দূর থেকে কেউ আসছে, কি করে যেন

টের পায় কাঁকড়ারা, আর অমনি সে-লোকটা দেখা দেবার আগেই, যে যার গর্তে লুকোয়। যারা গর্তের ভেতর বসে বালি কুরে কুরে বাইরে ফেলছিল, তারাও সব চুপ করে যায়। তারপর লোকটি চলে গেলে আবার হাজার হাজার কাঁকড়া বেরিয়ে এসে সামনের দিকে না এগিয়ে পাশ বাগে ছুটোছুটি করতে থাকে। মানুষকে ওদের ভারি ভয়।

তা হবে না-ই বা কেন ? কতদিন সকালের দিকে দেখতাম, কাঁকড়া ধরে, দাঁড়ায় দাঁড়ায় জড়িয়ে মালা গেঁথে নুলিয়ারা বাড়ি বাড়ি বেচছে। ঐ দিয়ে নাকি খাসা ঝাল চচ্চড়ি হয়, তাই বালি খুঁড়ে বাসার ভেতর থেকে ওদের টেনে বের করে মালা গাঁথা হয়।

ঐ নুলিয়ারাও একরকম বলতে গেলে সমুদ্রের জীব। কি চেহারা এক এক জনার! কালো কুচকুচে যেন কষ্টিপাথর দিয়ে খোদাই করা শরীর। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে, ইঁটের মতো শক্ত দেহ হয়ে গেছে ওদের।

শুনেছিলাম সমুদ্রের ওপারে বহুদূরের সব দ্বীপপুঞ্জ থেকে এসেছে ওরা। লম্বা লম্বা নৌকো চেপে, প্রাণ হাতে করে এসে, সব এই বিদেশ বিভুঁয়ে থেকে গেছে।

জলের ধারে ওদের গাঁ-ও দেখেছিলাম। বাড়িগুলির চারপাশে ছোট ছোট ঢিবি সব মন্দিরের মতো ছড়ানো আছে। সেখানে ওদের দেবতাকে ওরা পুজো দেয়। সমুদ্রে যারা গেছে, তারা যেন আবার ফিরে আসে। প্রকৃতির একেবারে বুকের মধ্যে যারা বাস করে তারা জানে যে, বড় বিপদ এলে, আর মানুষের বুদ্ধি বা শক্তিতে কুলোয় না। তাই ওদের মেয়েরা নিত্যি সেখানে পুজো পাঠায়।

ওদের চোখগুলো যেন সদাই সমুদ্রের ওপারে কি খুঁজছে, এই রকম একটা দূর-দেখা ভাব। জলকে ওরা ভয় করে না। এই জলেই হয়তো ওদের বাপঠাকুরদারা প্রাণ দিয়েছে, তবু জলই ওদের খাওয়ায় পরায়, ওদের প্রাণের বন্ধু।

একবার দেখলাম, সন্ধ্যের দিকে জোয়ার এসেছে। বাতাস বইছে, আর তিনতলা সমান ঢেউগুলো তীরের ওপর আছাড়ি-পিছাড়ি করছে। তারই মধ্যে নুলিয়াদের একটি ছোট ছেলে আমাদের বললে জলের মধ্যে একটি পয়সা ছুঁড়ে দিতে। যেই না দেওয়া, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সে-ও সেই তুমুল জলের রাশির মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। আমাদের বুক ঢিপ

এক মিনিটের মধ্যে পয়সা হাতে নিয়ে···

টিপ্ করতে লাগল। কিন্তু এক মিনিটের মধ্যে পয়সা হাতে নিয়ে ছেলেটা জল থেকে উঠে এল। আরও পয়সা দিলাম ওকে আমরা, বার বার করে বললাম, প্রাণ নিয়ে অমন খেলা যেন আর কখনো না করে। হাসল ছেলেটি। আর তখুনি অন্যদের কাছে গিয়ে পেড়াপিড়ি করতে লাগল যেন জলে পয়সা ছুঁড়ে দেয়। জলের ছেলের জলকে ভয় করলে কি আর চলে।

ভোরে ওরা নৌকো নিয়ে বেরুতো। কাঠ দিয়ে তৈরি লম্বা লম্বা নৌকো, অন্য সময় উপুড় করে বালির ওপর ফেলে রাখত, তলাটাও যাতে রোদ খেতে পারে। তার ছায়ায় বসে দুপুরে ওরা মাছ ধরার জাল বুনত, ছোট্ট একটা বাঁকা মতো মোটা কাঁটা দিয়ে সরু দড়ির ফাঁস জড়িয়ে জড়িয়ে দেখতে দেখতে একখানি জাল বুনে ফেলত।

সকালে উঠে ওদের নৌকো বেরুনো দেখতাম। সে এক ব্যাপার। ঢেউ যখন ডাঙা থেকে মাঝ সমুদ্রের দিকে যায়, সে সময় তার মাথায় চেপে বেরিয়ে যেতে হয়। নইলে মাঝখানকার নিচু জায়গাতে পড়লে আবার ঢেউয়ের সঙ্গে বালির ওপর ফিরে আসতে হয়। ভাঁটা ধরতে পারলে আর কোন ভয় থাকে না; দেখতে দেখতে দিগন্ত ছাড়িয়ে নৌকোগুলি দৃষ্টির বাইরে চলে যায়।

বেলা বারোটা একটার সময় দেখতাম, ওরা মাছ নিয়ে ফিরেছে। বালির ওপর নৌকো বোঝাই মাছ ঢেলে দিত। কতক চেনা জানা মাছ, কত রকম বিলিতি নাম তাদের। ছোট ছোট মিষ্টি 'সামন', ঝকঝকে রুপোলী 'ম্যাকরেল', বিশালকায় তলোয়ার মাছ। তাকে দেখে প্রাণটা কেমন করে। পুরু চামড়ায় মোড়া প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে বালির ওপর পড়ে থাকে, হাপরের মতো বুকটা ওঠে পড়ে, আর চোখে সেকি নিদারুণ বেদনা।

আমাদের নুলিয়া আড়াইয়া বলত—'বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হয় না ওর দিকে, মুখের ভাত ছাই-এর মতো লাগবে। দুঃখ কি শুধু মানুষদেরই ভাবো তোমরা?'

চেনা মাছের সঙ্গে অদ্ভুত সব রং করা, শুঁড় বের করা জন্তু নিয়ে আসত আড়াইয়া। বড় ঢেউ চলে গেলে পর বালির ওপর থেকে কুড়িয়ে আনত চার ইঞ্চি লম্বা সমুদ্রের ঘোড়া। তার ঠ্যাং খুর কিছু নেই, আছে শুধু ঘোড়ার মতো একটা মাথা আর পাকানো একটা ল্যাজ। আর

আনত তারা-মাছ, তাকে হঠাৎ দেখে জানোয়ার বলেই মনে হয় না। হাতে নিতেই মাঝে মাঝে সমুদ্রের ঘোড়া, তারা-মাছ কিলবিলিয়ে উঠত। আমরা বলতাম, 'আহা, জ্যান্ত আছে, আড়াইয়া। দাও, আবার জলে ফেলে দাও, নইলে এখুনি মরে যাবে।'

আড়াইয়া হাসত আর বলত—'ওর নাম লোকসানের খাতায় লেখা হয়ে গেছে, ও আর বাঁচবে না। সমুদ্রে ফেলে দিলেও ঢেউগুলো এখুনি ওদের আবার বালির ওপর আছড়ে ফেলবে। গভীর জলের জানোয়ার কি কখনো হাঁটু জলে বাঁচে?'

সত্যি বাঁচে না। একদিন একটা সমুদ্রের সাপ দেখেছিলাম, বড় ঢেউয়ের সঙ্গে এসে বালির ওপর অনেকটা তফাতে পড়ে আছে। হলুদ আর ঘোর সবুজ ডোরা-কাটা, পাঁচ-ছয় হাত হয়তো লম্বায়। চোখের ওপরে শিং-এর মতো একটু উঁচু মতন। নড়তে পারছে না বালির ওপর। নুলিয়ারা বাঁশের লাঠিতে ঝুলিয়ে তিন চার জনে মিলে ধরে নিয়ে গেল।

তাই দেখে মনটা খারাপ লাগছিল। আড়াইয়া এসে কাছে বসে বলল—'সাপটার জন্য দুঃখু হচ্ছে বুঝি? জলের ধারে যদি থাকতে তাহলে জানতে, যা আসে তা নিয়ে নিতে হয়, যা ভেসে গেল, তার জন্য দুঃখ করতে হয় না।'

'আমার বাবার নৌকো একবার জলে ভেসে গেছিল। অনেকদিন মাছ পড়েনি ভালো, বাড়িতে খাবার কষ্ট। আমার ঠাকুমা আর মা তাই নিয়ে খুব রাগারাগি করেছিল। তাই আমার বাবা আর কাকা একদিন সকালে নৌকো নিয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। আর ফেরেনি।'

'মা আর ঠাকুমা কেঁদে কেঁদে সারা, কিন্তু ঠাকুমার ছোট ভাই খালি বলে, 'আমি হাত গুণে দেখেছি, ওদের ছাই এখানকার মাটিতে মিশবে।' আমি তখন খুব ছোট, ঠাকুমা আর মা আর ঠাকুমার ঐ ভাই কত কষ্টে আমায় মানুষ করতে লাগল। এমনি করে এক বছর প্রায় কেটে গেল। একদিন খুব ঝড় উঠল, সে ঢেউ তোমরা ভাবতেও পারো না। বালি ডিঙিয়ে ওপরের ঐ সব সরকারী রাস্তা পর্যন্ত ঢেউয়ের মাথার ফেনা ছিটকে পড়তে লাগল।'

'সারারাত ঝড় চলল, ভোরের বেলায় সব ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আমি বালির ওপর কাকার জলের বোতল কুড়িয়ে পেলাম। তার মধ্যে বাবার হাতের মাদুলি ভরা। তাই দেখে মা, ঠাকুমা এমনি কান্নাকাটি জুড়ে দিল যে,

বুড়ো মামা আর তার কজন মজবুত বন্ধু দু-তিনটে নৌকো নিয়ে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল। ঠিক দশদিন পরে বাবা কাকাকে নিয়ে ফিরে এল।'

'আমরা আড়াইয়াকে ঘিরে ধরতুম—'কোথায় গেছিল বল আড়াইয়া, এক বছর কোথায় ছিল?'

'কাকা বলে, জলের নিচে যে অনেক সময় লুকোনো টান থাকে, তারি মধ্যে নাকি ওরা পড়ে গিয়েছিল। দু-দিন ভেসে, না খেয়ে, রোদে পুড়ে, ঢেউয়ে ভিজে, সমুদ্রের মাঝখানে একটা পাথুরে দ্বীপের ওপর আছড়ে পড়ল ওদের নৌকো। তলা ভেঙে গেল, আর ভাসে না। দ্বীপে একটু তক্তা নেই যে জুড়ে নেবে। আছে শুধু ঝোপ-ঝাপ আর হাজার হাজার পাখির বাসা। ঝোপঝাপে অচেনা সব ফল, রাঙাআলুর মতো একরকম জিনিস, একটা মিষ্টি জলের ঝরণা, পাথরের ফাঁকে ছোট ছোট নোনা জলের পুকুর, তাতে নানা রকম মাছ।'

'না খেয়ে মরবার ভয় ছিল না, কিন্তু মানুষের মুখ না দেখে তারা হাঁপিয়ে উঠছিল। তখন একদিন কাকা বলেন, 'এই স্রোত তো উত্তর দিকে যায়; জাহাজের খালাসিদের কাছে শুনেছি, বোতলের মধ্যে চিঠি পুরে সাহেবরা নাকি ভাসিয়ে দিত। এক হাজার মাইল দূরেও সে-সব বোতল কত সময় ভেসে উঠত।' ওরা লিখতে পড়তে জানে না। কাগজ নেই, কলম নেই; তাই কাকার জলের বোতলে বাবার মাদুলি পুরে ভাসিয়ে দিল। সেই বোতল ছ'মাস বাদে আমি কুড়িয়ে পেলাম।'

'সমুদ্রের মাঝে মাঝে ঐ রকম পাথুরে দ্বীপ আছে এ দিকে, জাহাজগুলো খুব সাবধানে তাদের বাঁচিয়ে চলে। মামার জেদ চেপে গিয়েছিল, হাত গুণে সে দেখছে, বাবা-কাকা ঘরে মরবে। একটার পর একটা—দশটা দ্বীপ খুঁজে বাবা-কাকাকে ঘরে ফিরিয়ে আনল। মরেও যেমন লোকে, আবার বাঁচেও তেমনি।'

আড়াইয়া তার গলায় বাঁধা কালো সুতোয় গাঁথা একটা পলা আর একটা মুক্তো দেখিয়ে বললে—'এটা আসল মুক্তো, ঐ দ্বীপে ঝিনুকের মধ্যে বাবা পেয়েছিল। এদিকে নাকি মুক্তোর চাষ হয় না, তাই ওরা দলবল নিয়ে পরে দ্বীপগুলোতে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছিল, কিন্তু আর পায়নি। কাকা বলে ঐ দ্বীপটাকেই আর ওরা খুঁজে পায়নি। অমনি নাকি সাগর থেকে মাথা তুলে ওঠে, আবার কোনদিন টুপ করে সাগরের বুকে তলিয়ে যায়।'

গল্প শুনতে শুনতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। আড়াইয়া বললে—'চল তোমাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি। আজ তোমাদের মাংস রান্না হচ্ছে, দেখে এসেছি, দেখি মা যদি আমাকেও দেয়।'

বড়লোক হবার নিয়ম

গত বছর ফুটবল সীজনের শেষের দিকে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের খেলা। টিকিট পকেটে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। ছোট্‌কা এলে এক সঙ্গে ঢুকব, এমন সময় একজন অচেনা লোক এসে কানে কানে বলল—'বড়লোক হতে চাও?'

বাড়িতে সর্বদাই সবাই বলে—অচেনা লোককে বিশ্বাস করতে হয় না, তাই মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। লোকটাও অমনি ফস্‌ করে ঘুরে ওপাশে গিয়ে ও কানে বলল—'বড়লোক হতে চাও না, সে আবার একটা কথা হল নাকি? নিজের মটর চাও না, যেখানে খুসি সেখানে যাবে। হাতঘড়ি, পার্কার কলম-পেনসিলের সেট, ট্র্যানজিস্টর রেডিও, রঙিন ছবি তোলার ক্যামেরা, বাইনোকুলার—তবে কি এসবও চাও না নাকি?'

আমি বললাম—'না।'

লোকটা অবাক হয়ে গেল। 'না, না আরো কিছু, খুব চাও। বড় বড় কুমীরের চামড়ার স্যুটকেস বোঝাই ভালো ভালো কাপড়-চোপড় থাকবে; জুতোই থাকবে সাত জোড়া' এই বলে আমার পুরনো জুতো জোড়ার দিকে একবার তাকিয়ে নিল। আমি পা সরালাম। তাতে সে বলল—'কেমন শীতের সময় সুইটজারল্যাণ্ডে যাবে, পায়ে লম্বা লম্বা স্কি বেঁধে বাঁইবাঁই করে পাহাড়ের গা বেয়ে নামবে; পাহাড়ের ছাগলরা হাঁ করে তাকিয়ে দেখবে। তারপর নিচে হোটেলের গরম ঘরে লাল, নীল, হলদে, সবুজ চকড়াবকড়া মোটা সোয়েটার পরে গরম কফি আর হরিণের মাংসের প্যাটি খাবে—চাও না এসব?'

আমি বললাম—'না। ঠাণ্ডা লাগলে আমার সর্দি হয়।'

সে দুঃখিত হয়ে বলতে লাগল—'শীতের সময় না হয় হাওয়াই দ্বীপেই যেও। যেখানে ঠাণ্ডার কোনো ভয় নেই। চারিদিকে নীল সমুদ্রের

ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনার ঝুঁটি। বালির ওপরে নারিকেল গাছের তলায় বসে আনারসের সরবৎ খেও। মাঝে মাঝে নৌকো করে জেলেদের সঙ্গে বেড়িও, কেমন পরিষ্কার জলের নিচে রঙ-বেরঙের প্রবালের পাশ দিয়ে অদ্ভুত সব সমুদ্রের জীবদের সাঁতরে যেতে দেখবে। চাও না এসব দেখতে?'

আমি হাঁ করে তার দিকে চেয়ে রইলাম। চোখ দু-টো কটা মতো, দাড়িগোঁফ কতকাল খেউরি হয় নি।

সে বললে—'নরওয়ে যাবে না? মাঝ রাতে সূর্য ওঠা দেখতে ইচ্ছা করে না? আকাশটা বেগনি রঙ ধরে, তাতে ফিকে সোনালির ছটা লাগে আর সূর্যটা মাটি থেকে একটু উঁচুতে আকাশের চারিদিকে কেবলি ঘুরতে থাকে। দেখবে না?'

আমি জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজালাম।

সে বললে—'নায়গারা জলপ্রপাত দেখবে না? সেখানে অষ্টপ্রহর রামধনু লেগে থাকে। ওল্ড ফেথ্ফুল বলে ওখানে একটা গরম জলের ঝরণা আছে, সাতান্ন মিনিট পর পর তার মুখ থেকে গরম জলের ফোয়ারা বেরোয়, চাও না সেখানে যেতে?'

আমি একবার নাক চোখ মুচে নিলাম।

লোকটা বললে—'তা হলে মিসর দেশে চল না। প্রাচীনকালের রাজাদের সমাধি কেমন ধনরত্ন দিয়ে ঠাসা থাকে দেখবে। গ্রীসের দু-হাজার বছরের পুরনো মূর্তি দেখবে না? ওখানকার ভাঙা থিয়েটারে এককালে সিংহ দিয়ে মানুষ খাওয়ানো হত, তা জানো? প্যারিসের আইফেল টাওয়ার দেখবে না?'

আমি দু-হাত দিয়ে মুখ ঢাকলাম।

সে বললে—'আর সে কি খাওয়ার ধুম! একবার তার স্বাদ পেলে এসব ডাল ভাত চচ্চড়ি আর কোনোদিন মুখে রুচবে না। তন্দুরিতে রান্না হাঙরের কাবাব, দুধ আর পনীর দিয়ে সেদ্ধ বাচ্চা অক্টোপাস্, কচি কচি ব্যাঙের ঠ্যাঙ, বরফের পিপে থেকে তুলে লেবুর রস দিয়ে জ্যান্ত ঝিনুক, কত সময় খেতে গিয়ে দাঁতে মুক্তো কামড় পড়ে।'

আমার জিবে জল এল।

লোকটা বললে—'হনলুলুর কাছে সমুদ্রের ধারে ওরা যখন চড়িভাতি করে, পদ্মপাতায় জড়িয়ে সরু চালের ভাত কচি শুওরের মাংসের সঙ্গে

নারকোল দিয়ে মেখে, আগুনে তাতানো পাথরের উপর, গরম বালির নিচে পুঁতে রান্না করে। যে একবার খেয়েছে সে আর ভোলে না! এ সমস্তই তোমার মুঠোর মধ্যে।' এই বলে ফোঁস করে সে একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

আমি বললাম—'টাকা লাগবে না?'

'লাগবেই তো। এখান থেকে শুকনো মুখে কালীঘাট যেতে দশটা পয়সা লাগে, আর এতে লাগবে না, তাই কখনো হয়? কিন্তু টাকা পাওয়াটা এমন আর কি শক্ত ব্যাপার? যে কেউ টাকা করতে পারে, কেন করে না সেটাই বরং আশ্চর্য!' আমি তার চামড়ার তাপ্পি লাগানো ছেঁড়া জার্কিন, নীল রঙের ময়লা পেন্টেলুন আর জঘন্য ক্যাম্বিসের জুতোর দিকে তাকাতেই সে বলল—'ওঃ, এই দেখেই ঘাবড়াচ্ছ? পয়সা কখনো জাহির করতে হয় না, তা হলে রাজ্যের ফেউ পাছু নেয়। পয়সা থাকবে পকেটে লুকোনো, এই দ্যাখ।' এই বলে পকেট থেকে নস্যি লাগা দুর্গন্ধ রুমালের গিঁট খুলে বড় বড় সবুজ পাথরের একছড়া মালা দেখাল। কাষ্ঠ হেসে বলল—'এগুলো আসল পান্না, কম করে এটার দাম এক লক্ষ টাকা। এই রকম হাজার হাজার মালা আমার আছে। তোমারো খুব সহজেই থাকতে পারে। চাই কি এটাই তোমাকে দিতে পারি। অবিশ্যি যদি একটা কাজ করে দাও।'

ফিস্‌ফিস্ করে বললাম—'কি কাজ?'

লোকটা হাসল। 'অত ভয়ের কিছু নয়, ডাকাতও ধরতে হবে না, কুমীরের সঙ্গেও লড়াই করতে হবে না। স্রেপ্ তোমার খেলার মাঠের টিকিটখানা আমাকে দিতে হবে।'

আমি বললাম—'কেন, তোমার এত টাকা, একটা টিকিটও কিনতে পার না?'

সে বললে—'আরে রাম:! আমার ওসব চামড়ার গোলা নিয়ে লাথালাথি দেখার সময় আছে নাকি? বলে সে সময়টাতে আমার চাই কি হাজার টাকা রোজগার হয়ে যায়। ওটা চাই আমার ওস্তাদজীর জন্য, কামস্‌-কাটকা থেকে মাত্র একদিনের জন্য এসেছেন, কালই ফিরে যেতে হবে, কুড়ি বছর মোহনবাগানের খেলা দেখেন নি। এই সঙ্গে বলে রাখি, সেই তোমাকে এক দিনে লক্ষ টাকার মালিক করে দিতে পারে। একদিন আমিও তোমার মতো ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতাম, এখন দ্যাখ,
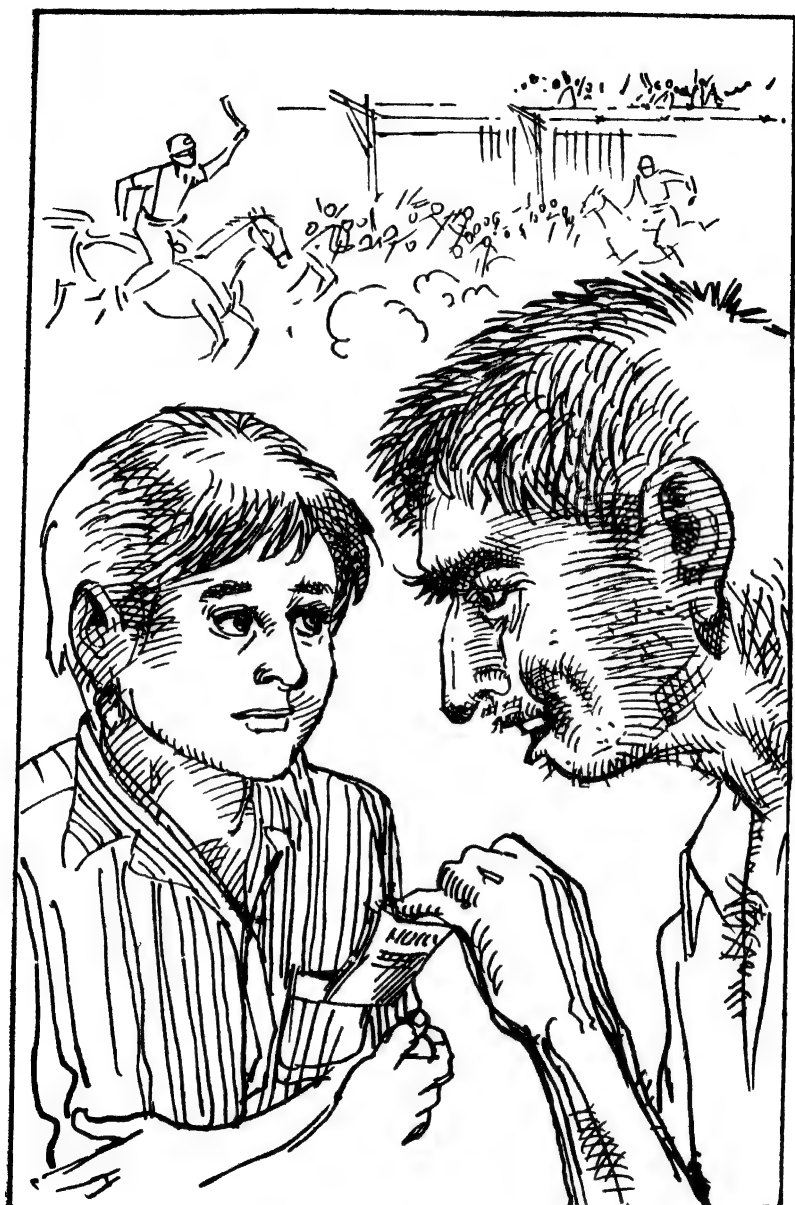
এই বলে পকেট থেকে টুপ করে টিকিটটি তুলে নিয়ে·

লক্ষ টাকার পান্নার মালা কেমন দিব্যি স্বচ্ছন্দে তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি।'

এই বলে আমার পকেট থেকে টুপ্ করে টিকিটটি তুলে নিয়ে, রুমালের পুটলিটা গুঁজে দিল। আমি কি একটা বলতে যাচ্ছিলাম, সে জিভ কেটে বলল—'এই দ্যাখ, কি ভুলো মন আমার! কোটি কোটি টাকার হিসেব রাখার অভ্যাস ছোট জিনিস তাই ভুলে যাই। এই নাও, স্বয়ং ওস্তাদজীর হাতে লেখা বড়লোক হবার অব্যর্থ উপায় নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে পড়ে দেখো।'

আমার হাতে একটা শীলমোহর করা হলদে খাম দিয়ে লোকটা গেটের ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। দশ মিনিট বাদে ছোট্কা এসে সব শুনে চটে কাঁই! 'তুই এরকম একটা ইডিয়ট জানলে অত কষ্ট করে তোর জন্য টিকিট যোগাড় করতাম না! ঐরকম সবুজ কাঁচের মালা শান্তিনিকেতনের মেলায় খুকুরা সাইত্রিশ পয়সা দিয়ে কিনেছিল! এখন যা, বুড়োআঙুল চুষতে চুষতে বাড়ি যা।'

বাড়ি গিয়ে খাম খুলে দেখি তাতে লেখা—'মন দিয়ে পড়াশুনা করলেই বড়লোক হওয়া যায়।'

যাদুকর

স্টেশনের ওয়েটিং রুমে ঢুকে বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেলাম। সে যে কী দারুণ বৃষ্টি সে আর কী বলব। চারদিক লেপেপুঁছে একাকার, ধোঁয়ার মতো জলের গুঁড়ো উড়ছে, তীরের মতো গায়ে বিঁধছে। 'উঃফ, ঘরের মধ্যে ঢুকে বাঁচলাম। ঘরে একটা তেলের বাতি জ্বলছে, দেখি আরামকেদারার ওপরে মাথা থেকে পা অবধি কালো চাদরে মুড়ি দিয়ে একটা লোক বসে রয়েছে, মুখটা তার তেকোনা, থুতনি থেকে খোঁচামতন একটু দাড়ি ঝুলছে। সামনে টেবিলের ওপর একটা হলদে-কালো ডোরাকাটা বিরাট বেড়াল, দু-পায়ের ওপর ভর দিয়ে দু-হাত উঁচু হয়ে সটান বসে আছে।'

জগাইদা ঘরে ঢুকেই বসে পড়ে বলল—'এ কোথায় আনলি বল

তো ? না আছে একটু শোবার জায়গা, না আছে একটু চায়ের ব্যবস্থা। নে, খাবারের থলেটা খোল। এখন ভিজে জুতো পরে আবার আমার সর্দি-টর্দি না লাগে। তোকে আমার আনাই ভুল হয়েছে। যা আস্তে আস্তে চলিস; নইলে এতক্ষণে বড় স্টেশনে পৌঁছে সাড়ে পাঁচটার গাড়ি ধরে কদ্দুর এগিয়ে যেতাম বল তো।'

জগাইদা জুতো মোজা খুলতে লাগল, আমি খাবারদাবার বের করতে করতে বললাম—'আসতে তো আমি চাই-ই নি, তুমিই বললে ম্যাজিক শেখাবে, তাই—'

আরামকেদারা থেকে কালো-কাপড়-পরা লোকটি বলল—'কে ম্যাজিক শেখাবে ?'

জগাইদা সেদিকে না তাকিয়েই বলল—'কে আবার শেখাবে, জাদুকর শেখাবে। নে, তাড়াতাড়ি কর। কতবার না বলেছি যে-সে অচেনা লোকের সঙ্গে ভাব পাতাবার দরকার নেই।'

এই অবধি বলেই জগাইদা হঠাৎ থেমে গিয়ে হাঁ করে লোকটার দিকে চেয়ে রইল। আমিও সেদিকে ফিরে একেবারে হাঁ। লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে, গায়ের চাদর খসে গেছে, তার তলা থেকে বেরিয়ে পড়েছে কুচকুচে কালো গায়ে-আঁটা পেন্টেলুন আর ঢিলা আস্তিনের কালো কোট, হাতে একটা কালো ছড়ি, হাতলে একটা কুকুরের মাথার খুলি।

সঙ্গে সঙ্গে বেড়ালটাও উঠে দাঁড়িয়েছে, চার পা এক জায়গায় জড়ো করে, পিঠ বেঁকিয়ে দু-হাত উঁচু করে, সবুজ চোখ দিয়ে জগাইদার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

লোকটা যে কী অদ্ভুত একটা হাসি হাসল সে আর কী বলব। মনে হল ছাদের কড়িবর্গাগুলো থেকে খিক খিক্ করে তার প্রতিধ্বনি হচ্ছে। জগাইদা একটা ঢোক গিলে আমাকে একটা ছোট ঠেলা দিয়ে বলল—'চপগুলো আমি এনেছি, ওগুলো-আমাকে দে। তুই পাঁউরুটি দিয়ে পটল-ভাজা দিয়ে খা। ঐ ছোট সন্দেশটা নিস্। নিখুঁতি একটাই আছে, এদিকে দে।'

লোকটা তখনও খিকখিক করে হাসছে। হাসতে হাসতে বলল—'খুব ভালো, খুব ভালো, চমৎকার ব্যবস্থা।'

আমার কেমন গা শিরশির করতে লাগল। তার ওপর বাইরে তুমুল ঝড়বৃষ্টি, দরজা-জানলা খটখট করে নড়ছে, বন্ধ দরজার ভেতর দিয়ে

বিদ্যুতের চমকানি ঘরে ঢুকছে। ছাদ থেকে ঝোলানো তেলের ল্যাম্পটা মাঝে মাঝে দপদপ করে বেড়ে যাচ্ছে, আবার মাঝে মাঝে কমে যাচ্ছে।

জগাইদা কর্কশ গলায় আমাকে বলল—'হাঁ করে দেখছিস কী? চা আনতে হবে না.?'

বললাম—'এই যে বললে চায়ের ব্যবস্থা নেই, বিশ্রী জায়গা। এত জলঝড়—'

জগাইদা দাঁত খিঁচুতে লাগল—'জলঝড় তো হয়েছেটা কী? গলে যাবি নাকি? ভারি আমার ব্রতী-বালক হয়েছেন, ছোঃ! উনি শিখবেন ম্যাজিক। তবেই হয়েছে! ওসব হাত সাফাইয়ের ব্যাপারে এত ভয় করলে চলবে না, হ্যাঁ! এই আমি—'

এই অবধি বলতে না বলতে অন্য লোকটা একেবারে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে জগাইদার সামনে দাঁড়াল। রাগে তার চোখ দু-টো একেবারে ছোট ছোট হয়ে গেছে, মুখটাকে দেখাচ্ছে একেবারে হলুদ! দাঁতে দাঁত ঘসে সে বললে—'কী বললি? হাতসাফাই? এত বড় একটা শাস্ত্রকে এভাবে অপমান কত্তে তোর এতটুকু বাঁধল না? আবার বলে ম্যাজিক শিখবে!'

চা না পেয়ে জগাইদাও রেগে ছিল। সেও তেড়েফুড়ে উঠল। 'হাত-সাফাই না তো কী? যতসব বুজরুগি, লোকের চোখে ধুলো দিয়ে পয়সা কামানো। সাদা কাগজে লেবুর রস দিয়ে মন্ত্র লিখে তারপর সেটাকে মোমবাতির উপর ধরে লেখাটা ফুটিয়ে, যত রাজ্যের আহাম্মুকদের অবাক করে দেওয়া। রেখে দিন মশাই, একেবারে কিছুই জানি না ভেবেছেন না কি? আপনার ঐ সব সঙের সাজ দেখে এ ছোকরা হাঁ হয়ে যেতে পারে। আমার আর সে বয়স নেই।'

লোকটা বললে—'কী! সঙের সাজ?'

তখন আমি অবাক হয়ে চেয়ে দেখি বাস্তবিকই পরনে তার সাধারণ কালো কোট-প্যাণ্ট, হাতে কুকুরের-মাথা-দেওয়া ছড়ি, অদ্ভুত বলতে কোথাও কিছু নেই। কিন্তু একটু আগেও—'

লোকটা জগাইদার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল—'জাদু করতে সাজের দরকার লাগে না, বুঝলে? আমি তোমাকে এক্ষুণি যে কোন একটা জানোয়ার বানিয়ে দিতে পারি, তা জান?'

জগাইদা বললে—'ইল্লি?'

লোকটা আরো ঠাণ্ডা গলায় বললে—'এই যে বেড়ালটাকে

দেখছো, এটাকে ভালো করে নজর করে দেখো, এ কি সত্যি বেড়াল ভেবেছো না কি?' বলে বেড়ালটার পিঠে হাত বুলোতে লাগল। আমি অবাক হয়ে দেখি, এই এক্ষুণি দেখেছিলাম হলদে-কালো ডোরাকাটা বেড়াল তার সবুজ চোখ, আর এক্ষুণি দেখছি খয়েরি রঙের একটা খরগোশ —তার পাটকিলে রঙের চোখ।

সত্যি কথা বলতে কি, জগাইদাও একটু চমকে গেছিল। কিন্তু সেটা স্বীকার করবার ছেলেই সে নয়। কাষ্ঠ হেসে বলল—'ঢিলে জামার আস্তিনে হয়তো গোটা একটা চিড়িয়াখানাই নিয়ে এসেছেন। চাই কি, ওটাকে এখুনি একটা কুকুরছানা করে দিতেই বা আপত্তি কী?'

বরফের মতো ঠাণ্ডা গলায় লোকটা বললে—'কোন আপত্তি নেই।'

দেখতে দেখতে খরগোশটা একটা ঝাঁকড়া-চুল তিব্বতী কুকুর হয়ে গেল। সে আবার এমনি বদমেজাজী যে জগাইদাকে সারা ঘরময় তাড়া করে বেড়াতে লাগল। লোকটা বললে—'ব্যস, ব্যস, ঢের হয়েছে।' বলে তাকে কোলে তুলে নিল। খুব খানিকটা আদর করে আবার যখন তাকে টেবিলে বসিয়ে দিল, দেখি যে হলুদ-কালো ডোরাকাটা বেড়াল ছিল সেই বেড়ালই রয়েছে, সবুজ চোখ দিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাত চেটে মুখ পরিষ্কার করছে। লোকটা আবার আরামকেদারায় পা গুটিয়ে বসে বলল—'আসলে ও বেড়ালই নয়।'

জগাইদা হেসে বলল, 'বেড়াল নয় তো কী?'

'বেড়াল নয় তো তোমারই মতন একটা উদ্ধত ছেলে। তোমারই মতন পরীক্ষায় ফেল করে, জাদুবিদ্যা শিখতে আমার কাছে এসে আপাততঃ বেড়াল হয়েছেন। উড়নচড়ে ছেলেদের আমি এইভাবে শায়েস্তা করে থাকি।'

জগাইদা ভীষণ রেগে গেল। তোতলামি করে-টরে একাকার, 'ফ-ফেল করে মানে আবার কী? ফেল না করলেও জাদুবিদ্যা শেখা আমার জীবনের স্বপ্ন। প্রকাণ্ড হলঘর থমথম করবে, ঘরময় একটু-খানি আলো জ্বলবে, কিন্তু মঞ্চের ওপরে দু-টো প্রকাণ্ড বাতি রাতকে দিন করে রাখবে। আর তারই নিচে আঁটো কালো পেন্টেলুন আর ঢিলে আস্তিনের কোট পরে আর মাথায় কালো উঁচু টুপি দিয়ে আমি থাকব, আর আমার উলটোদিকে থাকবে আমার শাক্‌রেদ। আমার হাত-পা বেঁধে চেয়ারে বসিয়ে সামনে পর্দা টেনে দেবে, তবু আমি কোঁ কোঁ করে

বেহালা বাজাব—কী রে, বড় যে হাসছিস ?'

কী আর করি, বললাম—'ইয়ে—মানে হাত-পা খোলা থাকলেও তুমি বেহালা বাজাতে পার না।'

জগাইদা ব্যস্ত হয়ে বলল—'আরে, তাই তো বলছি, ঐখানেই তো হাতসাফাই বিদ্যে লাগে। ওরা পর্দা সরিয়ে দিল, যেমন-কে-তেমন হাত-পা বাঁধা চেয়ারে বসে আছি, বেহালাটা দূরে মাটিতে পড়ে। ঐটেই তো আমাকে শিখতে হবে। ঐ বুজরুগিটুকুন।'

লোকটা বললে—'সব বুজরুগি, না ? বুজরুগিটুকু শিখতে পারলেই হয়ে গেল! বাঃ! হুদিনির নাম শুনেছিস, ছোকরা ? তাকে হাত-পা বেঁধে প্রকাণ্ড কাঠের বাক্সে পুরে, ছ-ইঞ্চি লম্বা আটচল্লিশটা পেরেক ঠুকে ঐরকম রাতকে-দিন-করা আলোর নিচে ফেলে রাখা হত। চারধার ঘিরে দর্শকরা বসে থাকত। তবু সে বাক্স থেকে বেরিয়ে আসত। তারপর সে বাক্স খুলতে মিস্ত্রি ডাকা হত। তারা যন্ত্রপাতি দিয়ে পেরেক তুলে, ঢাকনি উঠিয়ে দেখত ভেতরে হাত-পা বাঁধার শেকল পড়ে আছে, হুদিনির রুমাল পড়ে আছে—কিন্তু হুদিনি বাইরে। তাকেও কি বুজরুগি বলিস ? জানিস, একবার রাশিয়ার জার তোরই মতো ওর জাদুবিদ্যাকে বুজরুগি প্রমাণ করবার জন্যে, হুদিনির হাত-পা শেকল দিয়ে বেঁধে রেলগাড়ির সীল-করা কামরায় পুরে, কামরার বাইরে পাহারাওলা বসিয়ে রেলগাড়িটাকে সাইবেরিয়া রওনা করিয়ে দিয়ে বলেছিল, রাত আটটার সময় সেজেগুজে আমার সভায় আসবে। রাত আটটায় গাড়ি তখন দুশো মাইল দূরে চলে গেছে, কিন্তু হুদিনি ঠিক সেজেগুজে রাজসভায় এসে হাজির হলেন। টেলিগ্রাফে জানা গেল সীল-করা গাড়ি তখনো সাইবেরিয়ার দিকে ছুটেছে, একবারও থামে নি। কিন্তু গাড়িতে হুদিনি নেই। এই সবই বুজরুগি বলতে চাস ?'

তারপর কত যে তর্কাতর্কি করতে লাগল দু-জনে। ঘুমে আমার চোখ বুজে আসছিল। আমি অন্য আরামকেদারাটায় শুয়ে সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে চমকে উঠে দেখি, চারিদিক একেবারে চুপচাপ, আলোটা যেন আরো কমে এসেছে, কালো-পোশাক-পরা লোকটা তার চেয়ারে বসে ঢুলছে, তার সামনে একটার জায়গায় দু-টো হলদে-কালো ডোরাকাটা বেড়াল। জগাইদা কোথাও নেই।

তার সামনে একটার জায়গায় দুটো হলদে-কালো ডোরাকাটা বেড়াল

কী আর বলব, আমার সমস্ত চুল খাড়া হয়ে উঠল। লোকটি একটু হেসে বলল—'কাকে খুঁজছ? এমনি করে আমার বেড়াল বাড়াই। কিন্তু সত্যি করে বলো তো, এই বেশি ভাল না? এতকাল তোমার ওপর তম্বি করে এসেছে, এখন পরীক্ষা করে দেখতে পার কেমন পোষ মেনেছে। নাও, ভয় কিসের, দেখো যা বলবে তাই করে কিনা?'

আমি বললাম—'কো—কোনটা সে?' লোকটা শুনে হেসেই কুটোপাটি —'সে কি আর অত করে বলা যায়? দু-জনকে একই জাদুমন্ত্র দিয়ে এক্কেবারে অবিকল এক করে দিয়েছি যে। আর আলাদা করবার দরকারই বা কী? জোড়া বেড়ালের খেলা দেখাব।' বলে আঙুল তুলে বলল—'খেল্ দেখাও ভাইসব।' আর বেড়াল দু-টো অমনি ওর আঙুল নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কখনো ওঠে, কখনো নামে, কখনো লাফায়, কখনো কিলবিল করে। একবার কুস্তিও দেখাল।

দেখে দেখে আমি ত অবাক। লোকটা বলল—'ভয় কিসের? এবার সাধ মিটিয়ে ওকে নাচাও। অনেক ত সহ্য করেছ।'

আমি বললাম—'এই চরকিবাজি খাও দিকিনি।' বলে আঙুল ঘুরিয়ে দেখালাম। তাই দেখে বেড়াল দুটাও চাকার মত ঘুরতে লাগল। আমি বললাম—'চোপ'। অমনি তারা থেমে গেল। আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললাম। লোকটা ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'ও কি হল ভাই? আমি ভাবলাম তুমি খুসি হবে।' আমি হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলাম। 'বেচারী জগাইদাকে বেড়াল করে দিও না। ও ইঁদুর দেখলে ভয় পায়।'

লোকটা খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে আমার পিঠে হাত দিয়ে বলল—'আর কেঁদো না, এই দেখো, ওকে আবার মানুষ করে দিচ্ছি। চোখ বুঁজে মুখ গুঁজে একটু শোও দিকিনি। যা, বিল্লি যা তো, জগাই হয়ে চা আন; ভোর হয়ে গেছে। নিজের একার জন্য না, আমাদের সকলের জন্য আনিস। স্বভাবটাকে বদলে ফেলিস।'

বলতে না বলতে ঘরের দরজা খুলে গেল, পাখিদের কিচিমিচি কানে এল, চোখ খুলে চেয়ে দেখি, জগাইদা সঙ্গে করে চা-ওলা নিয়ে ঢুকছে, রাত কেটে গেছে, বাইরের আকাশ ফর্সা হয়ে গেছে। আর টেবিলের ওপর একটা বেড়াল থাবা চেটে মুখ পরিষ্কার করছে। চমকে গিয়ে লোকটার দিকে চাইতেই সে ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে কিছু বলতে মানা করল।

জগাইদার দেখি মেজাজটা খুব খুসি। ঠোঙায় করে নানখাটাই বিস্কুটও কিনে এনেছে। একগাল হেসে আমাদের খাওয়াল, নিজেও খেল। তারপর আমরা রওনা হবার আগে লোকটাকে টিপ করে একটা প্রণাম ঠুকে বলল—'ভাই ঠিক থাকল স্যার, লেখাপড়া শেষ করেই শিখব। চল রে, বাড়িই ফেরা যাক, মা আবার ভাববে।'

শুনে আমি চমকে গিয়ে আধ হাত লাফিয়ে উঠলাম, মাসিমার ভাবনার জন্য জগাইদার এত মাথাব্যাথা কবে থেকে হল? লোকটা আমার কানে কানে বলল—'অবাক হবার কিছুই নেই। কে জানে কোন ছেলেটাকে 'জগাই করতে কোনটাকে জগাই করেছি।'

জগাইদা বাইরে থেকে ডাক দিল—'ওরে, আয় রে অনেকটা পথ হাঁটতে হবে যে রে। বড় স্টেশনে তোকে লুচি তরকারি খাওয়াব। তাহলে চলি, স্যার।'

আজকাল মাসিমা প্রায়ই বলেন—'ঐ একবারটি ফেল করে জগাই আমার একেবারে বদলে গেছে, অমন ছেলে হয় না।'

আসলে কতখানি যে বদলেছে তা মাসিমাও জানেন না।